

# আইনী তুহফা সলাতে মুস্তফা

(১ম খণ্ড)

অধ্যাপক মাওলানা হাফিয় শাইখ আইনুল বারী আলিয়াভী



হাদীস একাডেমী

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي

রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, তোমরা সলাত আদায় কর ঐভাবে, আমাকে  
লাত আদায় করতে দেখ যেভাবে।

(সহীহুল বুখারী ইসলামিক ফাউন্ডেশন ৬০৩, আ.প্র. ৫৯৫, তাও. ৫৯৫)

# আইনী তুহফা সলাতে মুস্তফা (১ম খণ্ড)

রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নামাযের সঠিক চিত্রের প্রামাণ্যগ্রন্থ

প্রণয়নে :

প্রফেসর হাফিজ শাইখ আইনুল বারী আলিয়াভী

অধ্যাপক কলিকাতা মাদ্রাসা আলিয়া

এম.এম. ফাস্ট ক্লাস রেকর্ড, প্রাইজ স্কলারশিপ প্রাপ্ত,

ডিন.ইন উর্দু ফাস্ট ক্লাস রেকর্ড, স্টাইপেন্ড প্রাপ্ত, এম.এ।

প্রকাশনায় :



হাদীস একাডেমী

২১৪, বংশাল রোড, ঢাকা- ১১০০।

প্রকাশনায় :

হাদীস একাডেমী

২১৪, বংশাল রোড, ঢাকা- ১১০০।

ফোন : ৭১৬৫১৬৬, মোবাইল : ০১১৯১৬৩৬১৪০

গ্রন্থসমূহ :

প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

লাইব্রেরী প্রকাশ :

১ম প্রকাশ : জানুয়ারী ২০০৪ ঈসাব্দী

২য় প্রকাশ : জুন ২০০৮ ঈসাব্দী

৩য় প্রকাশ : এপ্রিল ২০১৩ ঈসাব্দী

কম্পিউটার কম্পোজ :

হাদীস একাডেমী

**বিনিময় মূল্য : ১২০/-**

(একশ' বিশ টাকা মাত্র)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## উৎসর্গ

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি আমার উম্মাতের জন্য ধর্ম সংক্রান্ত ৪০টি হাদীস আয়ত্ত্ব করে, আল্লাহ তা'আলা তাকে ফকীহ করে কবর থেকে তুলবেন এবং আমি তার শাফাআতকারী ও সাক্ষী হব। (বায়হাকী, মিশকাত ৩৬ পৃষ্ঠা)

যাদের আন্তরিক প্রচেষ্টায় এবং ঐকান্তিক সাধনায় আমি স্বীন ও দুনিয়ার উভয় ইলুম শিখে এ বইয়ে শুধু ৪০ নয়, বরং ৭৪০ এরও অধিক হাদীস লিখে উপরোক্ত হাদীস অনুযায়ী রসূলুল্লাহ ﷺ-এর শাফাআতের আশা রাখি সেই আব্বা ও আশ্বার তরফ থেকে সদাকায়ে জা-রিয়াহ্ স্বরূপ তাঁদের প্রিয় পুত্রের এই তুহফা—

“সলাতে মুত্তফা” আল্লাহর দরবারে উৎসর্গিত হল।

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ

الرَّحِيمُ ❁

মোর এই নগণ্য কীর্তি স্মরণ করাবে মম স্মৃতি।

তাই মম অগোচরে দু'আ করিও মোর তরে।



## লেখকের আরয

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ عَلٰى مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ وَالسَّلَامُ  
عَلَى الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ بِإِحْسَانٍ اِلَى يَوْمِ الدِّينِ وَاَنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِيْنَ وَلَا  
عُدْوَانَ اِلَّا عَلَى الظَّالِمِيْنَ.

আমি সর্বপ্রথমে সেই করুণাময়ের হাম্দ ও তারীফ করছি যার অপার কৃপায় এই বইখানি সমাজের খিদমতে পেশ করতে পেরেছি। অতঃপর সেই মহা মানবের উপর অসংখ্য দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক যার বদৌলতে আমরা আল্লাহর সব রকম ইবাদত, বিশেষ করে সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদত সলাতের সঠিক নিয়ম-কানুন পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে জানতে পেরেছি।

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, কিয়ামাতের দিন বান্দার আমলের মধ্যে সর্বপ্রথম যে আমলের হিসাব-নিকাশ হবে তা হল সলাত। এই সলাত যদি ঠিক হয় তাহলে সে কাম্বইয়াব হবে ও নাজাত পাবে। আর এই সলাত যদি ঠিক না হয় তাহলে সে নিরাশ হবে ও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তারপর তার অন্যান্য সমস্ত আমল ঐ অনুযায়ীই হবে। (আবু দাউদ, আহমাদ, মিশকাত ১১৭ পৃষ্ঠা)

এই একটি মাত্র হাদীস দ্বারা বোঝা যায় যে, সমস্ত আমলেরই জড় হল নামায। তাই সলাত যদি রসূলুল্লাহ ﷺ এর সুন্নাত মুতাবিক না হয় তাহলে সব বেকার। সেজন্য সুন্নাতী সলাত শেখা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য একান্ত ফরয ও অপরিহার্য কর্তব্য।

হিজরীয় তৃতীয় শতকের শ্রেষ্ঠ মনীষী, দশ লাখ হাদীসের হাফিয ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহঃ) (মৃত্যু ২৪১ হিঃ) বলেন : হাদীসে আছে, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, লোকদের উপর এমন একটা যুগ আসবে, যখন তারা সলাত আদায় করবে বটে, কিন্তু তাদের সলাত হবে না। অতঃপর ইমাম আহমাদ (রহঃ) বলেন, আমি একশোটি মাসজিদে সলাত আদায় করেছি, কিন্তু কোন মাসজিদওয়ালাদেরকে নবী ﷺ ও সাহাবায়ে কিরামের সুন্নাত মোতাবেক সলাত আদায় করতে দেখলাম না। (কিতাবুস্ সলা-ত ওয়ামা-ইয়্যালযামু ফীহা ৫ম পৃষ্ঠা)

প্রিয় পাঠক! একবার চিন্তা করুন, এখন থেকে সাড়ে এগারশো বছর আগে হিজরীয় তৃতীয় শতকে তাবা-তাবিয়ীদের যুগে একশো মাসজিদের মুসল্লীদের অবস্থা যখন ঐরূপ তখন এই নাস্তিকতার যুগে দু'টক্কর দেনেওয়ালানা নামাযীদের অবস্থা হবে কিরূপ? 'আহলে হাদীস' পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্ব পাবার পর আমি গত ৪টি বছর ধরে সারা বাংলার বহু জায়গায় ঘুরেছি। প্রতিটি জায়গায় অধিকাংশ নামাযীদের অবস্থা ঐরূপ পেয়েছি যেমন ইমাম আহমাদ (রহঃ) বলেছেন, সেজন্য প্রায় সব জায়গারই ধর্মপরায়েণ লোকেরা বাংলা ভাষায় একটি পূর্ণাঙ্গ সলাত শিক্ষা লেখার কথা আমাকে বারবার বলেছেন, ফলে সমাজের চাহিদা এবং নামাযীদের দূরবস্থা আমাকে এ বইটি লিখতে উদ্বুদ্ধ করে।

বর্তমান বাজারে বাংলা ভাষায় লিখিত সলাত শিক্ষার অভাব নেই। দুই বাংলায় প্রকাশিত ১১ খানি সলাত শিক্ষার বই আমি পেয়েছি। তন্মধ্যে আমার জ্ঞানে একটি বইও পূর্ণাঙ্গ নয়। সবগুলোই মোটামুটি কাজ চালানোর মত। তবে তুলনামূলকভাবে বাংলাদেশের শ্রদ্ধেয় মাওলানা ইবনে ফজল সাহেবের সলাত শিক্ষাটি অনেকটা পূর্ণাঙ্গ হলেও তাতেও বেশ কিছু খুঁটিনাটি গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা বাদ পড়েছে। বইটিতে হাদীসের হাওয়ালা থাকা সত্ত্বেও কিছু 'কিয়াসী' ভাবও স্থান পেয়েছে। তাই নামাযের বই অনেক বের হলেও খুঁটিনাটি বিষয় সম্বলিত একটি পূর্ণাঙ্গ ও নির্ভরযোগ্য সলাত শিক্ষার অভাব তীব্রভাবে অনুভূত হওয়ায় আমাকে কলম ধরতে হল। সেজন্য আমি সলাত সংক্রান্ত ১১টি বাংলা ও ৮টি উর্দু বই সামনে রেখে এবং কুরআন, হাদীস ও শারহে হাদীসের ২১ খানা গ্রন্থের সাহায্য নিয়ে 'সলাতে মোত্তফা' প্রথম খণ্ড তৈরী করলাম।

সিহাহ সিন্তার দুর্মূল্য গ্রন্থগুলো অধিকাংশ আলিমের কাছে না থাকা সম্ভব, কিন্তু মিশকাত অথবা বুল্গুল মারাম প্রত্যেক আলিমের ঘরে থাকা অবশ্যই উচিত। তাই আমি আমার বইয়ের ভিত্তি মিশকাত ও বুল্গুল মারামের উপরে রেখেছি, যাতে করে যে কোন আলিমের পক্ষে হাওয়ালাগুলো মিলিয়ে নেয়া সহজসাধ্য হয়। আব্বাহর রসূল বলেন, 'তোমরা সলাত পড় ঐভাবে, আমাকে সলাত পড়তে দেখ যেভাবে'। (বুখারী ৮৮ পৃঃ, মুসলিম, মিশকাত ৬৬ পৃঃ)

এ হাদীসের ভিত্তিতে আমি অত্র বইয়ের প্রতিটি বিষয়ে কেবল মহানবীর হাদীসের তর্জমা করে রসূলুল্লাহরই প্রকৃত নামাযের চিত্র তুলে ধরেছি এবং যেখানে

ব্যাখ্যা ও মন্তব্য না করলে নয় কেবল সেখানে কিছু কিছু ব্যাখ্যা ও মন্তব্য মুহাম্মদীনে কিরামের মতানুযায়ী দিয়েছি। আশা করি পাঠকগণ রাসূলের হাদীস সরাসরি পাঠ করে নেকী পাবেন এবং আমিও ‘আন্দা-লু আলাল খাইরি কাফা-য়িলিহী’ অনুযায়ী কিছু নেকী পাবার আশা রাখছি।

আমাদের মুসলমান সমাজে শিক্ষিতের হার খুবই কম। সেজন্য আমি সবারই প্রতি লক্ষ্য রেখে এ বইয়ে সাহিত্য না ফলিয়ে যথাসাধ্য সহজ সরল ও কথ্য ভাষায় আসল বক্তব্য পেশ করেছি। মুসলমানদের কথ্য বাংলাতে বহু আরবী ও ফার্সী শব্দ ব্যবহৃত হয়। সেজন্য আমি ইচ্ছাকৃতভাবে আমাদের কথায় ব্যবহৃত প্রচলিত বানান না লিখে ধ্বনিতত্ত্ববিদদের সংস্কারকৃত বানান লিখেছি।

মেটিয়াক্রজের সর্বপ্রথম আহূলে হাদীস জামে মাসজিদ হাওলাদার পাড়া জামে মাসজিদে জুমু‘আর খুত্বা দেবার ফলে ও বাংলার বিভিন্ন মাসজিদে মাঝে মাঝে ইমামতি করার কারণে এবং বাংলার বিভিন্ন জায়গায় ঘোরার দরুন আমি জনগণ কর্তৃক সলাত সংক্রান্ত বহু প্রশ্নের সন্মুখীন হয়েছি।

এসব প্রশ্নের উত্তর সহ যত মাসআলা আমার তত্ত্বানুসঙ্গানী মনে এসেছে সেই সমস্ত খুঁটিনাটি মাসআলা আমি এই বইয়ে লেখবার চেষ্টা করেছি। বইটির দ্বিতীয় খণ্ডটি পড়ার পর আমার কথার সত্যতা সবাই বুঝতে পারবেন আশা করি।

আল্লাহ বলেন : “যদি তোমরা কোন বিষয় না জেনে থাক তাহলে তা জ্ঞানীদের কাছে জিজ্ঞেস কর (অন্ধের মত নয় বরং) দলীল সহকারে”- (সূরায় নাহল ৪৩ ও ৪৪ আয়াত)। আল্লাহর এ ফরমানের ভিত্তিতে আমি আমার সমস্ত বক্তব্য হাওলালাসহ লিখেছি। এ কাজে কতটা কষ্ট স্বীকার করতে হয়েছে তা এ পথের পথিকই ভালভাবে বুঝতে পারবেন।

নামাযের শর্ত থেকে নিয়ে সালাম ফিরে একা একা দু‘আ করা পর্যন্ত যতগুলো প্রয়োজনীয় খুঁটিনাটি মাসআলা আছে কেবল সেগুলোই আমি ১ম খণ্ডে সন্নিবিষ্ট করেছি ও ফরয নামাযের অন্যান্য বিষয়াদি ও নফল নামাযসমূহের বিশদ বিবরণ ২য় খণ্ডে দিয়েছি।

ইসলামের পাঁচটি ভিত্তি যথা কালিমা, সলাত, যাকাত, সিয়াম ও হজ্জের মধ্যে তিনটি অর্থাৎ কালিমা, যাকাত ও হজ্জের পরিভাষা বাংলা ভাষাতে ঐ আরবী

শব্দগুলোই ব্যবহৃত হলেও সলাত ও সিয়াম কিন্তু ব্যবহৃত হয় না। তার বদলে দু'টি ফারসী শব্দ যথা সলাত ও রোযা ব্যবহৃত হয়। প্রকৃতপক্ষে সলাত ও সিয়ামের যথার্থ প্রতিশব্দ সলাত ও রোযা নয়।

ফারসী ভাষার সমালোচকগণ বলেন, ফারসী ভাষা থেকে যখন আরবী শব্দগুলো উৎখাত করার অপচেষ্টা হয় সে সময় কোন অসৎ উদ্দেশ্যে কিছু আরবী পরিভাষা বিকৃত করার চেষ্টা করা হয় ফলে ইসলামের সর্বশ্রেষ্ঠ খুঁটি সলাত 'নামায়ে' পরিণত হয়। 'সলাত' শব্দটি যেহেতু সলাতের সঠিক প্রতিশব্দ নয় সেজন্য আসলের দিকে লক্ষ্য রেখে আমি আমার বইয়ের নামে নামাযের জায়গায় 'নামায' শব্দটি ব্যবহার করেছি। কিন্তু 'নামায' পরিভাষাটি ভুল হলেও আমাদের সমাজের মৌলভীগণ ছাড়া শতকরা ৮৫/৯০ জন লোকই নামায শব্দটি বোঝেন, কিন্তু সলাত শব্দটি বোঝেন না। তাই আমি সাধারণ জনগণের বোঝার জন্য ভুল হলেও নামায শব্দটি বইয়ের ভিতর লিখতে বাধ্য হয়েছি।

কিছু লোকের সৎ পরামর্শ অনুযায়ী আমি এ বইয়ে আরবী দু'আর সাথে সাথে তার বাংলা উচ্চারণও দিয়েছি। কিন্তু সবাই এ কথা মনে রাখবেন যে, আরবী শব্দের সঠিক উচ্চারণ বাংলা ভাষাতে কোন উপায়েই সম্ভব নয়। কুরআনের আয়াতে কোন কোন জায়গায় যের-যবর ভুল পড়লে কাফির হবার আশংকা আছে এবং কোন কোন জায়গায় টান না দিলে কিংবা যেখানে টান নেই সেখানে টান দিলে আয়াত বা হাদীসের অর্থে আকাশ পাতাল ফারাক হয়ে যাবে। সেজন্য সুন্নাহী সলাত আদায়কারী প্রত্যেক নামাযীরই উচিত আরবী উচ্চারণ শেখা। এই বইয়ে আরাবীর বাংলা উচ্চারণে যেখানে ড্যাস ( - ঙ্কার ) ও উকার ( ُ ) প্রভৃতি আছে সেখানে একটু টান দিয়ে পড়তে হবে।

আমি এ বইয়ে যত মাসআলা লিখেছি আমার জানা মোতাবেক সাধ্যমত নির্ভুল লিখেছি। কিন্তু আল্লাহর নাবী ﷺ বলেন, প্রত্যেক আদম সন্তান ভুলকারী এবং সর্বশ্রেষ্ঠ ভুলকারী তারা, যারা নিজের ভুল স্বীকার করে না- (তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, দারিমী, মিশকাত ২০৪ পৃষ্ঠা)। আমিও যেহেতু আদম সন্তানের একজন সদস্য সেহেতু আমার দ্বারাও ভুল হওয়া স্বাভাবিক। অতএব যদি কোন সূক্ষ্মদর্শী ব্যক্তি এ বইয়ে কোন মাসআলা ভুল পান তাহলে হাওয়ালা দিয়ে ঐ ভুলটা ধরিয়ে দিলে বাধিত হব এবং পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করে নেব ইনশাআল্লাহ।

খায়বার যুদ্ধের সময় আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, 'হে আলী, আল্লাহর কসম! তোমার দ্বারা একজন লোককে আল্লাহর সুপথ দেখানো তোমার কাছে বহু লাল উটের চেয়েও শ্রেয়'— (বুখারী ৬০৬ পৃঃ)। এ হাদীস প্রমাণ করে যে, কারো দ্বারা যদি কোন একজন লোকও হিদায়াত প্রাপ্ত হয় তাহলে তার জীবন ধন্য হয়ে যায়। ঠিক তেমনি আমার এ বই দ্বারা একজন মুসল্লীও যদি সুল্লাতী সলাত শিখে পরকালে নাযাত পায় তাহলে নিজের পরিশ্রমকে সার্থক মনে করব।

বিখ্যাত হানাফী মুহাদ্দিস আল্লামা মুল্লা আলী কারী (রহঃ) লিখেছেন, ইমাম শাফিয়ী (রহঃ) বলেন, প্রকৃত বিদ্যা হল তা, যাতে 'হাদ্দাসানা' বলা হয় (অর্থাৎ যা পরম্পরা-সূত্র সহকারে বলা হয়)। এছাড়া (সনদহীন) বাকি সমস্ত বিষয় শয়তানের অসুঅসাহ ও কুমন্ত্রণা— (শারহ ফিক্‌হি আকবার ৩ পৃষ্ঠা)। তাই আমি এ বইয়ে 'শয়তানের অসুঅসাহ' মত বিনা প্রমাণে কোন কথা না বলে সাধ্যমত প্রতিটি বিষয় কুরআন ও হাদীস এবং উলামায়ে কিরামের বরাতসহ বর্ণনা করেছি।

বইটি লিখতে আমি যেসব কিতাবের সাহায্য নিয়েছি তাদের প্রত্যেকের হাওলালা দিয়েছি।

বইটির ব্যাপারে যারা আমাকে যেভাবেই হোক সাহায্য করেছেন তাদের প্রত্যেকের শুকরিয়া আদায় করছি এবং আল্লাহ তা'আলাও যেন তাদের সবাইকে 'জাযায়ী খাইর' দেন তার জন্য দু'আ করছি। যদি কোন সুধী বইটি আরো সর্বাঙ্গ সুন্দর করার জন্য কোনরূপ সুপরামর্শ দেন তাহলে কৃতার্থ হব।

সবশেষে বলছি, হে পরওয়ারদিগার! জ্ঞানের কাঙালের এ নগণ্য তুহফাটুকু কবুল কর এবং তোমার মাখলুকের খিদমত করার তাওফীক দিও- আমীন।

ইতি

তারিখ :

১লা ফেব্রুয়ারী ১৯৭৭ ইসরী

আল্লাহর রহমত ও পাঠকদের দু'আপ্রার্থী

শাইখ আইনুল বারী আলিয়াবী

## এ বই সম্পর্কে জ্ঞানী-গুণীদের অভিমত

\* দুই বাংলার অতুলনীয় রিজালবিদ ও সর্বশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস আল্লামা আবু মুহাম্মাদ আলীমুদ্দীন (রহঃ) সাহেবের পাণ্ডিত্যপূর্ণ রায় :

আমি আইনী তুহ্ফা সলাতে মুস্তফার ১ম ও ২য় খণ্ড পড়ে দেখেছি। বইটি অতুলনীয় হয়েছে। স্নেহবর হাকিম আইনুল বারী সাহেব তাঁর সংকলিত বইয়ে যে সমস্ত গ্রন্থের বরাত দিয়েছেন তা নিখুঁত ও বাস্তব সত্য। সুতরাং তাঁর বইটি যেমন তথ্য ও তত্ত্বমূলক, তেমনি বিস্তারিত ও অকাটা প্রামাণ্য গ্রন্থ। বইটি পড়লে মনে হবে তিনি যেন এ যুগের যুগবিদ্বান ও স্বতিশক্তি ও পাণ্ডিত্যে ‘বাংলার ইবনে তাইমিয়াহ’। তাঁর উর্দু জ্ঞানও বিশ্বয়ের উদ্রেক করে।

কিতাবখানি বাঙালীদের জন্য নযীরবিহীন তথ্য সম্বলিত গ্রন্থ। যা ইনসাফের নযরে দেখলে প্রমাণিত হবে। আমি বইখানির বহুল প্রচার কামনা করি এবং আশা করি যে, সামর্থ্যবানরা যদি এর কপিগুলো কিনে আল্লাহর ওয়াস্তে বিলি করেন তাহলে তা উত্তম সদাকায়ে জারিয়া হবে এবং ঐ ‘ইল্ম প্রচার করা হবে যা মৃত্যুর পরও কবরে পৌছতে থাকবে।

\* উত্তরবঙ্গের বিখ্যাত পীর এবং দুই বাংলার প্রথিতযশা আলিম ও সুবক্তা আল্লামা আহমাদ হুসায়ন শ্রীমন্তপুরী সাহেবের সারগর্ভ মন্তব্য :

“আইনী তুহ্ফা সলাতে মুস্তফা” বইটিতে এত তথ্য ও তত্ত্ব আছে যা কল্পনাও করা যায়না। বইটি পড়ার পর প্রমাণিত হয় যে, এর লেখক গবেষণায় যুগ গবেষক, তত্ত্ব পেশ করায় কালের তাত্ত্বিক, মেধায় মরহম মাওলানা আবুল কালাম আযাদ এবং পাণ্ডিত্যে অতুলনীয়।

\* পশ্চিমবঙ্গ জমিদায়তে আহলে হাদীসের সুযোগ্য সভাপতি ও সমাজের খেদমতে নিবেদিতপ্রাণ আদর্শ ব্যক্তি জনাব আবদুল কাইয়ুম খান সাহেব বলেন :

বইখানা পড়ার পর আপনারা লেখকের গভীর জ্ঞান, অগাধ পাণ্ডিত্য ও তত্ত্বাত্মবোধী মানসিকতার ভূয়সী প্রশংসা না করে পারবেন না বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

\* ব্যারাকপুর হাই মাদরাসার সুযোগ্য প্রধান শিক্ষক জনাব মুহাম্মাদ সিরাজুল ইসলাম (বি এ অনার্স, এম এ বি এড) সাহেবের জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য :

বাংলা তথা ভারতের আলিম সমাজের উদীয়মান প্রতিভা শ্রদ্ধেয় হাকিম সাহেব অল্প বয়সে কঠোর পরিশ্রম করে কুরআন ও হাদীস তথা রিজালশাস্ত্রের পাণ্ডিত্যে আজ খ্যাতিমান। তাঁর অসাধারণ মেধা ও গবেষণালব্ধ মননের সার্থক বিকাশ হল এই “আইনী তুহ্ফা সলাতে মুস্তফা” গ্রন্থটি। নামাযের খুঁটিনাটি তত্ত্ব ও তথ্যে এটি পরিপূর্ণ।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## প্রকাশনার কথা

نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد :

কিয়ামাতের দিন বান্দার 'আমালের মধ্যে সর্বপ্রথম যে 'আমালের প্রশ্ন করা হবে তা হল সলাত। এই সলাত যদি তার গৃহীত হয় তবে তার অন্যান্য 'আমাল গৃহীত হবে। আর এই সলাত যদি গৃহীত না হয় তবে তার কোন 'আমালই গৃহীত হবে না- (আহমাদ, আবু দাউদ, ইবনু মাজাহ)। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : “তোমরা আমাকে যেভাবে সলাত আদায় করতে দেখ সেভাবেই তোমরা সলাত আদায় কর”- (বুখারী)। অতএব সলাত রসূলুল্লাহ ﷺ-এর তরীকা অনুযায়ীই হতে হবে। কোন বান্দার সলাত রসূলুল্লাহ ﷺ-এর তরীকা অনুযায়ী না হয় তাহলে তার সর্বপ্রকার 'আমালই বিফলে যাবে। কাজেই প্রত্যেক মুসলিমের জন্য সলাত আদায়ের সুন্নাতী নিয়ম ভালভাবে জেনে নেয়া অপরিহার্য কর্তব্য। তাই মুসলিম ভাই-বোনেরা যেন শুদ্ধভাবে সলাত আদায় এবং এ সম্পর্কিত জরুরী ও খুঁটিনাটি মাসআলাহু অতি সংক্ষেপে সহজেই শিখতে ও 'আমাল করতে পারেন সে উদ্দেশ্যেই ভারতের স্বনামধন্য লেখক মাওলানা হাকিম শাইখ আইনুল বারী আলিয়াবী সাহেবের “আইনী তুহফা সলাতে তুস্তফা” বইটি প্রকাশ করা হয়েছে। উল্লেখ্য বইটি বাংলা ভাষাভাষী সহীহ আক্বীদাহুপন্থী মুসলিম সমাজে ব্যাপক চাহিদাও রয়েছে। যদিও বাজারে বর্তমানে সলাত শিক্ষা সম্পর্কে পুস্তকের অভাব নেই কিন্তু সেগুলোতে সমস্ত প্রয়োজন মিটেনি। বিশেষ করে কুরআন হাদীস এবং প্রামাণ্য গ্রন্থরাজির যথাযথ দলীলসহ একখানা পরিপূর্ণ আদর্শ সলাত শিক্ষার প্রয়োজন সর্বত্রই তীব্রভাবে অনুভূত হয়। বিজ্ঞ মহল মনে করেন, বইটি শুধু বাংলা ভাষা-ভাষীদের নিকট নয় এটি বিশ্ববিখ্যাত একটি পূর্ণাঙ্গ সহীহ সলাত শিক্ষা। এই বইটি আহলে হাদীস লাইব্রেরী ঢাকা'কে প্রকাশ করার অনুমতি দানের জন্য শ্রদ্ধেয় লেখকের নিকট আমরা কৃতজ্ঞ। আল্লাহ তাঁকে দুনিয়া ও আখিরাতে উত্তম প্রতিদান দান করুন- (আমীন)। পশ্চিমবঙ্গে আলোড়ন সৃষ্টিকারী এই বইটি শুধু ভারতেই নয় বাংলাদেশের পাঠকবর্গের তথা সমাজেরও ব্যাপক উপকারে আসবে বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। আশা করি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর দেখানো নিয়ম ও পদ্ধতি অনুসারে লিখিত এই পুস্তকটি থেকে পাঠক মহল সঠিক দিক নির্দেশনা পেয়ে তদানুযায়ী 'আমাল করবেন এই আমাদের প্রত্যাশা।

আহলে হাদীস লাইব্রেরী ঢাকা



## সূচীপত্র

নামাযের শর্তাবলী .....	১৯
তাহারাত বা পবিত্রতা অর্জনের বিবরণ .....	১৯
কতিপয় লজ্জাকর ও অত্যন্ত জরুরী মাসআলা .....	২০
কী কী কারণে গোসল ফরয হয় .....	২২
ফরয গোসলের নিয়মাবলী .....	২৪
নাপাক মেয়েদের চুলের মাসআলা .....	২৫
নাপাক লোকদের জন্য কতিপয় বিশেষ জ্ঞাতব্য .....	২৬
সুন্নাত গোসলের কারণাবলী .....	২৭
গোসলের বিভিন্ন আদব কায়দা .....	২৮
অপারগ ব্যক্তিদের গোসল .....	২৯
হায়িযের বিবরণ .....	৩০
নিফাসের বিবরণ .....	৩১
হায়িয ও নিফাস ওয়ালীর গোসল .....	৩২
ইস্তিহযার বিবরণ .....	৩৩
বিভিন্ন প্রকার নাপাকী দূর করার বিবরণ .....	৩৩
চুল ও দাড়ি পরিষ্কারকরণ .....	৩৫
খাতনার বিবরণ .....	৩৬
পানির বিবরণ .....	৩৭
পেশাব ও পায়খানার বিবরণ .....	৩৮
পেশাব ও পায়খানায় যাবার দু'আ .....	৩৮
পেশাব ও পায়খানার পরের দু'আ .....	৩৯
পেশাব ও পায়খানার আদব-কায়দা .....	৩৯
পেশাবের পর কুলুখ নিয়ে চলাফেরা বিদআত .....	৪৪
মিসওয়াক বা দাঁতন করার গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য .....	৪৪
মিসওয়াক কী দিয়ে এবং কিভাবে .....	৪৫

অযূর ফযীলত ও গুরুত্ব .....	৪৭
অযূর অন্যান্য মাসআলাসমূহ .....	৫০
অযূতে ঘাড় মাসাহ সুনাত নয় .....	৫১
অযূ করাকালীন কোন দু'আ আছে কি? .....	৫২
অযূর প্রত্যেক অঙ্গ ধোয়ার দু'আ ভিত্তিহীন .....	৫৩
অযূর শেষে সূরা কাদর পড়াও ভিত্তিহীন .....	৫৩
অযূ নষ্টের কারণাবলী .....	৫৪
রক্ত বের হলে অযূ ভাঙ্গে কিনা? .....	৫৪
তায়াম্মুমের বিবরণ .....	৫৫
তায়াম্মুমের অন্যান্য মাসআলাসমূহ .....	৫৭
মোজার ওপর মাসাহের বিবরণ .....	৫৮
নামাযীর লেবাসের বিবরণ .....	৫৯
লেবাস সংক্রান্ত ইসলামী বিধান .....	৬১
নামাযের সময়ের বিবরণ .....	৬২
পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয .....	৬৩
ফজরের আউওয়াল ওয়াক্ত .....	৬৪
যোহরের সময় .....	৬৫
আসরের সময় .....	৬৫
মাগরিবের সময় .....	৬৬
এশার সময় .....	৬৬
কোন কোন সময়ে নামায পড়া নিষেধ .....	৬৬
জুম্মু'আর দিনে দুপুর বেলা নামায পড়া চলবে না .....	৬৬
কাবা শরীফে কোন সময়েই নামায মানা নেই .....	৬৭
ওযর থাকলে সূর্যোদয় এবং অস্তের সময়ও নামায চলবে .....	৬৭
ফজরের ফরযের পর সুনাত পড়তে মানা নেই .....	৬৮
আযানের বিবরণ .....	৬৯
আযানের নিয়ম .....	৭০
আযানের জওয়াব .....	৭১

আযানের দু'আ .....	৭২
ওয়াসীলাহুর দু'আ .....	৭৩
আযানের দু'আতে মনগড়া শব্দ .....	৭৩
আযানের অন্য দু'আ .....	৭৫
তারজী আযান .....	৭৫
আযানের অন্যান্য নিয়মাবলী .....	৭৬
“হাইয়া ‘আলাম্ সলাহ ও ফালাহ” বলার নিয়ম .....	৭৭
রসূলুয়াহ ﷺ-এর নাম শুনে নখে ও আঙ্গুলে চুমু খাওয়া বিদআত .....	৭৭
মুআযযিনের গুণাবলী ও আযান দেয়ার ফযীলত .....	৭৮
সাহরী-সফর ও বালা-মুসীবতের আযান .....	৭৯
সন্তান ভূমিষ্ঠ হলে আযান ও ইকামত .....	৭৯
ঝড় বৃষ্টি ও ঠাণ্ডা রাতে আযানের বিশেষ শব্দ .....	৮০
আযানে ও ইকামতে মনগড়া শব্দ .....	৮০
হানাফী মতে আযানের বাড়াবাড়ি .....	৮২
মেয়েদের আযান ও ইকামত .....	৮২
ইকামত বা তাকবীরের বিবরণ .....	৮২
তাকবীরের জওয়াব .....	৮৩
ইকামতের মধ্যেই জামা'আত শুরু করা সুন্নাতের খেলাফ কাজ .....	৮৩
ইকামত ও জামাআতের মধ্যে ব্যবধান .....	৮৪
কয়েক ওয়াক্ত কাযা নামাযের আযান এবং ইকামত .....	৮৫
মাসজিদের শুরুত্ব ও মাহাত্ম্য .....	৮৫
মাসজিদে নামাযের সাওয়াব .....	৮৬
মাসজিদে কী কী করা নিষেধ .....	৮৬
সাত জায়গায় নামায পড়তে মানা .....	৮৭
ঘরেও মাসজিদ বানাও .....	৮৭
মাসজিদে ঢোকার ও বের হবার দু'আ .....	৮৮
মাসজিদে যাবার ও ঢোকার পর করণীয় .....	৮৮
পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের রাক'আতের বিবরণ .....	৮৯

যোহর ও আসরের সুন্নাত .....	৮৯
মাগরিবের আগে ও এশার পরে সুন্নাত .....	৯০
ফজরের সুন্নাত .....	৯১
ফজরের সুন্নাতের পর ডান কাতে শোয়া সুন্নাত .....	৯২
বিভিন্ন নামায .....	৯২
নামায কেন পড়তে হবে? .....	৯২
নামায কিভাবে শুরু করতে হবে .....	৯৩
মুখে নিয়্যাত পড়া বিদআত .....	৯২
দুই পায়ের মাঝখানে কতটা ফাঁক থাকবে .....	৯৭
হাত কতটা ও কখন তুলতে হবে .....	৯৭
হাত কোথায় বাঁধতে হবে .....	৯৮
হাত বাঁধায় নারী-পুরুষে কোন পার্থক্য নেই .....	১০০
হাতের উপরে হাত কিভাবে থাকবে .....	১০১
নামাযের অবস্থায় দৃষ্টিপাতের জায়গা .....	১০২
হাত বাঁধার পর কী পড়তে হবে .....	১০৩
আ'উযুবিলাহ-হ পাঠ .....	১০৪
বিসমিল্লাহ পাঠ .....	১০৫
সূরা ফাতিহা পাঠের বিবরণ .....	১০৫
হানাফী পীর ও আলিমদের সূরা ফাতিহা পাঠের ফাতওয়া এবং আমল .....	১০৬
সূরা ফাতিহা .....	১০৯
আমীনের অর্থ এবং মাহাত্ম্য .....	১১০
আমীন শুনে ইয়াহুদীদের জ্বলন .....	১১২
অন্য কিরাআত বা দ্বিতীয় সূরা পাঠ .....	১১৩
পাঁচ ওয়াক্তের নামাযে সুন্নাতী কিরাআত .....	১১৪
ফজরের নামাযে কিরাআত .....	১১৪
জুম্মু'আর দিনে ফজরে বিশেষ কিরাআত .....	১১৫
যোহর ও আসরের কিরাআত .....	১১৫
মাগরিবের কিরাআত .....	১১৫

বৃহস্পতিবারে মাগরিব ও এশায় বিশেষ কিরাআত .....	১১৬
এশার কিরাআত .....	১১৬
রসূলুল্লাহ ﷺ সাধারণ কিরাআত ও তার বৈশিষ্ট্য .....	১১৬
কুরআনের বিন্যাস অনুযায়ী নামাযের কিরাআত অপরিহার্য কি না? .....	১১৭
রফউল ইয়াদায়ন বা দুই হাত তোলা .....	১১৮
ফেরেশতারাও দুই হাত তোলে .....	১১৯
দুই হাত না তোলার হাদীস বাতিল .....	১২১
দুই হাত তোলা সম্পর্কে হানাফী ফাতওয়া .....	১২১
রফয়ি ইয়াদায়নের অর্থ এবং নেকী .....	১২৩
রুকু কিতাবে করতে হবে .....	১২৪
রুকুর দু'আ .....	১২৪
রুকু ও সিজদায় চুরি ও তার শাস্তি .....	১২৬
রুকু থেকে দাঁড়ানোর পর কওমার দু'আ .....	১২৬
সিজদার বিবরণ .....	১২৯
সিজদার গুরুত্ব .....	১৩০
সিজদা জান্নাতে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গ লাভের কারণ .....	১৩১
সিজদার দু'আ .....	১৩২
জলসা বা দুই সিজদার মাঝখানে বসা .....	১৩৩
জলসার দু'আ .....	১৩৪
দুই সিজদার মাঝখানে বৈঠকের গুরুত্ব .....	১৩৪
দ্বিতীয় সিজদা .....	১৩৬
জলসায়ে ইস্তিরাহাত বা আরামের বৈঠক .....	১৩৬
বালিশের উপর সিজদা চলবে না .....	১৩৭
দ্বিতীয় রাক'আত .....	১৩৭
আস্তাহিয়াতু বা তাশাহুদ .....	১৩৭
আস্তাহিয়াতুর তত্ত্ব কথা .....	১৩৯
তাশাহুদদের গুরুত্ব .....	১৪০
শাহাদাত আবুল তোলার গুরুত্ব .....	১৪০

ইশারা কোন জায়গায় করতে হবে .....	১৪১
তৃতীয় রাক'আত .....	১৪২
চতুর্থ রাক'আত .....	১৪২
৩য় ও ৪র্থ রাক'আতে কিরাআত প্রসঙ্গে .....	১৪২
শেষ তাশাহুদে বসার বিশেষ নিয়ম .....	১৪৪
সুন্নাতী দরুদ .....	১৪৪
আরো কয়েকটি সুন্নাতী দরুদ .....	১৪৬
কতিপয় বিদআতী ও মুশরিকী দরুদ .....	১৪৭
দু'আয়ে মা-সূরাহ .....	১৪৮
সালাম ফিরানোর বিবরণ .....	১৫০
একদিকে সালাম ফেরানো প্রসঙ্গে .....	১৫১
নামাযের পর আল্লাহর যিক্র .....	১৫২
নামাযের পর মাথায় হাত রেখে দু'আ পড়া .....	১৫৬
আঙ্গুলে তাসবীহ গোনা সুন্নাত .....	১৫৭
সংক্ষেপে রসূলুল্লাহ <del>ﷺ</del> এর নামাযের পূর্ণ বিবরণ .....	১৫৯
সালামের পর ইমামের ফিরে বসা এবং পরক্ষণে উঠে যাওয়া সুন্নাত .....	১৬১
নামাযের পর হাত তুলে দু'আ করা .....	১৬২
মুনাজাতের কতিপয় অর্থপূর্ণ দু'আ .....	১৬৫
আল্লাহর হামদ বা প্রশংসা .....	১৬৫
নাবীর উপরে দরুদ .....	১৬৬
কাকুতি মিনতির দু'আ .....	১৬৬
নিজের জন্য দু'আ .....	১৬৭
মা-বাপের জন্য দু'আ .....	১৬৮
স্ত্রী ও সন্তানদের জন্য দু'আ .....	১৬৯
সর্বদা আল্লাহর দয়া চাওয়ার দু'আ .....	১৭০
মুসলমান হয়ে মরার জন্য দু'আ .....	১৭০
দেনা থেকে মুক্তির দু'আ .....	১৭১
পাওনা গণ্ডা পুরোপুরি বুঝে নেয়ার দু'আ .....	১৭১

নামাযে কী করা চলবে ও কী চলবে না .....	১৭২
কতিপয় মাহাত্ম্যপূর্ণ যিকর ও অযীফা .....	১৭৪
দিন ও রাতে নিরাপদ থাকার অযীফা .....	১৭৫
বিছার দংশন থেকে নিষ্কৃতির দু'আ .....	১৭৫
ইস্তিগফার বা ক্ষমা প্রার্থনার মাহাত্ম্য .....	১৭৬
ইস্তিগফারের ফল ইহকাল ও পরকালে .....	১৭৮
শোবার সময় বিশেষ ইস্তিগফার .....	১৭৮
তাসবীহ ও তাহমীদে মাহাত্ম্য .....	১৭৯
অন্ধ, কুষ্ঠ ও পক্ষাঘাত না হবার তসবীহ .....	১৭৯
নিরানব্বইটি রোগের ওষুধ .....	১৮০
জান্নাত এবং জাহান্নামের দু'আ .....	১৮০
আয়াতুল কুরসীর বিশেষ ফযীলত .....	১৮০
অল্প সময়ে কুরআন খতমের নেকী .....	১৮১
বিত্র নামাযের বিবরণ .....	১৮১
বিত্র নামাযে বিশেষ সূরা .....	১৮২
এক তাশাহুদে তিন রাক'আত বিত্র .....	১৮৩
দু'আয়ে কুনূত .....	১৮৫
বিত্রে দু'আ কুনূত রুকূর আগে, না পরে? .....	১৮৬
দু'আ কুনূতে হাত তুলতে হবে কিনা .....	১৮৯
দু'আয়ে কুনূত প্রত্যহ পড়তে হবে কি? .....	১৯১
বিত্রের পরের দু'আ .....	১৯২
কুনূতে নাযিলা .....	১৯২
কুনূতে নাযিলার দু'আ .....	১৯৩
বিত্রের পর দুই রাক'আত নফল নামায .....	১৯৪
বিত্র ও তার পরের নফল প্রসঙ্গে .....	১৯৫
সিজদায়ে সাহুও বা ভুলের সিজদা .....	১৯৬
আত্তাহিয়্যাতে ছুটে গেলে .....	১৯৬
চার রাক'আতের জায়গায় দুই রাক'আত হলে .....	১৯৬



চারের জায়গায় তিন রাক'আত হলে সিজদা.....	১৯৭
পাঁচ রাক'আতে সিজদা.....	১৯৮
সাহুও সিজদা কিভাবে দেয়া হবে?.....	১৯৮
সিজদায়ে সাহুওর পর তাশাহুদ না পড়া সম্পর্কে হানাফী ফকীহদের মতামত.....	২০০
ইমাম ও মুক্তাদীর ভুল হলে.....	২০০
ইমামের ভুল কিভাবে ধরতে হবে.....	২০১
সালামের আগে ও পরে সিজদায়ে সাহুও.....	২০২
কাযা নামাযের বিবরণ.....	২০৩
কাযায়ে উমরী ভিত্তিহীন.....	২০৪
নারী ও পুরুষের নামাযে পার্থক্য আছে কিনা.....	২০৪
নামাযে সুফল না পাবার কারণাবলী.....	২০৭
কতিপয় আয়াতের জওয়াব.....	২১১
নামাযের মধ্যেও আয়াতের জওয়াব দেয়া সুন্নাত.....	২১৪
কতিপয় মাহাত্ম্যপূর্ণ সূরা ও তার অনুবাদ.....	২১৫
সূরা নাস হতে সূরা তাকাসুর.....	২১৫
পরিশিষ্ট.....	২১৯
নামাযের মধ্যে হাত কোথায় থাকবে?.....	২১৯
নামাযের মধ্যে ঝোলানো নিষেধ.....	২২৪
পরের রাক'আতে যমীন থেকে ওঠার নিয়ম প্রসঙ্গে.....	২২৭
পরিশিষ্টের প্রমাণপঞ্জী.....	২৩২
আধুনিক শিক্ষিত ভাইদের প্রতি.....	২৩৫
ইসলামী গ্রন্থরাজীর অর্পূর্ব সমাবেশ.....	২৩৭
লেখক পরিচিতি.....	২৩৯



## নামাযের শর্তাবলী

মহান আল্লাহ বলেন, হে ঈমানদারগণ! যখন তোমরা নামাযের জন্য তৈরী হবে তখন তোমাদের চেহারা ও হাত দু'টো কনুই পর্যন্ত ধুয়ে ফেল এবং মাথাটা মাসাহ কর ও পা দু'টো গাঁট পর্যন্ত ধুয়ে নিও। আর যদি তোমাদের শরীর নাপাক থাকে তাহলে (গোসল করে) পাক হয়ে যেকো। আর যদি তোমরা রোগাক্রান্ত থাক অথবা সফরে থাক, কিংবা পায়খানা থেকে ফিরে আস, অথবা বিবিদের সাথে মেলামেশা করে থাক অতঃপর (গোসল বা অযুর জন্য) পানিও না পাও তাহলে পাক মাটি দিয়ে তায়াম্মুম করে নিও। অর্থাৎ (পাক মাটিতে হাত মেরে) নিজেদের মুখমণ্ডল ও হাতগুলোকে মাসাহ করে নিও। (সূরা মায়িদা ৬)

আল্লাহর এ উক্তিটি প্রমাণ করে যে, নামায পড়তে গেলে তার আগে কয়েকটি জিনিস অতি প্রয়োজনীয়। যেমন মুখ, হাত ও পা ধোয়া অর্থাৎ অযু করা, শরীর নাপাক থাকলে গোসল করা এবং অযু ও গোসলে অসুবিধা হলে তার পরিবর্তে তায়াম্মুম করা ইত্যাদি। এগুলো হল নামাযের আনুষঙ্গিক বিষয়, যাকে শর্ত বলা হয়। সেজন্য নামাযের আসল বক্তব্য আলোচনা করার আগে তার শর্তাবলীর আলোচনা সর্বপ্রথমে হওয়া একান্ত প্রয়োজন। অযু, গোসল ও তায়াম্মুম প্রভৃতির বাকী নাম হল তাহারত বা পবিত্রতা অর্জন। সেজন্য তাহারতের আলোচনা শুরু করছি। আল্লাহ আমায় তওফীক দিন-আমীন।

## তাহারত বা পবিত্রতা অর্জনের বিবরণ

মহানবী ﷺ বলেন, পবিত্রতা অর্ধেক ঈমান- (মুসলিম, তিরমিযী)। তিনি বলেন, জান্নাতের চাবি হল নামায এবং নামাযের কুঞ্জি হল পবিত্রতা- (মুসনাদে আহমাদ, আবু দাউদ, তিরমিযী, দারিমী, ইবনে মাজাহ, মিশকাত পৃঃ ৩৯-৪০)। উল্লিখিত দু'টি হাদীস দ্বারা তাহারতের গুরুত্ব প্রমাণিত হয়। মুজাদ্দিদে উলুম ইমাম

নওয়াব সিদ্দিক হাসান খান (রহঃ) বলেন, মানুষের ভেতরের ও বাইরের উভয় প্রকার তাহারতই অর্ধেক ঈমান। এ তাহারতের চারটি স্তর আছে। তা হল এইঃ (১) আল্লাহ ছাড়া দিলের মধ্যে থেকে অন্য সব রকম ময়লা দূর করা। যাতে 'লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহু'র ভাব মানুষের অন্তরে মজ্জাগত হয়ে যায়। এটা হল সিদ্দীকদের তাহারত এবং এ পবিত্রতা হল অর্ধেক ঈমান। (২) দিলকে নাপাক স্বভাব; যেমন হিংসা, বিদ্বেষ, লালসা, শত্রুতা ও অহংকার প্রভৃতি থেকে পাক করা এবং সদগুণ যথা নম্রতা, ভদ্রতা, খোদাভীতি, সবর ও প্রেমপ্রীতি দ্বারা সজ্জিত করা। এটা হল মুত্তাকীদের তাহারত। উল্লিখিত কুস্বভাব থেকে পাক হওয়া অর্ধেক ঈমান। (৩) অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলোকে গুনাহ থেকে পাক রাখা- যেমন গীবত করা, মিথ্যা বলা, হারাম খাওয়া, হারাম জিনিস দেখা প্রভৃতি। এটা হল সৎলোকদের তাহারত। এসব হারাম জিনিস থেকে শরীর পাক রাখা অর্ধেক ঈমান। (৪) সমস্ত শরীর ও লেবাস-পোষাককে সব রকম নাপাক জিনিস থেকে পাক রাখা এবং নামাযের রুকন যথা রুকু, সিজদা প্রভৃতি দ্বারা শরীরকে শোভিত করা। এটা হল সর্বসাধারণ মুসলমানের পবিত্রতা। কারণ মুসলমান ও কাফিরের মধ্যে পার্থক্যই হল এ নামায। সুতরাং এ পবিত্রতাও অর্ধেক ঈমান।

(বায়লুল মানফাআহ লিয়ীয়া-হিল আরকা-নিল আরবাআহ পৃঃ ৯)

শরীরের বাহ্যিক অঙ্গগুলোকে পাক করার দু'টি উপায় আছে : (১) গোসল করা, (২) অযু করা। গোসল ও অযুতে কোনরূপ অসুবিধা দেখা দিলে তায়াম্মুম করতে হয়। সেজন্য তাহারত আলোচনার পর আমি ধারাবাহিকভাবে গোসল, অযু ও তায়াম্মুমের বিবরণ পেশ করছি।

## কতিপয় লজ্জাকর ও অত্যন্ত জরুরী মাসআলা

কতিপয় বিষয় এমন লজ্জা ও শরমের থাকে যা বর্ণনা করতেও লজ্জাবোধ হয়। কিন্তু ঐ বিষয়গুলো যদি শরীআত সম্পর্কিত হয় তাহলে শরীআতের মাসআলা হিসেবে সেগুলো বর্ণনা করা অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায়। এজন্য বলা হয় যে শরীআতে লজ্জা শরম নেই। যদি লজ্জা শরমের মাথা খেয়ে ঐসব মাসআলা বয়ান না করা হয় তাহলে ধর্মের মধ্যে সংকীর্ণতা এসে যায় এবং বর্ণনাকারীকে গোনার ভাগী হতে হয়। যেমন ধরুন, মেয়েদের হাযিয় ও নিফাস থেকে পবিত্র হওয়ার সাথে নামাযের মাসআলা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। নারী পুরুষের স্বপ্নদোষ ও স্বামী স্ত্রীর মিলনের পর ফরয গোসলের সাথেও নামাযের বিষয়াদি অঙ্গাঙ্গীভাবে সম্পৃক্ত। সুতরাং নামাযের

বিষয় লিখতে গেলে ঐসব লজ্জাকর বিষয়গুলো খুলে খুলে লিখতে আমরা বাধ্য। আপনারা জানেন যে, সাত বছর বয়সে ছেলে মেয়েকে নামাযের তালিম দিতে বলা হয়েছে এবং দশ বছর বয়সে যদি তারা নামাযে গাফলতি করে তাহলে তাদেরকে মারধোরেরও হুকুম দেয়া হয়েছে। (আবু দাউদ, মিশকাত পৃঃ ৫৮)

আমাদের দেশে সচরাচর ১৩/১৪ বছর বয়সে মেয়েদের হায়িয আসে এবং ১৫/১৬ বছর বয়সে ছেলেদের বীর্য জন্মে। সুতরাং একটি ছেলে ও মেয়ে যদি সত্যিকার ও দীনদার মুসলমান হয় তাহলে ঐ বয়সের মধ্যেই তাকে উল্লেখিত নাপাকী থেকে পাক হবার মাসআলাবলী জানতে হবে। অন্যথায় পাক না হবার কারণে তার ঈমান অর্ধেক থাকবে। আমরা জানি যে, নাজাসাত থেকে তাহারত অর্থাৎ অপবিত্রতা থেকে পবিত্রতা অর্জনের নিয়মাবলী জানার জন্য বহু প্রাপ্তবয়স্ক ও বুড়ো লোকও যেমন এ বইটি পড়বেন, তেমনি ঐসব মাসআলাবলী জানার জন্য ১০/১২ বছরের অনেক কিশোর-কিশোরীও এ বইটি পড়বে। সেদিক দিয়ে কোন বাড়ীতে এ বইটি হয়ত বাপ ও বেটা এবং মা ও বেটি উভয়ই পড়তে পারে। যেটা বাহ্যদৃষ্টিতে কারো কারো চোখে ও বিবেকে কেমন ঠেকতে পারে, তাই তাদের জন্য কথাগুলো লিখলাম।

এ প্রসঙ্গে এ কথাগুলো জেনে রাখবেন যে, আল্লাহর গযবের ভয়ে বহু নারী সাহাবী লজ্জা না করে নাবী ﷺ-এর কাছে এসে হায়িয, নিফাস ও স্বপ্নদোষের মাসআলা জিজ্ঞেস করেছেন এবং নাবী ﷺ তাদেরকে সে মাসআলা বলে দিয়েছেন। নাবী ﷺ-এর জামাই আলী (রাঃ) মযী (শরীর উত্তেজিত হলে পেশাবের রাস্তা দিয়ে চটচটে লাল বের হয় তাকে মযী বলে) সম্পর্কে মাসআলাটি মিকদাদ সাহাবীর মাধ্যমে নাবীর কাছ থেকে জেনে নেন এবং 'উমর (রাঃ) তাঁর ছেলে আব্দুল্লাহর সামনে নাবীর কাছ থেকে স্ত্রী সহবাসের পর কী করতে হবে সে মাসআলা জিজ্ঞেস করেন। সাহাবায়ে কিরাম যদি বাপ-বেটা ও শ্বশুর-জামাই পরস্পরে লজ্জাবোধ না করে শরীআতের মাসআলা জানতে পারেন তাহলে আপনার ও আমার লজ্জা কিসের? আজকের যুগে বাপ-বেটা এক সাথে বসে সিনেমার পর্দায় ও টেলিভিশনে যদি নায়ক নায়িকার উলঙ্গ প্রেম নিবেদন দেখতে লজ্জা না করে, অশ্লীল গান শুনতে শরম না পায়, তাহলে শরীআতের বিষয়ে লজ্জা কিসের? তাই এবার কিছু লজ্জাকর কথা লিখছি।

## কী কী কারণে গোসল ফরয হয়

নিম্নলিখিত কারণে গোসল ফরয হয় : (১) নারী পুরুষ মিলন হলে, (২) স্বপ্নদোষে বীর্যপাত হলে, (৩) মেয়েদের হায়িয ও নিফাসের রক্ত বন্ধ হলে ও (৪) ইসলাম গ্রহণ করলে।

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, যখন পুরুষের লিঙ্গ স্ত্রীলিঙ্গের সাথে একত্রিত হয় তখন গোসল ফরয হয়ে যায়— (তিরমিযী, ইবনে মাজাহ)। এ হাদীস এবং বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত আবু হুরায়রার হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, নারী ও পুরুষের মিলন হলেই গোসল ফরয। বীর্যপাত হোক বা না হোক তার কোন শর্ত নেই— (মিশকাত পৃঃ ৪৮)।



হানাফী ফিক্হ বলেন, যদি কেউ কোন জন্তু অথবা মৃত ব্যক্তি কিংবা ছয়, সাত বা আট বছরের নাবালিক মেয়ের সাথে সঙ্গম করে তাহলে বীর্যপাত না হলে গোসল ফরয হবে না— (শুনায়াতুল মুস্তামলী ওরফে কাবীরী পৃঃ ৪০)। এ ফাতওয়া'র প্রমাণে কোন আয়াত ও হাদীস পাওয়া যায় না।

কিন্তু ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, যদি কারো লিঙ্গের মাথাটা কোন নারী কিংবা জন্তুর স্ত্রীলিঙ্গে অথবা ওদের গুহ্যদ্বারে কিংবা কোন পুরুষের গুহ্যদ্বারে লুকিয়ে যায় তাহলে গোসল ফরয হবে। এরূপ কোন নারীর স্ত্রীলিঙ্গে যদি কোন পুরুষের অথবা জন্তুর কিংবা মৃত ব্যক্তির অথবা নাবালক ছেলের লিঙ্গ প্রবেশ করে তাহলে ঐ নারীর উপরে গোসল ফরয হবে— (রওয়াতুত্ তলিবীন ১ম খণ্ড পৃঃ ৮১)। এ ফাতওয়া'টি আগে বর্ণিত হাদীসটির বাহ্যিক ভাবের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তাই আহলে হাদীসদের মতেও গোসল ফরয হবে।

একদা উম্মে সুলাইম বলেন, হে আল্লাহর রসূল ﷺ! নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা হক কথা বলতে লজ্জা করেন না (অতএব আমার মাসআলা জিজ্ঞেস করতে এবং আপনার জওয়াব দিতে লজ্জা কিসের) স্বপ্নদোষ হলে মেয়েদের উপর গোসল ফরয কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ, যদি সে পানি অর্থাৎ বীর্য দেখে। কথাটি শুনে নাবী ﷺ-এর বিবি উম্মে সালামা (যিনি প্রশ্নকারিণী উম্মে সুলাইমের পাশে ছিলেন শরমে) মুখ ঢেকে নেন এবং বলেন, ইয়া রসূল্লাহ! মেয়েদেরও স্বপ্নদোষ হয় কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ তোমার ডান হাত মাটিতে মিশে যাক (এ কথাটাও জান না) তাহলে সন্তানরা মেয়েদের মত হয় কেন? (বুখারী ও মুসলিম) সহীহ মুসলিমে উম্মে সুলাইমের রিওয়ায়াতে এতটা বেশী আছে যে, পুরুষদের বীর্য গাঢ় ও সাদা হয়

এবং মেয়েদের বীর্ঘ পাতলা ও হলদে হয়। উভয়ের মধ্যে যার বীর্ঘ বেশী হয় কিংবা যার আগে বের হয় সন্তানটি তার মত হয়। তিরমিযী ও আবু দাউদে 'আয়িশার রিওয়ায়াতে আছে যে, যদি কেউ ঘুম থেকে উঠে কাপড় ভিজ়ে দেখে এবং স্বপ্নের কথা মনে না থাকে তাহলেও তার উপর গোসল ফরয। আর কারো যদি স্বপ্ন মনে থাকে অথচ তার কাপড় ভিজ়া না পায় তাহলে তার উপরে গোসল ফরয নয়।

(মিশকাত পৃঃ ৪৮)

এ প্রসঙ্গে এটাও জানা দরকার যে, পেশাবের দ্বার দিয়ে পেশাব ছাড়াও আরো তিন রকম তরল পদার্থ বের হয় যাকে আরবীতে মনী, মযী ও অদী বলে। তিনটির মধ্যে মযী ও অদী বের হলে গোসল ফরয হয় না। বরং পেশাবের দ্বার এবং শরীরের কোন জায়গায় বা কাপড়ে ঐ পদার্থ লাগলে তা ধুয়ে ফেলতে হবে। অযু অবস্থায় হলে অযু নষ্ট হয়ে যাবে। সে জন্য প্রয়োজনে আবার অযু করতে হবে। যৌন উত্তেজনার সময় বিনা বেগে পেশাবের দ্বার দিয়ে সাদা আঠায়ুক্ত যে চটচটে পানি বের হয় তাকেই মযী বলে। কখনো বিনা অনুভূতিতেও এ পানি বের হয়। সাধারণতঃ যুবক ও শক্তিশালী লোকদের যৌন উত্তেজনার সময় এটা বের হয়। এ মযী সম্বন্ধে নাবী -কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, এর জন্য অযু যথেষ্ট। আর কাপড়ে লাগলে যেখানে লাগবে সেখানে এক আঁজলা পানি দিয়ে ধুয়ে দাও- (আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ)। এবং লিঙ্গটাও ধুয়ে ফেল- (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৪০ পৃঃ)। পেশাবের পূর্বে কিংবা পরে যে গাঢ় সাদা পানি বের হয় তাকে অদী বলে। অদী সম্বন্ধে 'আয়িশা (রাঃ) বলেন, পেশাবের পর অদী বের হলে লিঙ্গ ও অণ্ডকোষ দু'টি ধুতে হবে এবং অযু করতে হবে। গোসল করতে হবে না। ইবনে আব্বাসও (রাঃ) তাই বলেন- (বায়হাকী ১ম খণ্ড ১১৫ পৃঃ, ইবনুল মুনিযির, ফিকহুস সুন্নাহ ১ম খণ্ড ২৬ পৃঃ)। আর উত্তেজনার বশে পিচকিরি মারার মত যে তরল পদার্থ পেশাবের রাস্তা দিয়ে বের হয় তাকে মনী বা বীর্ঘ বলে। বীর্ঘ কাপড়ে লাগার ব্যাপারে এক প্রশ্নের উত্তরে নাবী  বলেন, এটা হল থুথু ও কফের মত। রুমাল কিংবা ঘাস দিয়ে মুছে ফেললে যথেষ্ট হবে- (দারাকুতনী ১ম খণ্ড ৪৬ পৃঃ)।

এ বীর্ঘ যদি কোনরূপ বৈধ বা অবৈধ উপায়েও "সবেগে" বের হয় তাহলে গোসল ফরয হবে। আর যদি ধাতুদৌর্বল্য ও মেহ প্রভৃতি অসুখের কারণে সবেগে না হয়ে বিনা বেগে বা অসাড়ে বীর্ঘ বের হয় তাহলে গোসল ফরয হবে না। কেবল গুণ্ডাঙ্গ ধুয়ে অযু করতে হবে। (বুখারী ও মুসলিম)

ইবনে 'উমর (রাঃ) বলেন, আগে নামায পঞ্চাশ ওয়াস্ত এবং সহবাসজনিত গোসল সাতবার ও পেশাব লাগা কাপড় সাতবার ধোয়ার নির্দেশ ছিল। তাই রসূলুল্লাহ ﷺ প্রার্থনা করতে থাকেন। পরিশেষে নামায পাঁচ ওয়াস্ত এবং সহবাসের গোসল একবার ও পেশাব লাগা কাপড় একবার ধোয়ার নির্দেশ দেয়া হয়। (আবু দাউদ, মিশকাত ৪৯ পৃঃ)

এক প্রশ্নের উত্তরে নাবী ﷺ ফাতিমা বিনতে আবী হুবায়শকে বলেন, যখন তোমার হাযিয় আসে তখন নামায ছেড়ে দাও এবং যখন তা চলে যায় তখন গোসল কর এবং নামায পড়। (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৫৬ পৃঃ)

নিফাসওয়ালীদের সাতটি দিন গত হওয়ার পর যদি তারা পবিত্রতা দেখে অর্থাৎ খুন বন্ধ হয়ে যায় তাহলে তারা যেন গোসল করে এবং নামায পড়ে। (মুসতাদরকে হাকিম ১ম খণ্ড ১৭৬ পৃঃ, কানযুল উম্মাল ৯ম খণ্ড ২৪৫ পৃঃ)

কোন অমুসলিম ইসলাম গ্রহণ করলে তার জন্য গোসল ফরয, না সুন্নাত এ ব্যাপারে মতভেদ আছে। ইমাম আহমাদের মতে ওয়াজিব, বাকীদের মতে সুন্নাত। তাই আমি এ বইয়ে ঐ গোসল ফরয ও সুন্নাত দুই লিখেছি। তবে সুন্নাতের দিকে অধিকাংশ বিদ্বানের মত বলে সুন্নাতী গোসলের বিবরণে আমি ওর দলীল পেশ করেছি।

## ফরয গোসলের নিয়মাবলী

হযুরের বিবি মায়মূনা বলেন, একদা আমি নাবী ﷺ-এর জন্য গোসলের পানি রেখে একটা পর্দা দিয়ে আড়াল করে দেই। অতঃপর তিনি দুই হাতে পানি ঢেলে দু'বার ধুলেন, তারপর ডান হাত দ্বারা পানি ঢেলে বাম হাত দিয়ে লজ্জাস্থান ধুলেন, অতঃপর মাটিতে হাতটি রগড়ে পানি দিয়ে ধুলেন, তারপর কুদী করলেন ও নাকে পানি দিলেন এবং মুখ ও দুই হাত কনুই পর্যন্ত ধুলেন, তারপর মাথায় পানি ঢেলে সমস্ত শরীরে পানি পৌঁছালেন। অতঃপর সেখান থেকে একটু সরে গিয়ে দুই পা ধুলেন। এরপর শরীর মোছার জন্য আমি তাকে একটি কাপড় দিলাম। কিন্তু তিনি সেটা নিলেন না, বরং হাত দু'টি ঝাড়তে ঝাড়তে চলে গেলেন। 'আয়িশা (রাঃ)-এর বর্ণনায় আছে যে, প্রথমে তিনি ﷺ দুই হাত ধোবার পর নামাযের অযূর মত অযূ করতেন, তারপর ভিজ়ে হাত দিয়ে মাথার চুলগুলো খেলাল করতেন, তারপর মাথায় তিন আঁজলা পানি দিয়ে সর্বাঙ্গ ধুতেন- (বুখারী ও মুসলিম)।



রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, প্রত্যেক চুলের নীচে নাপাকী রয়েছে। সুতরাং চুলগুলোকে ভাল করে ধোও এবং চামড়াগুলো (রগড়ে রগড়ে) ভাল করে পরিষ্কার কর— (তিরমিযী, আবু দাউদ)। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি ফরয গোসলে এক চুল পরিমাণ জায়গা ছেড়ে দেয়, (অর্থাৎ শুকনো রাখে) ধোয় না তাকে আযাব দেয়া হবে। সেজন্য আলী (রাঃ) বলেন, এ (শুকনো থাকবার ভয়ের) কারণে আমি আমার মাথার সাথে দুশমনী করেছি, এজন্যই আমি আমার মাথার সাথে শত্রুতা করেছি— (আবু দাউদ)। অর্থাৎ মাথার চুলের গোড়া যাতে শুকনো না থেকে যায় সেজন্য আলী (রাঃ) মাথার চুল মুড়িয়ে দিয়ে ন্যাড়া হতেন। 'আয়িশা (রাঃ) বলেন, নাবী ﷺ ফরয গোসলের পর আর অযু করতেন না— (তিরমিযী, আবু দাউদ)। বরং গোসলের শুরুতে যে অযু করতেন সেটাকেই যথেষ্ট মনে করতেন। তবে হ্যাঁ, গোসলের শেষ দিকে ঐ অযু যদি নষ্ট হয়ে যায়, কিংবা কাপড়ের ভিতর দিয়ে লজ্জাস্থানে হাত লেগে যায় তাহলে আবার অযু করতে হবে। ফরয গোসলের পর যদি শরীরের কোন জায়গা শুকনো থেকে যায় তাহলে নামাযের আগে সেই শুকনো জায়গাটায় ভিজ়ে হাত ফিরিয়ে দিলে যথেষ্ট হবে— (ইবনে মাজাহ, মিশকাত ৪৮-৪৯ পৃঃ)। পুনরায় গোসল করতে হবে না।

## নাপাক মেয়েদের চুলের মাসআলা

হযুরের বিবি উম্মে সালামা (রাঃ) বলেন, আমি একদিন আল্লাহর রসূল ﷺ-কে বললাম, হে আল্লাহর রসূল ﷺ! আমি মেয়ে মানুষ নিজের মাথার চুলগুলোকে খুব আঁটসাঁট করে (ঝুটি বা খোঁপা) বাঁধি। সহবাস জনিত অথবা হায়েযের গোসলের কারণে ঐ বাঁধা চুল খুলে ফেলব কি? তিনি বললেন, না। তবে তোমার জন্য এতটুকু যথেষ্ট যে, তুমি তিন আঁজলা পানি মাথায় ঢেলে দিও এবং তারপর সারা শরীরে পানি পৌছে দিও, তাহলে তুমি পাক হয়ে যাবে— (মুসলিম, বুলুগুল মারাম ১০ পৃঃ, মিশকাত ৪৮ পৃঃ)। তবে হায়িযওয়ালী নারী যখন হজ্জের ইহরাম বাঁধার জন্যে গোসল করবে তখন তাকে তার বাঁধা চুলও খুলতে হবে— (মুসলিম)। আর যারা চুল বাঁধে না, বরং এলোমেলোভাবে খুলে রাখে তাদের চুলগুলো খুলে খুলে ভাল করে ধুতে হবে।

## নাপাক লোকদের জন্য কতিপয় বিশেষ জ্ঞাতব্য

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, যে ঘরে ছবি, কুকুর ও নাপাক নারী বা পুরুষ থাকে সে ঘরে (রহমতের) ফেরেশতা আসে না যতক্ষণ না সে অযু করে- (আবু দাউদ, মিশকাত ৫০ পৃঃ)। একদা 'উমর (রাঃ) রসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলেন যে রাতে নাপাক অবস্থায় কি করব? তিনি বললেন, অযু কর এবং লজ্জাস্থান ধুয়ে ফেল- (বুখারী ও মুসলিম)। তিনি বলেন, যদি তোমাদের কেউ তার বিবির সাথে একবারের বেশি সহবাস করতে চায় তাহলে প্রতিবার (গোসল না করে) মাঝখানে অযু করে নেবে- (মুসলিম)। মুসতাদরাকে হাকিমে আছে যে, এ অযুটা পরবর্তী সহবাসের জন্য খুবই উৎফুল্লের কারণ হয়- (বুলুগুল মারাম ১০ পৃঃ)। সর্বশেষে নামাযের আগে অবশ্য একবার গোসল করে নিতে হবে। 'আয়িশা (রাঃ) বলেন, নাবী ﷺ যখন সহবাসজনিত নাপাক হবার পর কিছু খাবার অথবা ঘুমাবার ইচ্ছা করতেন তখন নামাযের অযুর মত অযু করে নিতেন- (বুখারী ও মুসলিম)। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, হাযিয়ওয়ালী নারী ও নাপাক নারী বা পুরুষ যেন কুরআন না পড়ে- (তিরমিযী) এবং মাসজিদেও না যায়- (আবু দাউদ)। তবে তারা কুরআন পড়া শুনতে পারে এবং গেলাফসহ কুরআন ছুঁতে পারে ও হাত বাড়িয়ে মাসজিদে কিছু রাখতে বা কোন জিনিস বের করতে পারে। 'আয়িশা (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ সহবাসের পর গোসল করে আমার গায়ে গা ঠেকিয়ে নিজের শরীর গরম করে নিতেন। অথচ আমি তখন ফরয গোসল না করে নাপাক থাকতাম- (ইবনে মাজাহ)। এ হাদীস এবং বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত আবু হুরায়রার রিওয়ায়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে জুনুবী (অর্থাৎ সহবাস কিংবা স্বপ্নদোষজনিত নাপাক) লোকের সাথে উঠাবসা, মেলামেশা, লেনদেন, খাওয়া-দাওয়া, সালাম ও মুসাফাহা সবই চলতে পারে। ইবনে আব্বাস বলেন, নাবী ﷺ এর কোন বিবি একটি পাত্রে ফরয গোসল করেন। অতঃপর রসূলুল্লাহ ﷺ ঐ পাত্রের পানি দিয়ে অযু করার ইচ্ছা করলেন। তখন ঐ বিবি বললেন, আমি জুনুবী বা নাপাক ছিলাম। জওয়াবে রসূল ﷺ বললেন, পানি নাপাক হয় না- (তিরমিযী, আবু দাউদ)। অর্থাৎ নাপাক লোক কোন পানিতে হাত ডুবিয়ে গোসল করলে বাকি পানিটা নাপাক হয় না। 'আয়িশা (রাঃ) বলেন, আমি ও রসূলুল্লাহ ﷺ দু'জনে একসাথে একই পাত্রে হাত ডুবিয়ে ফরয গোসল করতাম- (বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত ৪৮-৫০ পৃঃ)।

ইবরাহীম বলেন, জুব্বী মাসজিদের উপর দিয়ে যাবে না, তবে যদি কোন রাস্তা না পায় তাহলে যেতে পারবে। ইবনে মুসাইয়িব বলেন, পার হবার সময় সে যেন মাসজিদে না বসে। (মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বা ১ম খণ্ড, ১৪৬ পৃঃ)

ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, তুমি যদি ফরয গোসলে কুলী করতে এবং নাকে পানি দিয়ে ঝাড়তে ভুলে যাও তাহলে নামায পুনরায় পড়- (মুসান্নাফ আব্দুর রায্যাক, তাবারানী স গীর, কানযুল উম্মাল ৯ম খণ্ড ৩৩১ পৃষ্ঠা)। মাথায় যদি ফোড়া বা ঘা থাকে এবং সমস্ত শরীর ভাল থাকে তাহলে মাথা মাসাহ করে গোটা শরীরকে পানি দিয়ে ধুতে হবে। পায়ে যদি ফোড়া বা ঘা থাকে এবং পানি লাগলে ক্ষতির আশংকা থাকে তাহলে গোসল না করে তায়াম্মুম করে নামায পড়বে- (হাকিম ১ম খণ্ড, ১৬৫ পৃষ্ঠা)। মনে কোন রকম কিছু বোধ করবে না এবং নামায ছাড়া যাবে না- (দসতুরুল মুত্তাকী)।

## সুন্নাত গোসলের কারণাবলী

নিম্নলিখিত ৭টি কারণে গোসল সুন্নাত হয় : (১) জুমু'আর নামাযের আগে, (২) দুই ঈদের দিনে ঈদগাহে যাবার আগে, (৩) হজ্জের ইহরাম বাঁধার পূর্বে, (৪) মক্কা শরীফ পৌছলে, (৫) লাশকে গোসল করলে, (৬) শিক্কা লাগালে, (৭) বিধর্মী মুসলমান হলে।

'আয়িশা (রাঃ) বলেন, নাবী ﷺ জুমু'আর দিনে এবং মুরদাকে গোসল করলে ও শিক্কা লাগালে গোসল করতেন- (আবু দাউদ)। কায়স ইবনে আসিম যখন মুসলমান হন তখন নাবী ﷺ তাকে পানিতে কুলপাতা মিশিয়ে গোসল করার হুকুম দেন- (তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসায়ী, মিশকাত ৫৫ পৃঃ)। যায়দ ইবনে সাবিত (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নাবী ﷺ ইহরামের জন্য গোসল করতেন- (তিরমিযী, বুলুগুল মারাম ৫২ পৃঃ)। ইবনে 'উমর (রাঃ) বলেন, নাবী ﷺ মক্কায ঢোকবার আগে যু-তওয়ায (মক্কার নিকটবর্তী একটি জায়গায়) রাত কাটিয়ে সকালে গোসল করে মক্কায ঢুকতেন- (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ২২৬ পৃঃ)। নাবী' বলেন, ইবনে 'উমর (রাঃ) ঈদুল ফিতরের দিন ঈদগাহে যাবার আগে গোসল করতেন- (মুওয়াত্তা ইমাম মালিক ৬২ পৃঃ)।

বাদরে মুনীর গ্রন্থ প্রণেতা বলেন, দুই ঈদে গোসল সংক্রান্ত সমস্ত হাদীস যথার্থ। তবে সাহাবীদের আসারগুলো উত্তম। (নায়লুল আওতার ১ম খণ্ড ২৩৯ পৃঃ)

## গোসলের বিভিন্ন আদব কায়দা

‘উসমান ও ‘আলী (রাঃ) প্রতিদিন গোসল করতেন- (মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বা ১ম খণ্ড, ১৯৯ পৃঃ)। হানাফী ফিক্‌হ বলে, গোসলের সময় কিবলার দিকে মুখ করা উচিত, তবে উলঙ্গ অবস্থায় নয়- (কাবীরী ৪৯ পৃঃ)।

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে উলঙ্গ হতে নিষেধ করেছেন। অতএব তোমরা আল্লাহর ফেরেশতাদেরকে লজ্জা কর যারা তোমাদের কাছ থেকে আলাদা হন না। তবে পায়খানা, সহবাস ও গোসলের তিন সময় ছাড়া। তাই তোমাদের কেউ যখন ফাঁকা জায়গায় গোসল করবে তখন সে কাপড় দিয়ে কিংবা প্রাচীর দিয়ে অথবা উট দিয়ে আড়াল দেবে- (মুসান্নাফ বাযযার, কানযুল উম্মাল ৯ম খণ্ড ২২৮ পৃঃ)। ‘উমর (রাঃ) একদা এক হাওয়ের কাছে আসেন যেখানে পুরুষ ও নারী সবাই অযু করছিল। অতঃপর তিনি তাদেরকে চাবুক মারলেন। তারপর তিনি হাওযওয়ালাকে বললেন, পুরুষদের জন্য এবং মেয়েদের জন্য আলাদা হাওয বানাও- (মুসান্নাফ আবদুর রায়যাক, কানয ৯ম খণ্ড ৩৪২ পৃষ্ঠা)। যেসব শহরে ও পল্লীতে নারী ও পুরুষ একই কলে ও পুকুরে গা-ধোয় তাদের একটু হুশ হওয়া উচিত।

লোকচক্ষুর অগোচরে নির্জন জায়গায় উলঙ্গ হয়ে গোসল করা যাবে। যেমন মুসা ও আইয়ুব (আঃ) উলঙ্গ হয়ে গোসল করতেন- (বুখারী ১ম খণ্ড পৃঃ ৪২, নাসায়ী ১ম খণ্ড ৪৬ পৃষ্ঠা)। গোসলখানার ভিতরে উলঙ্গ হয়ে গোসল করা যাবে।

গোসলের সময় শরীরের কোন অঙ্গ আগে ও পিছে ধোয়ার ব্যাপারে বাধ্যবাধকতা নেই। তবে পছন্দনীয় মতে অযূর অঙ্গগুলো প্রথমে ধোয়া, তারপর দেহের উপরের অংশ থেকে নীচের দিকে ধোয়া উচিত। গোসল করা অবস্থায় যদি বাতকর্ম হয় তাহলে গোসল পুনরায় করতে হবে না। কিন্তু গোসলের শেষে অযু না করে নামায পড়া যাবে না। (রওয়াতুত তলিবীন ১ম খণ্ড, ৯০ পৃষ্ঠা)

অযু ও গোসলের পানি কতটা খরচ করা যাবে- সে ব্যাপারে কোন বাঁধাধরা নিয়ম নেই। তবে অযূর পানি এক মুদ এবং গোসলের পানি এক সা’র কম হওয়া উচিত নয়- (ঐ পৃষ্ঠা- ঐ)। তাই বলে অপব্যয় করা যাবে না। মুদ (হিজাবী) হল আনুমানিক ৭৫০ গ্রাম এবং সা’ যা কেজি। গোসল করা অবস্থায় কোন দু’আ রসূলুল্লাহ ﷺ থেকে প্রমাণিত নেই।

## অপারগ ব্যক্তিদের গোসল

আল্লাহ বলেন, “তিনি তোমাদেরকে সুবিধা দিতে চান এবং কষ্টে ফেলতে চান না”- (সূরা বাকারা ১৮৫ আয়াত)। তাই কোন সুস্থ ব্যক্তি যদি রাতে ঠাণ্ডাতে গোসল করতে বাধ্য হয় এবং তার যদি দৃঢ় বিশ্বাস হয় যে, ঠাণ্ডা পানিতে গোসল করলে অসুখ হবে তাহলে সে গরম পানি দিয়ে গা ধোবে। তখন যদি সে গরম পানি না পায় তাহলে তায়াম্মুম করে ফজরের নামায পড়বে এবং বেলা হলে রোদ ফুটলে গোসল করবে।

কোন রুগী যদি রাতে গোসল করতে ভয় পায় যে, অসুখ বাড়তে পারে তাহলে সে দিনে গা ধোবে। যদি দিনেও গোসল করলে অসুখ বাড়ার আশংকা হয় তাহলে সে দিনরাতে তায়াম্মুম করে নামায পড়বে। আর যখন তার প্রাণের আশংকা ও রোগ সেরে যাবে তখন সে গোসল করে নামায পড়বে। ঐ অবস্থায় অযু যদি তার রোগ না বাড়ায় তাহলে সে তায়াম্মুম না করে অযু করে নামায পড়বে। কোন মুসাফির যদি সফরে গরম পানি না পায় এবং ঠাণ্ডা পানিতে গোসল করলে ক্ষতির আশংকা হয় তাহলে সে তায়াম্মুম করবে- (আবু দাউদ ১ম খণ্ড, ৪৮ পৃঃ)। সুস্থ ব্যক্তির যখন অসুখের ভয় থাকে না তখন সে যদি ঠাণ্ডার বাহানা করে তাহলে তার জন্য তায়াম্মুম মোটেই জাযিয় নয়। বিনা গোসলে ও অযুতে তার নামায কখনই হবে না। তার উচিত আল্লাহকে ভয় করা এবং নিজেকে ধোঁকা না দিয়ে অযু ও গোসল করে নামায পড়া।

যে ব্যক্তির কোন অঙ্গে পানি লাগলে ক্ষতির আশংকা আছে, সে তাতে মাসাহ করবে এবং বাকি দেহ পানি দিয়ে ধোবে ও নামায পড়বে। সর্দি অবস্থায় পানি লাগার কারণে সর্দি যদি বেড়ে যাবার ভয় থাকে তাহলে মাথা মাসাহ করে বাকি শরীর ধুয়ে ফেলবে। কোন চোটের জায়গায় যদি পট্টি বাঁধা থাকে এবং তা খুললে যদি কোন অসুবিধা দেখা দেয় তাহলে পট্টি না খুলে তার উপরে মাসাহ করে বাকি অঙ্গ ধুয়ে ফেলতে হবে। (আবু দাউদ ও দারাকুতনী)

যে ব্যক্তির বাতকর্ম আপনা আপনি হয়ে পড়ে কিংবা পেশাবের বিন্দু সর্বদা টপতে থাকে এবং নামাযের মধ্যে এ অবস্থায় কয়েকবার হয়ে থাকে তাহলে এরূপ ওযরওয়ালা ব্যক্তি প্রত্যেক নামাযের জন্য অযু করবে। এক ওয়াক্তের জন্য তার কাপড়কে পাক ধরা হবে। (দস্তুরুল মুত্তাকী ৩৭-৩৮ পৃঃ)

## হায়িযের বিবরণ

মেয়েরা বয়সপ্রাপ্ত হলে তাদের জরায়ু হতে প্রতি মাসে নির্দিষ্ট কয়েকদিন স্বাভাবিকভাবে খুন বের হয়। ঐ খুনকে হায়িয বলে। এ হায়িয সম্পর্কে রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আমার বন্ধু জিবরাঈল (আঃ) আমাকে খবর দিয়েছেন, আল্লাহ তা'আলা তাকে আমাদের মা হাওয়া (আঃ)-এর কাছে পাঠান যখন তিনি হায়িযওয়ালাী হন। অতঃপর তিনি নিজ প্রভুকে ডেকে বলেন, আমার ভেতর থেকে খুন এসেছে, যা আমি কোনদিন দেখিনি। তখন আল্লাহ বলেন, আমি তোমাকে এবং তোমার সন্ততিদেরকে নিশ্চয়ই হায়িযওয়ালাী করতে থাকব এবং ঐ হায়িযকে ওনাহের কাফফারা ও পবিত্র করণের উপায় বানিয়ে দেব। (দারাকুতনী আল আফরাদ, দায়লামী, কানযুল উয়াল ৯ম খণ্ড ৩৭১ পৃঃ)

যখন কোন নারী গর্ভবতী হয় তখন এ হায়িয আল্লাহর কুদরতে গর্ভজাত শিশুর খাদ্যে পরিণত হয়। এজন্য গর্ভবতী নারীর হায়িয হয় না, তবে খুবই কম। তারপর গর্ভবতী নারীর সন্তান যখন ভূমিষ্ঠ হয় তখন আল্লাহ তাঁর হিকমতে ঐ রক্তকে দুধে পরিণত করে দেন, যা শিশুর খাদ্য হয়। অতঃপর ঐ নারী যখন গর্ভবতী হওয়া এবং দুধ দান করা থেকে ফ্রি হয় তখন কোন কাজ না থাকায় আবার সে হায়িযওয়ালাী হয়। এ জন্য দুধ দানকারিণী মাতা খুব কমই হায়িযওয়ালাী হয়। এজন্য রসূলুল্লাহ ﷺ মায়ের সাথে তিনবার সদয় ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছেন। (আল আসয়িলাহ, ওয়াল আজ্জিবিাতুল ফিক্‌হিয়াহ্ ১ম খণ্ড ৫৭ পৃঃ)

কত বৎসর থেকে এ হায়েয আরম্ভ হয় তার নির্দিষ্ট কোন বয়স বা তারিখের কথা হাদীসে নেই। ভারত, বাংলাদেশ ও পাকিস্তানসহ এশিয়া মহাদেশে কোন কোন মেয়ের ১১/১২ বছর বয়সে হায়িয দেখা দিলেও বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ১৩/১৪ বা ১৫ বছর বয়সে হায়িয আরম্ভ হয়। এ হায়িযের মেয়াদ সব মেয়েদের এক সমান হয় না।

এ ব্যাপারে আনাস (রাযিঃ) বলেন, হায়িয হয় তিন, চার, পাঁচ, ছয়, সাত, আট, নয় ও দশ দিন। তারপর দশদিন পার হলে তা ইস্তিহাযা বা প্রদর রোগ- (কামিল ইবনে আদী)। আনাস এবং মু'আয ইবনে জাবালের অন্য বর্ণনায় আছে, হায়িয তিনদিনের কম নয় এবং দশদিনের বেশি নয়- (দারাকুতনী, ইবনে আদী, শায়খে নিকায়াহ্ ১ম খণ্ড ৩৩ পৃঃ)।

তাই হানাফী ফকীহদের মতে হায়িযের উর্ধ্ব মেয়াদ ১০ দিন এবং নিম্ন মেয়াদ ৩ দিন। (শারহে বিকায়াহ ১ম খণ্ড ১০৯ পৃঃ)

প্রতি মাসে যে কয়দিন হায়িয হবে সে কয়দিন নামায মাফ, পরে কাযা নামায পড়তে হবে না। রমাযান মাসে হায়েয হলে হায়িযের কয়দিন রোযা রাখা নিষেধ। তবে নামাযের মত ঐ রোযা মাফ হয় না। সেজন্য অন্য মাসে ঐ রোযাগুলো আদায় করে দিতে হবে। (মুসলিম, মিশকাত ১৭৮ পৃঃ)

হায়িযওয়ালী মেয়েদের তওয়াফ করা, মাসজিদে প্রবেশ করা, মুখস্থ বা দেখে কুরআন পড়া, তিলাওয়াতের ও শোকরের সিজদা করা এবং স্বামীর সাথে সঙ্গম করা নিষিদ্ধ— (বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী প্রভৃতি)। ইমাম বুখারীর মতে মুখে কুরআন পড়া মানা নয়। আহলে হাদীসের মত তাই।

হায়িযওয়ালী নারীর স্বামী তার স্ত্রীর সাথে সঙ্গম ছাড়া বাকী অন্যান্য সব কাজ করতে পারে— (মুসলিম)। আব্বাহর রসূল ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি হালাল মনে করে হায়িযওয়ালী স্ত্রীর সাথে সহবাস করে সে কুফরী কাজ করে— (তিরমিযী, দারিমী)। আর কেউ যদি হারাম জেনেও অর্ধেক হয়ে সঙ্গম করে ফেলে তাহলে হায়িযের খুন লাল রংয়ের হলে (যা হায়িযের প্রথম দিকে হয়) এক দিনার ঐ খুন যদি হলদে রং বের হয় (যা হায়িযের শেষ দিকে হয়) তাহলে তাকে অর্ধ দিনার কাফফারা বা শরীআতী জরিমানা দিতে হবে— (তিরমিযী, মিশকাত ৫৬ পৃঃ)। তিনি বলেন, যখন কোন স্ত্রীলোক হায়িয থেকে পাক হয় তখন সে গোসল করার সময় পানিতে যেন একটু লবণ দিয়ে নেয়— (আবু দাউদ ১ম খণ্ড ৪৪ পৃঃ)। হায়িযওয়ালী নারী যখন গোসল করে পাক হবে তখন সে যেন হায়িযের ন্যাকড়ায় অথবা তুলোতে একটু খুশবু লাগিয়ে লজ্জাস্থানে রেখে দেয়— (নাসায়ী ১ম খণ্ড ২৯ পৃঃ, বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৪৮ পৃঃ)।

## নিফাসের বিবরণ

সন্তান প্রসবের পর যে রক্তস্রাব হয় তাকে নিফাস বলে। ইমাম নববী বলেন, পূর্ণাঙ্গ সন্তান হোক কিংবা অপুষ্ট, মৃত হোক অথবা মাংসপিণ্ড, কিংবা জমাট রক্তপিণ্ড, সবই নিফাসের হুকুমের মধ্যে গণ্য— (রওয়াতুত তলিবীন ১ম খণ্ড, ১৭৪



৩২

## আইনী তুহফা সলাতে মুস্তফা (১ম খণ্ড)

পৃঃ)। নিফাসের সবচেয়ে কম সময় কত এর কোন বাঁধাধরা নিয়ম হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নেই। এটা এক এক রকম হয়। অভিজ্ঞতায় দেখা যায় যে, সাত দিনের কম কদাচ হয় এবং চল্লিশ দিনের বেশিও খুব কম হয়। একটি হাদীসে আছে, নিফাসওলীরা যদি সাত দিন গত হবার পর পবিত্রতা দেখে তাহলে তারা যেন গোসল করে এবং নামাযও পড়ে— (মুসতাদরকে হাকিম ১ম খণ্ড ১৭৬ পৃঃ, কানযুল উম্মাল ৯ম খণ্ড ২৪৫ পৃঃ)।

উম্মে সালামা বলেন, নাবী ﷺ-এর যুগে নিফাসওয়ালী মেয়ে ৪০ দিন বসে থাকত এবং নাবী ﷺ তাদেরকে নামায কাযা করার হুকুম দিতেন না— (আবু দাউদ, বুলুগুল মারাম ১২ পৃঃ)। এ হাদীস প্রমাণ করে যে, নিফাসের সর্বশেষ মেয়াদ ৪০ দিন। ৪০ দিন পরও যদি রক্ত বন্ধ না হয় তাহলে বুঝতে হবে যে ইন্তিহাযা বা প্রদর রোগ হয়েছে— (হাকিম ১ম খণ্ড ১৭৬ পৃষ্ঠা)। এমতাবস্থায় নামায মাফ নেই। বরং ভাল করে গোসলকরতঃ নামায রোযা করতে হবে। এ সময় স্বামী সহবাসও মানা নেই। ৪০ দিনের আগে নিফাস বন্ধ হবার কোন বাঁধাধরা নিয়ম নেই। সুতরাং চল্লিশ দিনের আগে নিফাস যখনই বন্ধ হবে তখনই গোসল করে নামায রোযা ইত্যাদি ধর্মীয় কাজ করতে হবে। নিফাস বন্ধ হবার পরও ৪০ দিন পুরো করার উদ্দেশ্যে নামায রোযা বাদ দিলে শক্ত গুনাহগার হতে হবে।

## হায়িয ও নিফাসওয়ালীর গোসল

নারীদের হায়িয ও নিফাস যখনই বন্ধ হবে তখনই তাদের উপর গোসল ফরয হয়ে যায়। ঐ গোসলে যদি এক চুল বরাবর দেহ শুকনো থাকে তাহলে গোসল সিদ্ধ হবে না। এ গোসলের হুকুম জানাবতের গোসলের মত।

হায়িয ও নিফাসওয়ালী নারী যদি অসুখের কারণে কিংবা অন্য কোন বিশেষ কারণে গোসল করতে না পারে এবং গোসল করলে যদি ক্ষতির আশংকা থাকে তাহলে তারা তায়াম্মুম করে নামায পড়বে। অতঃপর যতক্ষণ ঐ ওযর থাকবে ততক্ষণ তারা গোসল করবে না। শিশুদের দুধদানকারিণীগণ ঠাণ্ডার সময় ঠাণ্ডা কিংবা গরম পানিতে গোসল করলে যদি শিশু অসুখে পড়ে এবং এরূপ অভিজ্ঞতা তাদের বারবার হয়ে থাকে তাহলে তারা তায়াম্মুম করে নামায পড়বে এবং দিনের বেলায় গরম পানি দ্বারা গোসল করবে। (দসতুর্কুল মুস্তাকী ৩৬ পৃঃ)

## ইস্তিহাযার বিবরণ

হায়িয ও নিফাসের নির্দিষ্ট সময় গত হওয়ার পরও যে রক্তস্রাব হয় তাকে ইস্তিহায বা প্রদর রোগ বলে। ইস্তিহাযার খুন স্বভাবতঃ লাল কিংবা হলদে অথবা মেটে রং হয় এবং হায়েযের খুন স্বভাবতঃ কালচে রং হয়। সুতরাং রক্তের প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য করলে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য বোঝা যায়। ইস্তিহাযা রোগগ্রস্ত মেয়েদের সম্পর্কে আল্লাহর নাবী ﷺ বলেন, তাদের যৌবনের শুরুতে যে কয়দিন হায়িয হতো সেই কয়টি দিনকে তারা হায়িয বলে গণ্য করে নামায রোযা করবে না। কিন্তু ঐ কয়টা দিন গত হবার পর তারা গোসল করবে এবং প্রত্যেক নামাযের সময় অযু করে নামায পড়বে ও রোযার সময় রোযা রাখবে— (তিরমিযী, আবু দাউদ)। যদি কোন মেয়ের হায়িযের শুরু থেকেই ইস্তিহাযা দেখা দেয় এবং সে হায়িযের সঠিক দিন ধরতে না পারে তাহলে সে আল্লাহর উপর ভরসা করে প্রত্যেক মাসে ৬/৭ দিন নামায বন্ধ রাখবে এবং বাকি ২৩/২৪ দিন নামায পড়বে— (ঐ, মিশকাত ৫৭ পৃঃ)।

## বিভিন্ন প্রকার নাপাকী দূর করার বিবরণ

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, যখন তোমাদের কেউ ঘুম থেকে উঠবে তখন সে তার হাত না ধুয়ে পানির পাত্রে যেন ডুবিয়ে না দেয়। কারণ সে জানে না যে, তার হাত রাতে কোথায় লেগেছে? (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত পৃঃ ৪৫)। ইবনে মাস'উদ (রাঃ) বলেন, আমরা অযু করে খালি পায়ে হাঁটতাম এবং তারপর রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে নামায পড়তাম— (তিরমিযী)। অযু করার পর পায়ে বা গায়ে কোন ময়লা লাগলে অযু নষ্ট হয় না। এ ময়লা ধুয়ে ফেললে কিংবা মাটিতে ঘষে ভুলে ফেললে চলবে।

লুবা বাহ বিনতে হারিস বলেন, একদা হুসায়ন ইবনে আলী রসূলুল্লাহ ﷺ এর কোলে থাকা অবস্থায় তাঁর কাপড়ে পেশাব করে দেয়। তখন আমি তাকে বললাম, আপনি অন্য একটা কাপড় পরুন এবং আমাকে আপনার পরনের কাপড়টা দিন। আমি ওটা ধুয়ে দিই। তিনি বললেন, মেয়েদের পেশাব ধুতে হয় এবং ছেলেদের পেশাবে পানির ছিটে দিতে হয়— (আহমাদ, আবু দাউদ)। বুখারী ও মুসলিমের

রিওয়াযাতে আছে, ঐ ছেলেরা এমন কচি ছেলে, যে শুধু দুধ পান করে, অন্য খাদ্য খায় না। কিন্তু দুধ খাওয়া মেয়ে কচি হলেও তার পেশাব লাগা কাপড় ধুতে হবে, পানির ছিটা দিলে চলবে না। এর কারণ সম্পর্কে একটা যযীফ হাদীসে বলা হয়েছে যে, আদমকে যখন আল্লাহ সৃষ্টি করেন, (মাটি ও পানি দিয়ে) তখন তাঁর পোজরা থেকে হাওয়াকে সৃষ্টি করা হয়। ফলে ছেলেদের পেশাব হয় পানি ও মাটি থেকে এবং মেয়েদের পেশাব হয় গোশত ও খুন থেকে— (তাবারানী কাবীর, জামউল ফাওয়ায়িদ ১ম খণ্ড ২৯ পৃঃ)।

রসূলুল্লাহ ﷺ এর শালী আসমা বিনতে আবু বাকর (রাঃ) বলেন, একদা একটি মেয়ে নাবী ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রসূল! যে মেয়েদের কাপড়ে হায়িযের খুন লেগে যায় সে সম্পর্কে আপনার অভিমত কী? তিনি বললেন, যখন তোমাদের কারো কাপড়ে হায়িযের খুন লাগবে তখন সে আঙ্গুল দিয়ে সেটাকে রগড়াবে, তারপর পানি দিয়ে ধোবে, অতঃপর ঐ কাপড়েই সে নামায পড়বে— (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৪২ পৃঃ)। তিরমিযীতে খাওয়ার বর্ণনা আছে, পানি দিয়ে ধুলে যথেষ্ট হবে, রক্তের দাগ থাকলেও কোন আপত্তি নেই— (বুলুগুল মারাম ৪ পৃঃ)।

সালমান ইবনে ইয়াসার বলেন, একদা আমি মা 'আয়িশা (রাঃ)-কে কাপড়ে বীর্য লাগা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাপড় থেকে বীর্য ধুতাম। অতঃপর তিনি ঐ কাপড় পরে নামাযে যেতেন। অথচ ঐ কাপড়ে বীর্য ধোয়ার দাগ দেখা যেতো— (বুখারী, মুসলিম)। মা 'আয়িশা (রাঃ) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাপড় থেকে নিজের নখ দিয়ে শুকনো বীর্য তুলে ফেলতাম। আর তিনি ঐ কাপড়েই নামায পড়তেন— (মুসলিম)। আল্লাহর নাবী ﷺ বলেন, যদি তোমাদের কারো জুতায় দুর্গন্ধ লেগে যায় তাহলে মাটিই তার পবিত্রকারী— (আবু দাউদ)। অর্থাৎ ঐ দুর্গন্ধযুক্ত জুতা মাটিতে ঘষলে পাক হয়ে যাবে। পানি দিয়ে ধোবার প্রয়োজন নেই। এরূপ মেয়েদের শাড়ীর, শালওয়ারের পাড়ে কোন এক জায়গায় ময়লা লাগলে অন্য জায়গায় ঐ পাড়টির সাথে পাক মাটির ঘর্ষণ হলে তা পাক হয়ে যায়— (তিরমিযী, আবু দাউদ)। আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, যখন তোমাদের কারো পায়ে কুকুর মুখ দেবে তখন ওটাকে সাতবার ধুয়ে ফেলবে— (বুখারী ও মুসলিম)। মুসলিমের অন্য বর্ণনায় আছে যে, প্রথমবারটা মাটি দিয়ে মাজতে হবে— (মিশকাত ৫২-৫৩)।

আনাস (রাঃ) বলেন, গৌফ ছাটা, নখ কাটা, বগলের চুল ছেঁড়া ও নাভির নীচের চুল মুড়িয়ে দেয়া সম্পর্কে ৪০ রাতের বেশি দিন অতিবাহিত না করার জন্য আমাদের সময় নির্ধারিত করে দেয়া হয়েছে- (মুসলিম, মিশকাত ৩৮০ পৃঃ)। ইবনে উমর (রাঃ) বলেন, আল্লাহর নাবী ﷺ গৌফ ও নখ প্রত্যেক জুমু'আর দিনে নামাযের আগে কাটতেন- (বায়হাকীর শু'আবুল ইমান, কানয ৭ম খণ্ড ৭৬ পৃঃ)। এবং নাভির নিচের চুল ২০ দিনে মুড়াতেন আর বগলের চুল ৪০ দিনে ছিড়তেন- (মিরকাত ৪র্থ খণ্ড, ৪৫৭ পৃঃ) আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি গৌফ মোটেই কাটে না সে আমার দলের নয় অর্থাৎ মুসলমান নয়- (আহমাদ, তিরমিযী, নাসায়ী, মিশকাত ৩৮১ পৃঃ)।

উল্লিখিত হাদীসে বগলের চুল উপড়ে ফেলার কথা আছে। সুতরাং বগলের চুল ছেঁড়া বা উপড়ে ফেলাটাই উত্তম। অন্যথায় ক্ষুর দিয়ে চাঁছলেও চলবে। তেমনি হাদীসে গৌফ ছাঁটার কথা আছে। সুতরাং গৌফ ছাঁটাই উত্তম। একেবারে মুড়িয়ে দেয়াকে ইমাম মালিক (রহঃ) আপত্তিকর বলতেন এবং মুসলাহ বা অঙ্গবিকৃতি মনে করতেন। (তাবাকাতি শা'রানী ১ম খণ্ড, ৪৫ পৃঃ)

তিনি নখ কাটবার সময় প্রথমে ডান হাতের শাহাদাত বা তর্জনী আঙ্গুল থেকে শুরু করতেন। তারপর মধ্যমা, অনামিকা, কনিষ্ঠা পর পর কাটার পরে সবশেষে বুড়ো আঙ্গুলের নখ কাটতেন। অতঃপর বাম হাতের নখ ঐ নিয়মে কাটতেন, তারপর ডান পা ও বাম পার নখগুলো উক্ত নিয়মে কাটতেন। (বায়লুল মান্ফআহ লিয়ীয়া-হিল আরকা-হিনল আরবাহ্ ১৬ পৃঃ)

## চুল ও দাড়ি পরিষ্কারকরণ

আনাস (রাযিঃ) বলেন, নাবী ﷺ প্রায়ই মাথায় তেল দিতেন এবং দাড়ি ঠিক করতেন। (শারহুস সুন্নাহ, মিশকাত ৩৮১ পৃঃ)

আতা ইবনে ইয়াসার (রাঃ) বলেন, একদা রসূলুল্লাহ ﷺ মাসজিদে ছিলেন এলো একজন লোক মাথা ও দাড়ি উসকো খুসকো করে ঢোকে। তাই তিনি (ﷺ) হাত দিয়ে তার দিকে ইশারা করে তার মাথার চুল ও দাড়ি ঠিক করতে বললেন। লোকটি তাই করল, তারপর ফিরে এলো। এবার রসূলুল্লাহ ﷺ

বললেন, তোমাদের কেউ মাথা উসকো-খুসকো করে শয়তানের মত হয়ে আসার চেয়ে এটা ভাল নয় কি? (মুওয়াত্তা মালিক ৩৭৬ পৃঃ)

আবু কাতাদা (রাঃ) একদা রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলেন, আমার চুল (প্রায় ঘাড় বরাবর) জুমাহ। আমি তাতে চিকুণী লাগাব কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ এবং ওর সম্মান কর। তাই আবু কাতাদা রসূলুল্লাহ ﷺ-এর ঐ কথার কারণে কখনো কখনো দুবারও তেল লাগাতেন। (মুওয়াত্তা মালিক, মিশকাত ৩৮৪ পৃঃ)

তিনি (ﷺ) বলেন, যার চুল আছে সে যেন তার সম্মান করে- (আবু দাউদ)। তিনি (ﷺ) বলেন, তোমরা পাকা চুল তুলো না। কারণ এটা হল মুসলমানের জ্যোতি। যে ব্যক্তি ইসলামের মধ্যে বুড়ো হয় আল্লাহ তার জন্য ওর বদলে নেকী লিখে দেন এবং গুনাহ মাফ করেন ও তার মর্যাদা বাড়িয়ে দেন- (আবু দাউদ ৩৮২ পৃঃ)।

তিনি (ﷺ) শিশুদের চুল অর্ধেক রাখতে এবং অর্ধেক মোড়াতে মানা করেছেন- (বুখারী, মুসলিম)। আর যেসব পুরুষ মেয়েদের রূপ ধারণ করে এবং যে সব নারী পুরুষের রূপ ধরে তাদেরকে তিনি (ﷺ) লানত দিয়েছেন এবং বলেছেন যে, ওদেরকে ঘর থেকে বের করে দাও- (বুখারী, মিশকাত ৩৮০ পৃঃ)।

তিনি মেয়েদের মাথা মোড়াতে নিষেধ করেছেন। (নাসায়ী, মিশকাত ৩৮৪ পৃঃ)

তিনি (ﷺ) বলেন, তোমরা দাড়ি বাড়াও এবং গোঁফ ছেঁটে দাও- (বুখারী, মুসলিম)। তবে তিনি তাঁর দাড়ির লম্বা ও চওড়া থেকে উসকো খুসকো চুল ছাঁটতেন- (তিরমিযী, মিশকাত ৩৮১ পৃঃ)।

## খাতনার বিবরণ

পুরুষাঙ্গের মাথা-ঢাকা চামড়াটা না কাটলে তাতে ময়লা ও পেশাবের বিন্দু জমে থাকার আশংকা থাকে। তাই ঐ নাপাকী থেকে পাক হবার জন্য লিঙ্গের মুখপাতের চামড়া কাটার বিধান দেয়া হয়েছে। ঐ চামড়াটুকু কেটে ফেলার নাম খাতনা করা।

তাই রসূলুল্লাহ ﷺ হাসান ও হুসায়ন (রাঃ)-এর জন্মের সপ্তম দিনে তাদের খাতনা করেছিলেন- (হাকিম, বায়হাকী, তালখীসুল হাবীর ৩৬৩ পৃঃ)। অন্য এক

বর্ণনায় তিনি রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, খাতনা পুরুষের জন্য সুন্নাত এবং নারীদের জন্য সম্মানীয়- (আহমাদ, বায়হাকী)। আবু বারযাহ বলেন, একদা আমরা এক খাতনাহীন ব্যক্তির হজ্জ করা সম্পর্কে রসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, খাতনা না করা পর্যন্ত হজ্জ হবে না- (ইবনুল মুনিয়র)। অন্য বর্ণনায় তিনি বলেন, যে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করে সে যেন খাতনা করে, যদিও সে বয়স্ক ব্যক্তি হয়- (হারব ইবনে ইসমাঈল)। এক নও মুসলিমকে তিনি (ﷺ) বলেন, তোমার কাফিরী যুগের চুল ফেলে দাও এবং খাতনা কর- (আহমাদ, আবু দাউদ, তালখীসুল হাবীর ৩৬২ পৃঃ)।

ইব্রাহীম (আঃ) আশি বছর বয়সে কুড়াল দিয়ে নিজের খাতনা করেছিলেন- (বুখারী)। তাই নাবী ﷺ ইসলাম গ্রহণকারীকে খাতনা করাবার নির্দেশ দিতেন, যদিও তার বয়স আশি হতো- (তাবারানী কানয ৯ম খণ্ড ৭৬ পৃঃ)। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, সাহাবায়ে কিরাম প্রাপ্তবয়স্ক হবার আগে ছেলেদের খাতনা করাতেন- (বুখারী)। তাই বুদ্ধি হবার আগে কচি বয়সে ছেলেদের খাতনা করা উচিত। ভৌগোলিক কারণে আরব দেশে মেয়েদের খাতনার প্রচলন ছিল তখনও থাকতে পারে। কিন্তু আমাদের দেশে নেই। তাই এ সম্পর্কে আর কিছু লিখলাম না।

## পানির বিবরণ

সব রকম নাপাকী থেকে পাক হবার জন্য দরকার হয় পানির। পানি না পেলে মাটির প্রয়োজন। এখন ঐ পানি কিরূপ হবে সেটা জানা একান্ত প্রয়োজন। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, সমুদ্র ও নদীর পানি পাক- (তিরমিযী, আবু দাউদ)। কিন্তু সব জায়গায় নদী ও সাগর নেই। তাছাড়া পানি থাকবার জায়গাও বিভিন্ন ধরনের হয়। যেমন কুয়া, হাওয, পুকুর ইত্যাদি। এর মধ্যে কোন পানি পাক আর কোনটি নাপাক তা জানা মুশকিল। সেজন্য আল্লাহর রসূল ﷺ ওর একটি বিশেষ চিহ্ন বলে দিয়েছেন যদ্বারা বোঝা যাবে যে, পানিটি পাক কি না, তাই তিনি বলেন, পানিকে কোন জিনিস নাপাক করতে পারে না। কিন্তু কোন প্রকার নাপাক জিনিস যদি পানিতে পড়ে এবং তার ফলে ঐ পানি থেকে দুর্গন্ধ বের হয়, অথবা তার মজা পাল্টে যায় কিংবা তার রং বদলে যায় তাহলে সে পানি নাপাক হবে। এ কুপের পানিতে অযু ও গোসল চলবে না- (বায়হাকী, বুলুগুল মারাম ২ পৃঃ)।

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, তোমাদের কেউ আবদ্ধ পানি যা প্রবাহিত হয় না (যেমন হাওয, কুয়া ইত্যাদি) তাতে পেশাব কোর না- (বুখারী, মুসলিম)। আল্লাহর রসূল ﷺ বিড়ালের মুখ দেয়া ঝুটো পানিতে কখনো কখনো অযু করেছেন- (আবু দাউদ)। জাবির (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করা হল আমরা গাধার ঝুটো পানিতে অযু করবো কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ শুধু তাই নয়, অন্যান্য হিংস্র জন্তুর ঝুটোতেও চলবে- (শারহুস সুন্নাহ)। উমর (রাঃ) বলেন, রোদ তাতানো গরম পানিতে গোসল করো না। কারণ এটা স্বেত রোগের উপকরণ- (দারাকুতনী, মিশকাত ৫০-৫২ পৃঃ)। রক্তহীন প্রাণী যেমন মাছ, কুমীর, কচ্ছপ ইত্যাদি পানিতে মরে থাকলে কিংবা লতাপাতা, ঘাস প্রভৃতি পানিতে পড়ে গেলেও পানি নাপাক হয় না- (মুসলিম)।

## পেশাব ও পায়খানার বিবরণ

ফজরের সময় ঘুমিয়ে উঠে প্রায়ই মুসল্লী পেশাব-পায়খানা করতে অভ্যস্ত। তাছাড়া অন্যান্য নামাযের সময়ও অনেক নামাযী অযু করার আগে পেশাব করে থাকেন। তাই অযুর বিবরণ দেয়ার আগে পেশাব ও পায়খানা করার নিয়মাবলী লেখা একান্ত বাঞ্ছনীয় মনে করলাম।

## পেশাব ও পায়খানায় যাবার দু'আ

যায়দ বিন আরকাম (রাঃ) হতে বর্ণিত রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : পায়খানা জিন ও শয়তানের আড্ডাখানা। যখন তোমাদের কেউ পায়খানায় যাবে তখন সে এ দু'আ পড়বে :

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ .

উচ্চারণ : আল্লা-হুমা ইন্নী আউযুবিকা মিনাল খুবিসি ওয়াল খাবায়িসি। (আবু দাউদ, মিশকাত ৪৩ পৃঃ)

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে নাপাক নর জিন ও নাপাক নারী জিন হতে আশ্রয় চাচ্ছি- (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ, মুসনাদে আহমাদ, বুলুগুল মারাম ৮ পৃঃ)। এছাড়াও আরো দু'রকম দু'আ পাওয়া যায়।

## পেশাব ও পায়খানার পরের দু'আ

‘আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নাবী যখন পায়খানা হতে ফিরতেন তখন এ দু'আ পড়তেন,

غُفْرَانَكَ      গুফরা-নাকা

অর্থ : হে আল্লাহ! তোমার কাছে মাফ চাচ্ছি। (তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ, আহমাদ, বুলুগুল মারাম ৮ পৃঃ, মুসতাদরকে হাকিম ১ম খণ্ড ১৫৮ পৃঃ)

নোট : মওলানা আব্দুল্লাহ সাঈদ বীরভূমী ও মোঃ আহমাদ আলী বাংলাদেশী রচিত নামায শিক্ষাতে ‘গোফরা-নাকা’ এর পরে ‘রুব্বানা’ শব্দটি লেখা রয়েছে। কিন্তু আমি বিভিন্ন হাদীসের সংকলন গ্রন্থ যথা মিশকাত, তালখীসুল হাবীর ও বুলুগুল মারাম প্রভৃতি গ্রন্থে “রুব্বানা” শব্দটি পাইনি। জানি না এটা ওদের ভুল কি না।

আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, নাবী ﷺ যখন পায়খানা থেকে বের হতেন তখন এ দু'আ পড়তেন :

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنِّي الْأَذَى وَعَافَانِي.

উচ্চারণ : আলহাম্দু লিল্লা-হিল্লাযী আয্হাবা ‘আল্লিল আযা- ওয়া‘আ-ফা-নী।

অর্থ : সমস্ত গুণগান সেই আল্লাহর যিনি আমার কষ্ট দূর করেছেন এবং আমাকে আরাম দিয়েছেন। (ইবনে মাজাহ, মিশকাত ৪৪ পৃঃ)

উপরোল্লিখিত দু'টো দু'আর মধ্যে যে কোন একটি দু'আ পড়তে পারেন। তবে প্রথম দু'আর হাদীসটি জোরদার বেশী।

## পেশাব ও পায়খানার আদব-কায়দা

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আমি তোমাদের জন্য সেরূপ, যেমন একজন বাপ তার ছেলেমেয়েদের জন্য। আমি তোমাদেরকে শেখাচ্ছি-যখন তোমরা কেউ পায়খানায় যাবে তখন কেবলার দিকে মুখ ও পিঠ করবে না। অতঃপর তিনি ইস্তিনজায় তিনটি পাথর নেবার হুকুম দিলেন এবং



গোবর ও হাড় দিয়ে কুলুখ করতে মানা করলেন। আর ডান হাত দিয়ে ইস্তিনজা করতে এবং পেশাব ও পায়খানার অঙ্গ ধুতে নিষেধ করলেন- (ইবনে মাজাহ, দারিমী, মিশকাত ৪২ পৃঃ)। যদি তোমার ও কিবলার মাঝখানে কোন আড়াল থাকে তাহলে কিবলার দিকে মুখ ও পিঠ করে পেশাব পায়খানা করতে কোন আপত্তি নেই- (আবু দাউদ, মিশকাত ৪৪ পৃঃ)।

যে ব্যক্তি পায়খানা ফেরার সময় কিবলার দিকে মুখ ও পিঠ করে না তার জন্য একটি নেকী লেখা হয় এবং একটি গোনাহ মুছে দেয়া হয়। (তাবারানী, আওসাত, কান্য ৯ম খণ্ড ২১৭ পৃঃ)



রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : তোমাদের কেউ (এই জায়গাগুলোতে) নিশ্চয়ই পেশাব করবে না। (১) গোসলখানায় (২) কোন কিছুর গর্তে (৩) নদী বা পুকুরঘাটে (৪) পথের মাঝখানে (৫) গাছের ছায়াতে- (আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ)। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : যে দু'জন লোক পায়খানা ফিরতে গিয়ে গুপ্তাঙ্গ খুলে বসে, কথাবার্তা বলাবলি করে তাদের এ কাজের জন্য আল্লাহ রাগ করেন- (আহমাদ, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, মিশকাত ৪৩ পৃঃ)।


যে ব্যক্তি সেই নহরের ঘাটে পায়খানা ফেরে যেখানে লোকেরা অযু করে ও পানি পান করে তার ওপরে আল্লাহর এবং ফেরেশতার ও সমস্ত লোকের অভিসম্পাত। (খাতীব, কান্য ৯ম খণ্ড ২১৭ পৃঃ)


চিলিমচিতে পেশাব করে ঘরে রেখো না। কারণ (রহমতের) ফেরেশতা ঐ ঘরে ঢোকে না যাতে পেশাব থাকে। (তাবারানী, আওসাত, কান্য ৯ম খণ্ড ২০৯ পৃঃ)



রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, তোমরা পেশাব থেকে ভাল করে পাকসাফ হও। কারণ কবরের আযাব বেশীরভাগ এ পেশাবের কারণে হয়- (হাকিম, দারাকুতনী, বুল্গুল মারাম ৯ পৃঃ)। অন্য বর্ণনায় তিনি (ﷺ) বলেন, কবরে সর্বপ্রথম হিসাব নিকাশ এ পেশাবেরই হবে- (তাবারানী কাবীর, মাজমাউয় যাওয়ায়িদ ১ম খণ্ড ২০৯ পৃঃ)।

এ হাদীস দ্বারা জানা যায় যে, পেশাবের ছিটে থেকে সাধ্যমত পরহেয করা উচিত। এজন্য একদা নাবী ﷺ একটি দেয়ালের কাছে নরম যমীনে পেশাব করেন। অতঃপর তিনি বলেন, যখন তোমাদের কেউ পেশাব করে তখন নরম

যমীনের খোঁজ করবে- (আবু দাউদ)। নাবী  যখন পায়খানায় যেতেন তখন যমীনের কাছাকাছি না হওয়া পর্যন্ত কাপড় তুলতেন না- (তিরমিযী, আবু দাউদ, দারিমী)। নাবী  যখন পায়খানার এরাদা করতেন তখন এত দূরে যেতেন যে, তাঁকে কেউ দেখাতে পেত না- (আবু দাউদ, মিশকাত ৪২ পৃঃ)। কখনো কখনো তিনি প্রায় দু'মাইল দূরে যেতেন- (যাদুল মাআদ ৪৩ পৃঃ, আবু ইয়লা, তাবারানী, মাজমাউয়্ যাওয়ায়িদ ১ম খণ্ড ২০৩ পৃঃ)। তিনি বলেন, যখন কেউ পায়খানা ফিরতে যায় সে যেন কোন আড়াল দেয়। যদি কোন আড়াল না পায় তাহলে সে যেন বালি জমা করে তার আড়ালে বসে- (আবু দাউদ, ইবনু মাজাহ, দারিমী, মিশকাত ৪৩ পৃঃ)।

এ হাদীসগুলো প্রমাণ করে যে, লোকচক্ষুর অগোচরে পায়খানা ফেরা উচিত। লোকদের কাছাকাছি পাকা বা কাঁচা ঘেরা পায়খানা- ঘর থাকলে কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু ফাঁকা মাঠে বা ময়দানে হলে লোকচক্ষুর অগোচরে অনেক দূরে যাওয়া উচিত। পল্লীর অধিকাংশ লোক মাঠে ও ময়দানে পায়খানা করে। তাদের অনেকে লোকচক্ষুর অগোচরে না গিয়ে বরং জনগণের সামনে পায়খানা করে। তাদের উচিত রসূলুল্লাহ  এর উল্লেখিত হাদীসগুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখা এবং সাধ্যমত সেই মোতাবেক আমল করা। আল্লাহ আমাদের সুমতি দিন- আমীন।

সুরাকাহ ইবনে মালিক (রাঃ) বলেন, আমাদেরকে রসূলুল্লাহ  শিক্ষা দিয়েছেন, যখন আমরা পায়খানায় যাই তখন বাম পায়ে ভর দেই- (তাবারানী, বায়হাকী, তালখীসুল হাবীর ৩৯ পৃঃ)। অন্য বর্ণনায় আছে, ডান পা একটু খাড়া রাখি- (জামউল ফাওয়ায়িদ ১ম খণ্ড ৩৩ পৃঃ, মুগনী ১ম খণ্ড ১৬৬ পৃষ্ঠা)

নবী  যখন পায়খানায় যেতেন তখন পায়খানা করার পর পানি দিয়ে ইসতিজ্জা করতেন। অতঃপর বাম হাতটি মাটিতে ঘষতেন, তারপর হাতটি পানি দিয়ে ধুতেন এবং অযু করতেন- (আবু দাউদ, মিশকাত ৪৩ পৃঃ)। রসূলুল্লাহ  বলেন, তোমরা ঠাণ্ডা পানি দিয়ে ইস্তিনজা কর কারণ, এটা হারিশ রোগ আরোগ্যকারী- (তাবারানী আওসাত, মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক, কানয ৯ম খণ্ড ২১০ পৃঃ)।

বাতাসের দিকে মুখ করে পেশাব করো না। যাতে তা ফিরে গায়ে পড়ে- (মুসনাদে আবু ইয়লা, কানয ৯ম খণ্ড ২০৭ পৃঃ)। দ্বিতীয় আবু হানীফা আল্লামা ইবনে নুজাইম (মৃত ৯৭০ হিঃ) বলেন, চাঁদ ও সূর্যের দিকে মুখ করে পেশাব ও

পায়খানা ফেরা মাকরুহ- (আল বাহরুর রা-য়িক ১ম খণ্ড ২৪৩ পৃঃ)। কিন্তু হাফিয ইবনে হাজার আসকালানী (মৃঃ ৮৫২ হিঃ) বলেন, ঐ হাদীসটি বাতিল ও ভিত্তিহীন- (তালখীসুল হাবীর ১ম খণ্ড ৩৭ পৃঃ)।

নাবী ﷺ যখন পায়খানা ঢুকতেন তখন হাতের আংটি খুলে রাখতেন- (আবু দাউদ, নাসায়ী)। তোমরা গোসলখানায় অথবা অযূর জায়গায় পেশাব করোনা, কারণ অসঅসার ব্যারাম এ থেকেই হয়ে থাকে- (আবু দাউদ, তিরমিযী)। আদম সন্তানের পেশাব ও পায়খানায় ঢোকার পর তার লজ্জাস্থান ও জিনদের চোখের মাঝখানে পর্দা হল বিসমিল্লাহ বলা- (তিরমিযী)। নাবী ﷺ যখন পেশাব করতেন তখন অযূ করতেন এবং গুণ্ডাঙ্গে একটু পানি ছিটিয়ে দিতেন- (আবু দাউদ, নাসায়ী)। একদা নাবী ﷺ ময়লার টিবির পাশ দিয়ে যাবার সময় (বসার জায়গা না পাওয়ায়) দাঁড়িয়ে পেশাব করেন- (বুখারী, মুসলিম)। ঐ একবার ছাড়া তিনি সারা জীবন বসে বসে পেশাব করেন- (তিরমিযী, নাসায়ী)।

ইবনে মাস'উদ (রাঃ) বলেন, একদা জিনদের একটি দল নাবী ﷺ এর কাছে এসে বলল, আপনার উম্মাতকে হাড়, গোবর ও কয়লা দিয়ে ইস্তিজ্জা করতে মানা করুন। কারণ আল্লাহ তাআলা এর মধ্যে আমাদের রিয়ক বা খোরাক রেখেছেন। অতঃপর রসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে ঐ জিনিসগুলো দিয়ে ইস্তিজ্জা করতে মানা করলেন- (আবু দাউদ)। তোমাদের কেউ গর্তে পেশাব করবে না- (আবু দাউদ, মিশকাত ৪২-৪৪ পৃঃ)।

শেষ হাদীসটি প্রমাণ করে যে, ইসলাম জন্তুদের ও ঘরের হিফায়ত করার ব্যাপারে কত সচেতন। গর্তে সাপ, বিছা ও জিন প্রভৃতি থাকে। সেজন্য তাতে পেশাব করলে কোন অঘটন ঘটতে পারে। যেমন একদা এ ঘটনা ঘটেছিল, সা'দ ইবনে 'উবাদা একদা সিরিয়ার একটি গর্তে পেশাব করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে চিত হয়ে লুটিয়ে পড়ে মারা যান। তারপর লোকেরা জিনদেরকে বলতে শুনল, আমরা খায়রাজদের সর্দার সা'দ ইবনে 'উবাদাকে মেরে ফেলেছি। তার বুকে দুটো বল্লম মেরেছি এবং সেটা ঠিক নিশানায় লেগেছে- (তাবারানী কাবীর, মাজমাউয যাওয়া-য়িদ ১ম খণ্ড ২০৬ পৃঃ)। কোন কোন আলিম বলেন, পেশাব করে তাতে থুথু ফেললে মনে ওয়াস্ ওয়াসা পয়দা হয় এবং আঙনে পেশাব করলে বেমার দেখা দেয়- (সলাতুল মুস্তফা ২২-২৩ পৃঃ)।

পায়খানার আদব কায়দা সম্পর্কে দ্বিতীয় আবু হানীফা আল্লামা ইবনে নুজাইম হানাফী (রহঃ) বলেন, পায়খানা ঘরে মাথা ঢেকে ঢুকবে। পায়খানা করা অবস্থায় আল্লামার কোন যিক্র করবে না। হাঁচি এলে “আলহামদুলিল্লাহ” পড়বে না এবং অন্যের হাঁচির জওয়াবী দু‘আও পড়বে না, সালাম ও আযানের জওয়াব দেবে না, আসমানের দিকে তাকাবে না, পেশাব ও পায়খানায় দীর্ঘ সময় বসে থাকবে না। কারণ এতে অর্শ কিংবা পিণ্ডের বেদনা রোগ হতে পারে। যেমন লোকমান (‘আঃ) থেকে বর্ণিত আছে। (আলবাহররুর রা-য়িক ১ম খণ্ড ২৪৩ পৃঃ)

ইমাম নববী বলেন, পায়খানায় যাবার সময় প্রথমে বাম পা রাখবে এবং ফেরার সময় প্রথমে ডান পা ফেলবে। যদি হাঁচি আসে তাহলে মনে মনে “আলহামদুলিল্লাহ” বলবে। জিভ নাড়বে না, এক্রপ স্ত্রী সহবাসের সময়ও করবে। পছন্দনীয় মতে খালি পায়ে পায়খানায় ঢুকবে না এবং মাথাও উদাম রাখবে না। গুণ্ডাসের দিকে দেখবে না এবং মলের দিকেও তাকাবে না। (রওয়াতুত ত-লিবীন ১ম খণ্ড ৬৬ পৃঃ)

আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি তার গুণ্ডাসের দিকে খুব বেশী দেখে সে ভুলের সাজায় পতিত হয়। অন্যের মতে যে ব্যক্তি লিঙ্গকে খুব বেশী স্পর্শ করে সে ব্যভিচারে পতিত হয়। (মারা-ফিল ফালাহ ৩১ পৃঃ)

জামা‘আতে ইসলামীর এক সমর্থক মাওলানা মোঃ ইউসুফ ইসলামী সাহেব লিখেছেন, পায়খানা যাবার সময় মাথাকে টুপি প্রভৃতি দ্বারা ঢেকে যাবে। (আদাবে যিন্দেগী ১২ পৃঃ)

উপরোক্ত তিন পণ্ডিতসহ আরো অনেক মাযহাবপন্থী বিদ্বানই পায়খানায় যাবার সময় মাথায় টুপি কিংবা কিছু দিয়ে ঢাকবার কথা বলেন। কিন্তু এর প্রমাণে আমি কোন হাদীস পাইনি। এ ব্যাপারে আমি ২৫শে অক্টোবর ১৯৮২ সোমবার রাত ৭টায় লাক্ষৌয়ের নদওয়া মাদরাসার খাস মেহমান খানায় মাওলানা সাইয়িদ আবুল হাসান ‘আলী নদভীর সাথে তাঁর মেহমানী খানা খাওয়ার সময় তাঁকে এবং ২৭শে অক্টোবর ১৯৮২ বুধবার বেলা সাড়ে এগারোটায় দেওবন্দ মাদরাসার সেক্রেটারী ঘরে চা খেতে খেতে নায়িব নায়ম মাওলানা রিয়াসত ‘আলী বিজনৌরী ‘ঈযাহল বুখারী’ প্রণেতা সাহেবকে জিজ্ঞেস করি। তাঁরা দু’জনেই বলেন, এর প্রমাণে আমাদেরও কোন হাদীস জানা নেই।

আল্লামা ইবনে কুদামাহ বলেন, আবু বাকর সিদ্দীক (রাঃ) নাকি মাথা ঢাকতেন। (আলমুগনী ১ম খণ্ড ১৬৬ পৃঃ)

## পেশাবের পর কুলুখ নিয়ে চলাফেরা বিদআত

পায়খানা করার ঢেলা ব্যবহার করে পানি দিয়ে ধোয়ার কথা যয়ীফ হাদীসে পাওয়া যায়। কিন্তু পেশাব করার পর পানি থাকা সত্ত্বেও কুলুখ ব্যবহারের কথা কোন হাদীসেই পাওয়া যায় না। তাই মওলানা আশরাফ আলী খানবী হানাফী বলেন, পেশাবের পর কুলুখ নিয়ে বেহায়ার মত ঘোরাফেরা করো না- (তালীমুদ্দীন)। ইমাম ইবনুল কাইউম বলেন, পেশাবের পর জোরে জোরে কাশি দেয়া, ওঠা বসা করা, পুরুষাঙ্গের ছিদ্র দেখা ও তার মধ্যে পানি দেয়া ইত্যাদি কাজ করা শয়তানী ওয়াসওয়াসা বিদআত। কারণ এ কাজটি যদি সুন্নাত হতো তাহলে রসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবায়ে কিরাম নিশ্চয়ই করতেন এবং আমাদের শিক্ষা দিতেন- (ইগা-সাতুল লাহফান ১ম খণ্ড ১৪৪ পৃঃ)।

## মিসওয়াক বা দাঁতন করার গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, পবিত্রতা হল চার রকম : (১) গোঁফ ছাঁটা, (২) নাভির নীচের চুল কামানো, (৩) নখ কাটা, (৪) মিসওয়াক করা- (মুসনাদে বায্‌যার, তাবারানী)। তোমাদের কেউ যখন রাতে নামাযে দাঁড়াবে তখন সে যেন মিসওয়াক করে। কারণ, যখন সে নামাযে দাঁড়ায় তখন এক ফেরেশতা এসে তার মুখে মুখ রেখে দেয়। অতঃপর তার মুখ দিয়ে যা কিছু বের হয় তা ঐ ফেরেশতার মুখে পড়ে যায়- (আবু নুআইম, তালখীসুল হাবীর ২৪ পৃঃ)। তিনি বলেন, অযু অর্ধেক ঈমান এবং মিসওয়াক অর্ধেক অযু- (ইবনে আবী শায়বা, কানয ৯ম খণ্ড ১৭৫ পৃঃ)।

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যে নামায মিসওয়াক করে পড়া হয় তার সাওয়াব ঐ নামাযের চেয়ে সত্তর গুণ বেশী যে নামাযে মিসওয়াক করা হয় না- (বায়হাকী)। তিনি (ﷺ) বলেন, যদি আমার উম্মাতের উপরে ভার মনে না করতাম তাহলে প্রত্যেক অযুর সাথে তাদেরকে আমি মিসওয়াক করার হুকুম দিতাম- (মালিক, আহমাদ, নাসায়ী, তা'লীকে বুখারী, বুলুগুল মারাম ৪ পৃঃ)।

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, তোমাদের উচিত মিসওয়াক করা। কারণ এটা মুখ পবিত্রকারী, রক্বের (আল্লামার) সন্তুষ্টি বিধানকারী, ফেরেশতাদের আনন্দদানকারী, নেকী বাড়ায় এবং এটা সুন্নাতের মধ্যে গণ্য। এটা দৃষ্টিশক্তি বাড়ায়। পিত্ত সরায়, মাড়ি শক্ত করে, কফ দূর করে, মুখ সুগন্ধ করে এবং পাকস্থলী সুস্থ রাখে— (কামিল ইবনে আদী ও বায়হাকীর শু‘আবুল ঈমান)। দায়লামীর বর্ণনায় বাড়তি আছে যে, এটা শয়তানের রাগ আনয়নকারী— (কানযুল উম্মাল ৯ম খণ্ড ১৯৩ পৃঃ)। নহর গ্রন্থে আছে যে, দাঁতনের উপকার ত্রিশেরও অধিক— (শামী ১ম খণ্ড ১০৭ পৃঃ)।

তাই তিনি (ﷺ) মিসওয়াক না করে ঘুমাতে না (ইবনে আসাকির) এবং ঘুমাবার সময়ও মাথার গোড়ায় দাঁতন রাখতেন। অতঃপর জেগে উঠলে দাঁতন করতেন— (আহমাদ, হাকিম)। তিনি রাত ও দিনে যখনই ঘুম থেকে জাগতেন তখনই দাঁতন করতেন— (আবু দাউদ, ইবনে আবী শায়বা, কান্য ৭ম খণ্ড, তালখীসুল হাবীর ২৩ পৃঃ)। যখন তিনি (ﷺ) বাড়ীতে ঢুকতেন তখন দাঁতন শুরু করতেন— (ইবনে হিব্বান, তালখীস ২৫ পৃঃ)।

একদা ‘আয়িশা (রাঃ) রসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করেন, যার দাঁত নেই সেও দাঁতন করবে কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ, তাহলে কিভাবে করবে? তিনি বললেন, তার আঙ্গুল নিজ মুখে ভরে দিবে অর্থাৎ আঙ্গুল দিয়ে মাড়িতে ঘষবে— (তাবারানী, আওসাত)। হাদীসটি যরীফ। ‘উসমান (রাঃ) যখন অযু করতেন তখন আঙ্গুল দিয়ে দাঁতন করতেন— (আবু ‘উবায়্যিদের কিতাবুত্ তুহুর, তালখীসুল হাবীর ২৫)।

## মিসওয়াক কী দিয়ে এবং কিভাবে

মিসওয়াক তিন রকম গাছের আরাক বা পিলু, তা না হলে আনাম বা যায়তুন কিংবা বুতম বা নিম জাতীয় গাছ— (আবু নুআইমের কিতাবুস সিওয়াক)। উত্তম দাঁতন হল যায়তুনের যা বরকতময় গাছের মধ্যে গণ্য। এটা মুখকে সুগন্ধ করে ও পিত্ত দূর করে। এটা আমার মিসওয়াক এবং আমার আগের নাবীদের মিসওয়াক— (তাবারানী, আওসাত)। ইবনে মাস‘উদ (রাঃ) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর দাঁতনের জন্য অরাক ডাল খুঁজে আনতাম— (মুসনাদে আবু ইয়লা, তালখীসুল হাবীর, ২৬ পৃঃ, কান্য ৯ম খণ্ড ১৯৪ পৃঃ)।

তিনি রয়হান ফুল গাছের ডাল দ্বারা দাঁতন করতে মানা করেছেন। এটা নাকি কুষ্ঠরোগের কারণ হতে পারে- (তালখীস ২৬ পৃষ্ঠা)। কোন মিসওয়াক যদি না পাওয়া যায় তাহলে মিসওয়াকের জায়গায় আঙ্গুলই ঘষতে হবে- (কিতাবুস্ সিয়াক লিআবী নুআইম, কানয ৯ম খণ্ড ১৮৮ পৃঃ)।

হানাকী ফকীহরা বলেন, দাঁতনটা যেন কড়ে আঙ্গুলের মত মোটা হয় এবং লম্বা এক বিঘত হয়- (শামী ১ম খণ্ড ১০৬ পৃঃ)। তার চেয়ে বাড়তি না হয়। কারণ তাতে নাকি শয়তান সওয়ার হয়- (মারা-কিল ফালাহ ৩৭ পৃঃ)। দাঁতনটা ধরার ব্যাপারে ইবনে মাস'উদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, ডান হাতের কড়ে আঙ্গুল দাঁতনের নীচের দিকে থাকবে এবং অনামিকা, মধ্যমা ও তর্জনী আঙ্গুল তিনটি দাঁতনের উপরে থাকবে আর বুড়ো আঙ্গুলটা নীচের দিকে মাথার কাছে থাকবে- (বাহরুর রায়িক ১ম খণ্ড ২১ পৃঃ)। রসূলুল্লাহ ﷺ অযূর পানি দিয়ে (ভিজিয়ে) দাঁতন করতেন- (মুসনাদে আবু ইয়লা, কানয ৭ম খণ্ড ২৫ পৃঃ)। তারপর তিনি আড়াআড়ি দাঁত ঘষতেন, খাড়াখাড়ি নয়, কিন্তু জিহ্বা খাড়াখাড়ি ঘষতেন- (আবু নুআইম, আহমাদ, তালখীস ২৩ পৃঃ)। তারপর তিনি সেটাকে ধুয়ে লেখকের কানে কলম রাখার মত কানের উপরে রাখতেন- (তাবারানী, তালখীস ২৫ পৃঃ)।

শুয়ে শুয়ে দাঁতন করা অনুচিত। কারণ, এতে গ্নীহা বড় হতে পারে এবং মুঠো করেও দাঁতনটা কেউ না ধরে, কারণ এতে অর্শ রোগের আশংকা আছে- (হাশিয়া তাহতাভী আলা মারা-কিল ফালাহ ৩৮ পৃঃ)। হিলয়্যাহতে আছে, হাকীম তিরমিযী বলেন, মিসওয়াকের প্রথম থুথুটা গিলে ফেল। কারণ তা কুষ্ঠ ও শ্বেত রোগে উপকার করে এবং মৃত্যু ছাড়া অন্য রোগেও ফায়দা দেয়, কিন্তু তার পরের থুথু আর গিলবে না কারণ তা ওয়াসওয়াসা বা কুমন্ত্রণার কারণ হয়। যিয়াদ ইবনে ইলাকাহ্ এটা বর্ণনা করেছেন। গায়নাভী থেকে বর্ণিত আছে, তিনি (ﷺ) দাঁতন বাইরের ও ভেতরের দিক, উপর ও নীচে আর মাড়ির এবং দুই দাঁতের মাঝখানেও দাঁতন করতেন- (শামী ১ম খণ্ড ১০৭ পৃঃ)।

দাঁতনের সময় উপরের মাড়ির ডানদিক থেকে শুরু করা উচিত। তারপর বামদিক, তারপর নীচের মাড়ির ডানদিক, তারপর বামদিক। দাঁতনটি শুকনো থাকলে ভিজিয়ে নিতে হবে এবং ধুতে হবে, আবার দাঁতন করার শেষেও ধুয়ে নিতে হবে- (কাবীরী ৩২১ পৃঃ)। যাতে শয়তান দাঁতন করতে না পারে- (মারাকিল ফালাহ ৩৭ পৃঃ)।

## অযূর ফযীলত ও গুরুত্ব

তোমরা এ শরীরকে পবিত্র রাখ তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে পবিত্র করে দেবেন। কারণ, যে বান্দা পবিত্র হয়ে রাত কাটায় তার সাথে তার জামার ভেতরে এক ফেরেশতা রাত কাটায় এবং রাতের একটি ঘণ্টা না পাল্টাতেই ঐ ফেরেশতা বলে, হে আল্লাহ! তোমার এ বান্দাকে ক্ষমা কর। কারণ সে পাক অবস্থায় রাত কাটিয়েছে। (তাবারানী, কান্ব ৯ম খণ্ড ১৬৯ পৃঃ)

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, যখন কোন মুসলিম বা মু'মিন বান্দা অযূ করে তখন তার চোখ, মুখ, হাত ও পা দিয়ে যত গুনাহ হয়েছিল সেগুলো অযূর পানির সাথে ধুয়ে মুছে যায়— (মুসলিম)। শেষে ঐ বান্দা গুনাহ থেকে একেবারে পাক ও সাফ হয়ে যায়। তিনি বলেন, যে মুসলমান ভাল করে অযূ করার পর মন ও প্রাণ দিয়ে দু'রাক'আত নামায পড়ে তার জন্য জান্নাত অপরিহার্য হয়ে যায়— (ঐ)। তিনি বলেন আমার উম্মাতকে কিয়ামতের দিনে তাদের অযূর কারণে “গুররাম মুহাজ্জলীন” বা অযূর অঙ্গগুলো চমকানো অবস্থায় ডাকা হবে। অতএব তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তার চমক বাড়াতে চায় সে যেন তাই করে। অর্থাৎ ভাল করে অযূ করে— (ঐ)। তিনি বলেন, অযূর পানি মু'মিনের অঙ্গে যতটা পৌছবে তার অঙ্গের ততটা অংশ চমকতে থাকবে— (ঐ)। তিনি বলেন, একমাত্র মু'মিন ব্যক্তিই সর্বদা অযূ অবস্থায় থাকে— (আহমাদ, ইবনে মাজাহ)। আর যে ব্যক্তি অযূ থাকা সত্ত্বেও আবার অযূ করে তার জন্য ১০টি নেকী লেখা হয়— (তিরমিযী, মিশকাত ৩৮-৩৯ পৃঃ)। আল্লাহর রসূল ﷺ একদা ফজরের নামাযের সময় বিলাল (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন, (মি'রাজের রাতে) আমি জান্নাতে ঢোকার আগে তোমার জুতার খটখট আওয়াজ শুনলাম। এর কারণ কী বলত? বিলাল (রাঃ) বললেন, যখনই আমার অযূ নষ্ট হতো তখনই আমি অযূ করতাম এবং সেই সঙ্গে দু'রাক'আত নামায পড়তাম। আর যখনই আমি আযান দিয়েছি তখনই দু'রাক'আত নামায পড়েছি। রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এ হল ঐ ফযীলতের কারণ— (তিরমিযী, মিশকাত ১১৭ পৃঃ)।

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, অযূহীন ব্যক্তি যতক্ষণ না অযূ করে ততক্ষণ পর্যন্ত তার নামায কবুল হয় না— (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৪০ পৃঃ)। রসূল ﷺ



বলেন, যে ব্যক্তি ‘বিসমিল্লাহ’ বলে না তার অযু হয় না- (আহমাদ, আবু দাউদ, বুলুগুল মারাম ৫ পৃঃ)।

নবী ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি অযু করে এবং ‘বিসমিল্লাহ’ বলে তার এ কাজটি তার সমস্ত শরীর পাক করে আর যে অযু করে এবং ‘বিসমিল্লাহ’ বলে না তার এ কাজটি কেবলমাত্র তার অযুর জায়গাগুলো পাক করে। (দারাকুতনী ১ম খণ্ড ২৭ পৃঃ)

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, হে আবু হুরায়রা! যখন তুমি অযু করবে তখন ‘বিসমিল্লাহ’ এবং ‘আলহামদুলিল্লাহ’ বলবে তাহলে তোমার পর্যবেক্ষক (ফেরেশতা) তোমার জন্য ততক্ষণ নেকী লিখতে থাকবে যতক্ষণ তোমার ঐ অযু নষ্ট না হয়। (মাজমাউয় যাওয়ায়িদ ১ম খণ্ড ২২০ পৃঃ)

অযু সম্পর্কে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সমস্ত হাদীসগুলো একত্রিত করলে অযু করার নিয়মাবলী এরূপ হয় : রসূলুল্লাহ ﷺ অযু করার সময় প্রথমে ‘বিসমিল্লাহ’ পড়তেন- (তিরমিযী)। তারপর দু’হাত কজ্জি পর্যন্ত ৩ বার ধুতেন- (বুখারী ও মুসলিম)। এ হাত ধোয়ার সময় তিনি এক হাতের আঙ্গুল অন্য হাতের আঙ্গুলের মধ্যে ভরে দিয়ে খেলাল করতেন- (আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী)। আর আঙ্গুলে আংটি থাকলে সেটা নাড়িয়ে ভাল করে ধুতেন- (দারাকুতনী, ইবনে মাজাহ)। তারপর তিনি ৩ বার কুলি করতেন এবং ৩ বার নাকে পানি দিয়ে নাক ঝেড়ে ভাল করে নাক সাফ করতেন। তারপর মাথার চুলের নীচু হতে দুই কানের পাশ দিয়ে দাড়ির জায়গা পর্যন্ত সমস্ত মুখমণ্ডলটা ৩ বার ধুতেন- (বুখারী, মুসলিম)। তারপর দাড়ির ভেতরে পানি দিয়ে খেলাল করতেন- (আবু দাউদ, তিরমিযী, দারিমী)। তারপর তিনি দুই হাত কনুই পর্যন্ত ৩ বার ধুতেন। তারপর দুই হাত ভিজিয়ে মাখা মাসাহ করতেন। এ মাসাহের সময় তিনি দু’হাতের আঙ্গুল এক জায়গায় করে সামনের দিক হতে চুলের উপর দিয়ে ঘাড় পর্যন্ত নিয়ে যেতেন এবং পুনরায় ওখান থেকে সামনে নিয়ে আসতেন- (বুখারী, মুসলিম)। কিন্তু মাথায় পাগড়ী থাকলে তার উপর মাসাহ করতেন- (মুসলিম)। তারপর হাত ভিজিয়ে শাহাদাত [তর্জনী] আঙ্গুল দু’টো দুই কানের ভেতর ভরে দিয়ে এবং বুড়ো আঙ্গুল কানের পিঠে বুলিয়ে কান মাসাহ করতেন- (নাসায়ী)। তারপর ডান পা ও বাম পা গাঁট পর্যন্ত ৩ বার ধুতেন- (বুখারী ও মুসলিম)। এ পা ধোবার সময় তিনি কড়ে আঙ্গুল দ্বারা পায়ের আঙ্গুলগুলো খিলাল করতেন- (তিরমিযী, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ)।

নবী ﷺ বলেন, তোমাদের কেউ যখন অযু করবে তখন সে যেন ডান হাত দিয়ে তার পা না ধোয়- (তাবয়ীযে দায়লাম, কানয ৯ম খণ্ড ১৯৭ পৃঃ)। অযুর শেষে একটু পানি নিয়ে তিনি গুণ্ডাঙ্গের কাপড়ের উপর ছিটিয়ে দিতেন- (আবু দাউদ, নাসায়ী, আহমাদ, দারাকুতনী, মিশকাত ৪৩-৪৭ পৃঃ)। নাবী ﷺ বলেন, সর্বপ্রথম ওয়াহীর সময় জিবরীল আমার কাছে আসে এবং আমাকে অযু ও নামায শিখিয়ে দেন। অতঃপর যখন তিনি অযু শেষ করেন তখন এক আঁজলা পানি নিয়ে (কাপড়ের উপরে) গুণ্ডাঙ্গে ছিটিয়ে দেন- (আহমাদ, দারাকুতনী, হাকিম, কানয ৯ম খণ্ড ১৮৩ পৃঃ)। বিখ্যাত সাহাবী ইবনে উমর (রাঃ) অযুর পর গুণ্ডাঙ্গে এত পানি ছিটাতেন যে, তাঁর পায়জামা ভিজে যেত- (মুসান্নাফ আব্দুর রায়যাক ১ম খণ্ড ১৫৩ পৃঃ)।

উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : তোমাদের মধ্যে যে কেউ অযু করবে এবং ভাল করে অযু করবে তারপর নীচের লেখা দু'আটি পড়বে তার জন্য জান্নাতের ৮টি দরজা খোলা হবে। সে যেটা দিয়ে ইচ্ছা জান্নাতে ঢুকতে পারবে। (মুসলিম, মিশকাত ৩৯ পৃঃ)

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

উচ্চারণ : আশহাছ আল্লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াআশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়ারসূলুহু।

তরজমা : আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া আর কেউই ইবাদতের যোগ্য নয়। তিনি এক, তাঁর কোন শরীক (অংশীদার) নেই। আমি এও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর দাস ও তাঁর রসূল বা প্রেরিত দূত।

এ দু'আর সাথে তিরমিযীতে আরও একটি দু'আর কথা আছে। তা হল এই :

اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ.

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মাজ আলনী মিনাত্ তাওওয়া-বীনা ওয়াজ আলনী মিনাল মুতাত্বাহিরীন।

তরজমা : হে আল্লাহ! তুমি আমাকে তওবাকারী এবং পাক সাফ লোকদের অন্তর্ভুক্ত করে দাও। (তিরমিযী, মিশকাত ৩৯ পৃঃ)

## অযূর অন্যান্য মাসআলাসমূহ

রসূলুল্লাহ ﷺ অযূর জায়গাগুলো কখনো একবার, কখনো দুইবার, আবার কখনো তিনবার ধুয়েছেন- (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৪৬ পৃঃ)। অতএব একবার বা দু'বার করে ধুলেও চলবে। তবে তিনবার ধোয়া অতি উত্তম। কারণ রসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবায়ে কিরাম প্রায়ই ৩ বার করে ধুতেন।

উসমান (রাঃ) বলেন, একবার রসূলুল্লাহ ﷺ ৩ বার করে ধুয়ে অযূ করলেন। তারপর বললেন, এটা আমার অযূ এবং আমার পূর্বে সমস্ত নাবীদের অযূ আর ইব্রাহীম (আঃ) এরও অযূ- (রাযীন)। তিনবারের বেশী ধোয়া চলবে না। কারণ রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি তিনের বেশী করবে সে অন্যায় করবে, বাড়াবাড়ি করবে এবং যুল্ম করবে- (নাসায়ী, ইবনে মাজাহ, মিশকাত ৪৭ পৃঃ)।

আনাস (রাঃ) বলেন, আল্লামার রসূল ﷺ এক মুদ (৬৫০ গ্রামের একটু বেশী) পানি দিয়ে অযূ করতেন- (বুখারী ও মুসলিম)। অযূর জায়গা নখ পরিমাণ শুকনো থাকলে অযূ হবে না- (আবু দাউদ, নাসায়ী, বুলুগুল মারাম ৬ পৃঃ)। অযূর জায়গায় পট্টা বাঁধা থাকলে কিংবা সেখানে পানি লাগলে ক্ষতির আশংকা থাকলে ভিজ়ে হাতে মাসাহ করতে হবে- (আবু দাউদ)। এক পাত্র পানিতে প্রথমে স্বামী ও পরে স্ত্রী কিংবা প্রথমে স্ত্রী ও পরে স্বামী অযূ বা গোসল করতে পারে। কারণ রসূলুল্লাহ ﷺ ও 'আয়িশা (রাঃ) এবং অন্যান্য সাহাবীরাও এরূপ করতেন- (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৪৮ পৃঃ)। ঘুমিয়ে ওঠার পর দু'হাত কজ্জি পর্যন্ত ধোয়ার আগে পানির পাত্রে (বালতি, জালা, ডাব্বল প্রভৃতিতে) হাত ডোবাতে রসূলুল্লাহ ﷺ নিষেধ করেছেন- (বুখারী, মুসলিম)। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যখন তোমাদের কেউ অযূ করবে তখন সে যেন তিনবার নাক ঝাড়ে। কারণ, শয়তান তার নাকের ভিতর রাত কাটায়- (বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত ৪৫)।

'আয়িশা (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ এর জন্য একটি তোয়ালে ছিল যার দ্বারা তিনি অযূ করার পর অযূর জায়গাগুলো মুছতেন- (তিরমিযী)। ইমাম তিরমিযী বলেন, এ হাদীসটি ঠিক নয়। কারণ এ হাদীসের একজন রাবী আবু মাআয মুহাদ্দিসীনে কিরামের নিকট যরীফ ও দুর্বল- (মিশকাত ৪৭ পৃঃ)।

আনাস (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ এর অযু থাক বা না থাক তিনি প্রত্যেক নামাযের সময় অযু করতেন। কিন্তু আমরা অযু না ভাঙ্গা পর্যন্ত এক অযুতে কয়েকটি নামায পড়তাম— (তিরমিযী ১০ পৃঃ, দারিমী, মিশকাত ৪৭ পৃঃ)। তবে মক্কা বিজয়ের দিন রসূলুল্লাহ ﷺ এক অযুতে পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়েছেন— (আবু দাউদ ১ম খণ্ড ২৩ পৃঃ)।

রসূলুল্লাহ ﷺ অযুর পাড়ে পাক হাত ডুবিয়ে অযু করতেন— (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৪৫ পৃঃ) সাহাবীরাও এরূপ করতেন। আব্দুল্লাহ ইবনে যায়দ ইবনে আসিম (রাঃ) একদা লোকদের সামনে রসূলুল্লাহ ﷺ এর অযু করে দেখালেন। প্রথমে তিনি পাত্রটি কাত করে তিনবার হাত ধুলেন, তারপর পাত্রটির ভেতরে হাত ঢুকিয়ে ঢুকিয়ে পানি দিয়ে অযু পুরো করলেন— (বুখারী ও মুসলিম)।

অতএব অযুর সময় হাত মুখ প্রভৃতি ধোয়া পানির ছিটা (যাকে কেউ কেউ “মায়ে মুস্তামাল” বা ব্যবহৃত পানি বলেন) অযুর পাড়ে পড়লে সে পানি নাপাক হয় না। আব্দাহর রসূল ﷺ বলেন, নামাযের মধ্যে তোমাদের কারো কারো কাছে শয়তান আসে এবং তার গুহাঘারে ফুক দিতে থাকে। ফলে সে মনে করে যে তার অযু ভেঙ্গে গেছে। আসলে তার অযু ভাঙ্গে না। সুতরাং এমতাবস্থায় সে নামায ছাড়বে না যতক্ষণ না সে বাতকর্মের আওয়াজ শুনতে পায় কিংবা তার দুর্গন্ধ নাকে পায়— (বায়হার, বুলুগল মারাম ৮ পৃঃ)। অযু করার সময় প্রয়োজনীয় কথা বলার ব্যাপারে কোন নিষেধাজ্ঞা নেই।

## অযুতে ঘাড় মাসাহ সুন্নাত নয়

অযুতে মাথা ও কান মাসাহ করার পর দুই হাতের পিঠ দ্বারা ঘাড় মাসাহ করার কথা কোন সহীহ হাদীসে পাওয়া যায় না। এ ব্যাপারে একটি হাদীস পাওয়া যায়, কিন্তু ঐ হাদীস সম্পর্কে ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, হাদীসটি মওযু বা জাল। এটা রসূলুল্লাহ ﷺ এর উক্তি নয়। তাই এটা সুন্নাত নয়, বরং বিদআত— (নায়লুল আওতার ১ম খণ্ড ১৫৮ পৃঃ)। এজন্য হানাফী ফকীহ কাযী খান বলেন, ঘাড় মাসাহ আদবও নয়, সুন্নাতও নয়— (কাবীনী ২৪ পৃঃ)। আর এক হানাফী ফকীহ হিদায়ার ব্যাখ্যাকার আব্দামা ইবনুল হুমাম বলেন, কেউ বলেন, এটা বিদআত— (ফাতহুল কাদীর ১ম খণ্ড ১৪ পৃষ্ঠা)। ফাতওয়া তাতার খানিয়ার ১৫ পৃষ্ঠায় আছে, ইমাম

মুহাম্মাদ (রঃ) তাঁর আসল কিতাবে ঘাড় মাসাহ এর উল্লেখই করেননি— (যাহরাতু রিয়া-যিল আবরার ৫৯ পৃঃ)।

ইমাম নববী বলেন, অধিকাংশ শাফিয়ী বিদ্বানের মতে ঘাড় মাসাহ হবে না। কারণ, এর কোন প্রমাণ নেই। এজন্য ইমাম শাফিয়ী এবং প্রাথমিক যুগের আলিমগণ এর উল্লেখ করেননি। (রওয়াতু ত-লিবীন ১ম খণ্ড ৬১ পৃঃ)

হাফিয ইবনুল কাইয়িম বলেন, ঘাড় মাসাহের ব্যাপারে রসূলুল্লাহ ﷺ থেকে কোন সহীহ হাদীস নেই। (যাদুল মাআদ ১ম খণ্ড, ৪৯ পৃঃ)

## অযু করাকালীন কোন দু'আ আছে কি?

অযু করা অবস্থায় রসূলুল্লাহ ﷺ দু'আ পড়েছেন বলে পরিষ্কার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ) বলেন, একদা আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে অযুর পানি আনলাম। অতঃপর তিনি অযু করলেন। তখন তাঁকে আমি এ কথাগুলো বলতে শুনলাম :

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي وَوَسِّعْ لِي فِي دَارِيَّ وَبَارِكْ لِي فِي رِزْقِي.

উচ্চারণ : আল্লাহ্মাগ ফিরলী যামবী ও ওয়াসসি' লী ফী দা-রী ওয়াবা-রিক লী ফী রিয্কী।

অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমার গোনাহ মার্ফ কর এবং আমার ঘরে স্বাচ্ছন্দ্য দান কর আর আমার রুখীতে বরকত দাও। (নাসায়ী ১ম খণ্ড, ইবনে সুন্নীর আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লায়লাহ ৮ পৃঃ)

এ দু'আটি আল্লামা ইবনে সুন্নী অযু করাকালীন দু'আর শিরোনামার অধীন লিখেছেন। কিন্তু হাদীসের শব্দ দ্বারা তা প্রমাণিত হয় না। তাই তাঁর ওস্তাদ ইমাম নাসায়ী (রহঃ) এ দু'আটিকে অযু শেষ করার পর শিরোনামার অধীনে লিখেছেন। এ মতভেদের কারণে ইমাম নববী বলেন, দু'টি মতই সম্ভব হতে পারে। (আল আযকার কাবীরী ৩৬ পৃঃ)

## অযূর প্রত্যেক অঙ্গ ধোয়ার দু'আ ভিত্তিহীন

বড় পীর আব্দুল কাদের জীলানী ও ইমাম গাফ্বালী (রঃ) অযূর প্রত্যেকটি অঙ্গ যেমন হাত, মুখ, পা ঞ্জত্ৰি ধোয়ার সময় একটি করে দু'আ বিনা বরাতে লিখেছেন- (গুনয়্যাভুত্ ত-লিবীন বাংলা অনুবাদ ১ম খণ্ড ১৫-১৯ পৃঃ, ইহুইয়াউল উলূম, বাংলা তর্জমা ১ম খণ্ড ২৪৬-২৪৮ পৃঃ)। ইলয়্যাসী তাবলীগওয়ালাদের অনেকে ঐ দু'আ পড়েন এবং অপরকে পড়ান ও শেখান।

ভারতের হানাফী মুহাদ্দিস আল্লামা আলাউদ্দীন 'আলী মুত্তাকী হিন্দী (রহঃ) দু'আগুলো ইবনে মানদার কিতাবুল অযূ এবং দায়লামী ও মুত্তাগফিরীর দা'ওয়াত এবং ইবনে নাজ্জারের হাওয়ালা দিয়ে লিখে বলেন, এ হাদীসটি জাল হাদীসের মধ্যে পড়ে- (কানযুল উম্মাল ৯ম খণ্ড ২৭৯ পৃঃ)। আল্লামা শামী হানাফী বলেন, হিলয়্যাহ গ্রন্থ প্রণেতা বলেছেন, এ দু'আটি রসূলুল্লাহ ﷺ থেকে প্রমাণিত আছে বলে আমি জানতে পারিনি- (শামী ১ম খণ্ড)।

হাফিয় ইবনুল কাইয়িম (রাঃ) বলেন, অযূর প্রত্যেক অঙ্গ ধোয়ার সময় জনগণ যে দু'আগুলো বলে তার কোন ভিত্তি রসূলুল্লাহ ﷺ থেকে নেই এবং কোন সাহাবী ও তাবিয়ী এমনকি চার ইমাম থেকেও নেই। এ ব্যপারে যে হাদীস পাওয়া যায় তা রসূলুল্লাহ ﷺ এর নামে মিথ্যা অপবাদ। (আলওয়াবিলুস সাইয়িব ২৮৯ পৃঃ)

তেমনি অযূর নিয়্যাতের নাম করে কোন একটি হরফ রসূলুল্লাহ ﷺ কিংবা কোন সাহাবী থেকেও বর্ণিত নেই, বিত্ত্ব সনদেও নয় এবং দুর্বল সূত্রেও নয়।

(যাদুল মাআদ ১ম খণ্ড ৪৯ পৃঃ)

## অযূর শেষে সূরা কাদর পড়াও ভিত্তিহীন

হানাফী কিছু ফকীহ যেমন দুররে মুখতার প্রণেতা ও আল্লামা তাহতাত্তী অযূর শেষে সূরা "ইন্না আনযালনা-হু ফী লায়লাতিল কাদর" তিনবার পড়ার কথা বলেছেন এবং মুসনাদে দায়লামী ও মুকাদ্দামাহ ফকীহ আবুল লায়সের বরাতে দিয়েছেন। (দুররে মুখতার ১ম খণ্ড ২৪ পৃঃ, হাশিয়া তাহতাত্তী ৪৪ পৃঃ, কাবীরী ২৫ পৃঃ, কানয ৯ম খণ্ড ১৮১ পৃঃ)

এ সম্পর্কে অন্য ফকীহরা বলেন, ‘মাক-সিদে হাসানাহ’ গ্রন্থে আছে অযূর পরে সূরা “কাদর” পড়ার প্রমাণই নেই। বরং ফকীহ আবুল লায়সের ভূমিকায় যা আছে তার শব্দ প্রমাণ করে যে, ঐ হাদীসটি জাল— (আল মাক-সিদুল হাসানাহ ৪২৪ পৃঃ, মারা-কিল ফালাহ ৪৪ পৃঃ)। আল্লামা শা-মী বলেন, হিলয়্যাহওয়াল্লা বলেছেন, এ ব্যাপারে আমাদের গুরু হাফিয ইবনে হাজার আসকালানীকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, এ সংক্রান্ত কোন জিনিসই রসূলুল্লাহ ﷺ থেকে তার উক্তি কিংবা ক্রিয়া দ্বারা প্রমাণিত নেই— (শামী ১ম খণ্ড ১২২ পৃঃ)।

### অযূ নষ্টের কারণাবলী

কী কী কারণে অযূ নষ্ট হয় সে সম্পর্কে কোন একটি রিওয়াযাতে সব বর্ণনা এক সাথে পাওয়া যায় না। তাই বিভিন্ন হাদীসগুলো একত্রিত করলে অযূ ভঙ্গের নিম্নলিখিত কারণগুলো পাওয়া যায়।

১। পেশাব ও পায়খানার রাস্তা দিয়ে কিছু বের হলে, ২। যে সব কাজ করলে গোসল ফরয হয় তা ঘটলে, ৩। বমি হলে, ৪। ঘুমিয়ে পড়লে, ৫। নাক দিয়ে রক্ত বের হলে, ৬। উটের গোশত খেলে, ৭। পর্দাহীন অবস্থায় পেশাবের জায়গায় হাত দিলে, ৮। নামায পড়ার সময় পুরুষদের পরিধেয় কাপড় পায়ের গাঁটের নীচে ইচ্ছাকৃত বুলিয়ে দিলে, ৯। বেহুঁশ হলে, ১০। মরা লাশকে গা ধোয়ালে, ১১। মযী বের হলে প্রভৃতি কাজে অযূ নষ্ট হয়ে যায়। (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ, আহমাদ, দারিমী, মালিক, মিশকাত ৪০-৪১ পৃঃ, বুলুগল মারাম ৭ পৃঃ)

বসে বসে তন্দ্রায় ঝিমালে অযূ নষ্ট হয় না— (তিরমিযী, আবু দাউদ, মিশকাত ৪১ পৃঃ)। অযূ করার পর হাঁটুর উপর কাপড় উঠে গেলে অথবা কাউকে উলঙ্গ দেখলে অযূ ভাঙ্গে না।

### রক্ত বের হলে অযূ ভাঙ্গে কিনা?

সুনানে দারাকুতনী ও ইবনে আদীর কামিলে একটি হাদীসে আছে যে, রক্ত বেরিয়ে গড়িয়ে পড়লে অযূ ভাঙ্গে যাবে। হানাফী মাযহাবের ফাতওয়া তাই। কিন্তু ইমাম মালিক, শাফিযী ও ইমাম আহমাদের মতে অযূ ভাঙ্গে না।

উপরোক্ত দু'টি হাদীস সম্পর্কে হানাফী মুহাদ্দিস আল্লামা যায়লায়ী (রহঃ) বলেন, দু'টি হাদীসের বর্ণনাকারীদের মধ্যে কতিপয় রাবী দোষে দুষ্ট। তাই দু'টি হাদীস দলীলের অযোগ্য। (নাসবুর রায়াহ ১ম খণ্ড ৩৭ পৃঃ)

উমর (রাযিঃ) যখন শহীদ হন সেই সময় খুন বরতে থাকা অবস্থায় তিনি নামায পড়েন- (মালিক, ইবনে আবী শায়বা, তাবারানী আওসাত, কানয ৯ম খণ্ড ৩৭০)। যাতুর রিকআ যুদ্ধের সময় দু'জন সাহাবী পাহারা দেবার কালের একজন নামাযে দাঁড়ালে কাফিরদের তীরের যথমে রক্ত বেরোন অবস্থায় তিনি নামায পড়েন- (ইবনে খুযায়মা, আবু দাউদ, তালখীসুল হাবীর ১ম খণ্ড ৪২ পৃঃ)। হাসান বাসরী (রহঃ) বলেন, মুসলমানগণ যখন অবস্থায় নামায পড়তেন- (বুখারী ১ম খণ্ড ২৯ পৃঃ)।

খলীফা মু'তাসিম বিল্লাহর ৯ জন জালাদ যখন ইমাম আহমাদ (রহঃ)-কে ৮০টি দোররা মেরে ছেড়ে দেয় তখন তিনি রক্ত বরা অবস্থায় যোহরের নামায পড়েন এবং কেউ আপত্তি করলে তিনি জওয়াবে বলেন, 'উমর খুন বরা অবস্থায় ফজরের নামায পড়েছিলেন। (সিফাতুস সফওয়া, আযীমাত ওয়া দা'মত ৪৭-৪৮ পৃঃ)


তাই আহলে হাদীসদের মতে প্রবাহিত রক্তে অযু ভাঙ্গে না।

বিনা অযুতে যে কাজগুলো করা যেতে পারে, তবে অযুসহ করা বেশী ভাল।

১। কুরআন তিলাওয়াত করা, ২। তিলাওয়াতের ও শোকরের সিজদা দেয়া, ৩। আযান দেয়া, ৪। মাসজিদে ঢোকা, ৫। কুরবানী ও আকীকার জানোয়ার যবহ করা, ৬। বিবাহের খুত্বা পাঠ করা, ৭। ওয়ায ও নসীহত করা, ৮। কুরআন ও হাদীস ছোঁয়া ইত্যাদি।

## তায়াম্মুমের বিবরণ

আল্লাহ বলেন, যদি তোমরা কেউ অসুস্থ থাক, কিংবা সফরে থাক, অথবা পায়খানা থেকে ফিরে আস অথবা স্ত্রীদের সাথে মেলামেশা করে থাক, অতঃপর পানি না পাও তাহলে পাক মাটি দ্বারা তায়াম্মুম কর। (সূরা মায়িদাহ্ ৬ আয়াত)

একদা রসূলুল্লাহ  'আম্মার (রাঃ) কে বলেন, তায়াম্মুমের ব্যাপারে তোমার জন্য এরূপ করা যথেষ্ট ছিল এ বলে তিনি পাক মাটিতে একবার দুই হাত মারলেন



এবং দুই হাতে ফুক দিলেন। তারপর দুই হাত দিয়ে মুখমণ্ডল ও দুই হাত কজি পর্যন্ত মাসাহ করলেন। (বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত ৫৪ পৃঃ)

ইবনে 'উমর (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, তায়ান্নুমের দুই মার। অর্থাৎ একবার পাক মাটিতে হাত মেখে মুখ মাসাহ করা এবং আর একবার হাত মেখে কনুই পর্যন্ত হাত মাসাহ করতে হবে। (দারাকুতনী, বুলুগল মারাম ১১ পৃঃ)

আম্মার ইবনে ইয়া-সিরের একটি বর্ণনায় আছে যে, রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে সাহাবীরা বগল পর্যন্ত হাত মাসাহ করতেন। (আবু দাউদ, মিশকাত ৫৫ পৃঃ)

হাকিম ইবনে হাজার আসকালানী “ফাতহুল বারীতে” এবং ইমাম শওকানী “আস্‌সায়লুল জাররারে” বলেন, তায়ান্নুম সম্পর্কে বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত দু'টি সহীহ হাদীস ছাড়া বাকি সমস্ত হাদীসগুলোই হয় যযীফ (দুর্বল) না হয় গাযির মারফু' (যার সনদ রসূলুল্লাহ ﷺ পর্যন্ত পৌছায় না)। সুতরাং ঐ হাদীসগুলোর উপর আমল করা ঠিক হবে না। (মির-আ তুল মাফা-তীহ ১ম খণ্ড ৩৪৬ পৃঃ)

অতএব তায়ান্নুমের মার দুই নয় বরং এক এবং হাত মাসাহ বগল পর্যন্ত নয়, বরং কজি পর্যন্ত।

ইমাম ইবনে হাযমও বলেন, তায়ান্নুমের মার দু'বার সংক্রান্ত সমস্ত হাদীসগুলোই অচল। তাই ওদ্বারা দলীল পেশ করা জাযিয় নয়। (আল-মুহাল্লা ২য় খণ্ড ১৪৮ পৃঃ)

আম্মার ইবনে ইয়াসির বর্ণিত হাদীসটির ব্যাখ্যায় হানাফী মুহাদ্দিস মাওলানা আহমাদ আলী সাহারানপুরী (রহঃ) বলেন, এ হাদীস প্রমাণ করে যে, তায়ান্নুমের মার চেহারা ও দুই কজির জন্য মাত্র একবার- (বুখারী ৫০ পৃষ্ঠায় ২নং টীকা)। অন্য হানাফী ফকীহ মাওলানা আব্দুল হাই লাক্ষেনাভী (রহঃ) বলেন, তায়ান্নুমের দুই মার- এক মার চেহারার জন্য এবং অন্য মার দুই হাতের জন্য কনুই পর্যন্ত-যা হাকিম ইবনে আদী, দারাকুতনী ও বায্‌যার প্রমুখ বর্ণনা করেছেন ওর অধিকাংশ সূত্রই যযীফ- (শারহে বিকায়াহ ৫৯ পৃঃ ৩নং টীকা)।

ইমাম হাসান ইমাম আবু হানীফা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তায়ান্নুমের হাত মাসাহ কজি পর্যন্ত হবে (কনুই পর্যন্ত নয়)। ইবনে 'আব্বাস (রাঃ) থেকেও এটাই বর্ণিত। (হিদায়া ১ম খণ্ড ৩৪ পৃষ্ঠার ৩নং টীকা)

## তায়াম্মুমের অন্যান্য মাসআলাসমূহ

যদি কোন জুমুৰী (নাপাক লোক যার উপর গোসল করা ফরয) অসুখের ভয় করে, কিংবা মরণের আশংকা করে অথবা পিপাসার পানি ফুরিয়ে যাবার ভয় করে তাহলে সে তায়াম্মুম করতে পারে- (বুখারী ৪৯ পৃঃ, হাকিম ১ম খণ্ড ১৬৫ পৃঃ)। যদি কেউ পানি না পায় এবং নামায ছেড়ে যাবার ভয় থাকে তাহলে সে তায়াম্মুম করতে পারে। যদি কেউ পানি না পায় এবং মাটিও না পায় তাহলে সে বিনা অযুতেই নামায পড়তে পারে- (বুখারী ৪৮ পৃঃ)। তায়াম্মুম করে নামায পড়ার পর পানি পাওয়া গেলে আবার অযু করে নামায পড়তে হবে না- (আবু দাউদ, নাসায়ী, দারিমী, মিশকাত ৫৫ পৃঃ)।

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, পাক মাটিতে মুসলমানের অযু। যদিও সে দশ বছর পানি না পায়। তবে হ্যাঁ, যখন সে পানি পাবে তখনই তাকে গোসল করতে হবে। কারণ এটা ভাল কাজ- (আহমাদ, তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসায়ী, মিশকাত ৫৪ পৃঃ)। অন্য হাদীসে রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, নাপাক পুরুষ ও স্ত্রী এবং হারিয় ও নিফাসওয়ালা স্ত্রী পানি না পেলে তায়াম্মুম করে নামায পড়বে- (তিরমিযী ১ম খণ্ড ১৮ পৃঃ এবং বায়হাকী ১ম খণ্ড ২১৬ পৃঃ)।

ইবনে 'আব্বাস (রাঃ) তায়াম্মুম করে ইমামতি করেছেন। (বুখারী ৪৯ পৃঃ)

'আব্দুল্লাহ ইবনে 'আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, সুন্নাহ হল একজন লোক এক তায়াম্মুমে যেন এক ওয়াস্তের বেশী নামায না পড়ে। তারপর সে অন্য নামাযের জন্য আবার তায়াম্মুম করবে- (মুসান্নাফ আব্দুর রায্যাক ১ম খণ্ড ২১৫ পৃঃ)। ইবনে 'উমর (রাঃ)-এর বর্ণনায় আছে, তায়াম্মুম যদিও নষ্ট না হয় তথাপিও প্রত্যেক নামাযের জন্য তাকে তায়াম্মুম করতে হবে- (বায়হাকী ১ম খণ্ড ২২১ পৃঃ)।

'আলী (রাঃ) বলেন, কোন লোক যদি মরুভূমি মাঠে নাপাক হয়ে যায় এবং তার কাছে যদি সামান্য পানি থাকে তাহলে সে নিজের প্রাণের জন্য পানি রাখবে এবং পাক মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করবে- (ইবনে আবী শায়বা ১ম খণ্ড ১০৫ পৃঃ)। ইবনে 'আব্বাস (রাঃ) বলেন, কোন ব্যক্তি নাপাক হয়ে গেলে তার শরীরে যদি জখম কিংবা বসন্ত রোগ থাকে এবং সে যদি গোসল করে প্রাণের আশংকা করে তাহলে মাটি দিয়ে তায়াম্মুম করবে- (ঐ- ১০১ পৃঃ)।

আতা থেকে বর্ণিত আছে যে, নাবী ﷺ এর যুগে এক বসন্ত রোগীর স্বপ্নদোষ হলে লোকেরা তাকে গোসল দেয়। ফলে সে মারা যায়। অতঃপর খবরটি নাবী ﷺ এর কাছে পৌছলে তিনি বলেন, ওরা ওকে নষ্ট করেছে। আল্লাহ ওদেরকে নষ্ট করুন। ওরা ওকে হত্যা করেছে। আল্লাহ ওদেরকে হত্যা করুন। (ঐ)

যেসব কারণে অযু নষ্ট হয় সেসব কারণে তায়াম্মুম নষ্ট হয়। তাছাড়া তায়াম্মুম অবস্থায় পানি পাওয়া গেলে তায়াম্মুম নষ্ট হয়ে যাবে। অযু ও গোসল উভয়ের পরিবর্তে যে তায়াম্মুম করা হয় তার নিয়ম একই। এর মধ্যে কোন তফাৎ নেই।

## মোজার ওপর মাসাহের বিবরণ

মুগীরা ইবনে শু'বা হতে বর্ণিত, একদিন আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে ছিলাম। তিনি অযু করলেন তখন আমি তাঁর পা থেকে মোজা দু'টো খুলবার জন্য নীচু হলাম। তিনি বললেন ছেড়ে দাও, ও দুটো আমি পাক অবস্থায় পরেছিলাম। তারপর তিনি মোজা দু'টোর উপর মাসাহ করলেন। (বুখারী-মুকাদ্দামা, বুলুগল মারাম ৬ পৃঃ)

শুরায়হ ইবনে হানী বলেন, আমি 'আলী (রাঃ)-কে মোজার উপর মাসাহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম, তিনি বললেন, রসূলুল্লাহ ﷺ মুসাফিরের জন্য তিন দিন ও তিন রাত এবং নিজ গৃহে বাসকারী মুকীমের জন্য একদিন এক রাত মাসাহ করার কথা বলেছেন। (মুসলিম, মিশকাত ৫৩ পৃঃ)

যেসব কারণে অযু নষ্ট হয় সেসব কারণে মোজার উপর মাসাহ নষ্ট হয়। তাছাড়া মুকীম ও মুসাফিরের নির্দিষ্ট সময় পার হয়ে গেলে কিংবা মোজা খুলে ফেললে অথবা গোসল ফরয হলে মাসাহ নষ্ট হয়ে যায়। (তিরমিযী, নাসায়ী, মুসলিম, মিশকাত ৫৪ পৃঃ)

বিবেক বলে যে, মোজার উপরে মাসাহ করার সময় পায়ের তলার দিকে মাসাহ করা উচিত। কিন্তু ইসলাম যেহেতু পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতাকে অর্ধেক ঈমান মনে করে এবং বিবেক অনুসারে পায়ের তলায় মাসাহের হুকুম দিলে হাতটা দুর্গন্ধময় হয়ে যেতে পারে, তাই সে নির্দেশ দিয়েছে যে, তোমরা পায়ের পিঠের দিকে মোজার উপরে মাসাহ কর। এ বিধানটি বিশেষভাবে প্রমাণ করে যে, ইসলামী আইনে কারো ব্যক্তিগত বিবেক খাটে না।

তাই 'আলী (রাযিঃ) বলেন, ধর্ম যদি বিবেক অনুসারে হতো তাহলে দুই পায়ের তলা পায়ের পিঠের তুলনায় মাসাহের অধিক অধিকারী হতো। কিন্তু আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখেছি তিনি দুই পায়ের পিঠের ওপরে মাসাহ করেন। (মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক, ইবনে আবী শায়বা, আবু দাউদ, কানযুল উম্মাল ৯ম খণ্ড ৩৬০ পৃঃ, দারিমী, মিশকাত ৫৪ পৃঃ)।

## নামাযীর লেবাসের বিবরণ

অযু ও গোসল বা তায়াম্মুম দ্বারা সব রকম নাপাকী হতে পাক হবার পর নিজের সতর ঢাকবার জন্য লেবাস-পোষাকের দরকার হয়। পুরুষের নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত সতর- (দারাকুতনী ১ম খণ্ড ৮৫ পৃঃ)। পুরুষের ঐ অঙ্গটা নিজের স্ত্রী ছাড়া বাকী সব সময় সমস্ত লোকের সামনে ঢেকে রাখতে হবে। বিনা কারণে ঐ অঙ্গটা খুললে গুনাহ হবে। তেমনি মেয়েদের মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত সর্বাত্ম শরীরটাই সতর। নামাযের সময় নামাযীকে কতটা অঙ্গ ঢাকতে হবে এবং তার লেবাস কিরূপ হবে সে সম্পর্কে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বাণী শুনুন।

আল্লাহ বলেন, “হে আদম সন্তান! তোমরা প্রত্যেক সিজদার সময় সুন্দর সুন্দর কাপড় পড়”- (সূরায়ে আ'রাফ ৩১ আয়াত)। তাই আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, যখন তোমাদের কেউ নামায পড়বে তখন সে যেন তার সুন্দর লেবাসটা পরে। কারণ একমাত্র আল্লাহই এ বিষয়ের সবচেয়ে বেশী হকদার যাঁর সম্মানার্থে চাকচিক্যময় লেবাস পরা যায়- (তাবারানী কাবীর, মাজমাউয্ যাওয়া-য়িদ ২য় খণ্ড ৫১ পৃঃ)।

উপরে উল্লিখিত আয়াত ও রসূলের ﷺ হাদীসটি প্রমাণ করে যে, নামাযের সময় ভাল ভাল ও খাস পোষাক পরা উচিত। এজন্য মনে হয় বড় বড় আবিদ ও তাপসরা নামাযের জন্যই খাস লেবাস রাখতেন, যা তারা নামায ছাড়া অন্য সময়ে পরতেন না। মানুষ সাধারণতঃ অফিস-আদালতে গেলে কিংবা আত্মীয় স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবের বাড়ীতে গেলে সুন্দর সুন্দর লেবাস পরে। সুতরাং যার অফিস আদালত সবচেয়ে বড় এবং যিনি মু'মিনের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং আপন তাঁর দরবারে গেলে কিরূপ লেবাস পরা উচিত সেটা সহজেই অনুমেয়। আহলে হাদীস

ভাইদের অনেকে লেবাস থাকা সত্ত্বেও শুধু গেঞ্জি অথবা কেবলমাত্র গামছা বা তোয়ালে গায়ে দিয়ে নামায পড়ে এটা তাদের বদ অভ্যাস। তাদের এ কু-অভ্যাস ত্যাগ করা উচিত।

সাহাবী ইবনে মাস'উদ (রাঃ) বলেন, যখন আমাদের মধ্যে কাপড়ের অভাব ছিল তখন একটি মাত্র কাপড়ে নামায চলতো। কিন্তু যখন আল্লাহ স্বচ্ছলতা দান করেন তখন দুটো কাপড়ে (একটা পরার ও একটা গায়ে দেবার) নামায পড়াটা উত্তম বলে গণ্য করা হয়— (আহমাদ)। যদি কারো একটার বেশী কাপড় না থাকে তার জন্য আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, তোমাদের কেউ যেন তার দুই কাঁধ না ঢাকা পর্যন্ত এক কাপড়ে নামায না পড়ে— (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৭২ পৃঃ)। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, একদা একজন লোক পায়ের গাটের নীচে পরনের কাপড় ঝুলিয়ে নামায পড়ছিল। তাকে আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, যাও অযু করে এসো। সে গেল এবং অযু করে এলো। অন্য একজন তাকে জিজ্ঞেস করলেন, কী ব্যাপার! আপনি লোকটিকে অযু করার হুকুম দিলেন কেন? তিনি বললেন, লোকটি পরনের কাপড় গাটের নীচে ঝুলিয়ে নামায পড়ছিল। যে ব্যক্তি এরূপ কাপড় লটকে নামায পড়ে আল্লাহ তার নামায কবুল করেন না— (আবু দাউদ)। এ হাদীস প্রমাণ করে যে, পায়ের গাটের নীচে কাপড় ঝুলে থাকলে অযু নষ্ট হয়ে যায় এবং নামাযও কবুল হয়না। অতএব সাবধান! তিনি (ﷺ) বলেন, যেসব মেয়েদের হায়িয হয়ে থাকে তাদের নামায বিনা চাদরে কবুল হয় না— (আবু দাউদ, তিরমিযী)। তিনি ﷺ মুখ ঢেকে নামায পড়তে মানা করেছেন— (ঐ- মিশকাত ৭৩ পৃঃ)।

যার মোটেই কাপড় নেই, বরং উলঙ্গ অবস্থায় তাকে থাকতে হয় তারও নামায মাফ নেই। ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, তাকে ঐ নেংটা অবস্থায় বসে বসে নামায পড়তে হবে। (মুসান্নাফ আব্দুর রায্যাক ২য় খণ্ড ৫৮৪ পৃঃ)

রসূলুল্লাহ ﷺ প্রায়ই মাথায় পাগড়ী পরে এবং কখনো টুপি পরে নামায পড়তেন। সুতরাং পাগড়ী বা টুপি পরে নামায পড়া সন্নাত। ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত, নাবী ﷺ কখনো কখনো টুপি খুলে সামনে সুতরা বানাতেন— (ইবনে আসাকির জামে সাগীর ২য় খণ্ড ১০০ পৃঃ)। হানাফীদের নিকটেও খালি মাথায় নামায পড়ায় কোন আপত্তি নেই। তারা এটাকে মুস্তাহাব মনে করে যখন তা বিনয় প্রকাশের জন্য হয়। তাছাড়া নামাযে মাথা ঢাকা উত্তম বলে কোন দলীলও পাওয়া

যায় না। আল্লামা সাইয়িদ সাবেক মিসরী তাই বলেন— (ফিকহুস সুন্নাহ ১ম খণ্ড ১২৮ পৃঃ)।

এরূপ পাঞ্জাবী বা শার্ট পরে নামায পড়বার সময় যদি কেউ আস্তিন গুটিয়ে রেখে কনুই বের করে নামায পড়ে তাহলে নামায মাকরুহ হবে বলে যারা ফাতওয়া দেন সেটা তাদের মনগড়া ফাতওয়া, রসূলুল্লাহ ﷺ এর ফাতওয়া নয়।

রসূলুল্লাহ ﷺ কখনও জুতো পায়ে এবং কখনও খালি পায়ে নামায পড়তেন। (আবু দাউদ, মিশকাত ৭৩ পৃঃ)

## লেবাস সংক্রান্ত ইসলামী বিধান


রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, তোমরা যা ইচ্ছা পর যতক্ষণ তাতে দাষ্টিকতা প্রকাশ না পায়— (বুখারী তরজমাতুল বা-ব, মিশকাত ৩৭৭ পৃঃ)। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও সৌন্দর্যবর্ধক কাপড় ত্যাগ করে আল্লাহ তাকে মর্যাদার পোষাক পরাবেন— (আবু দাউদ, তিরমিযী)। আমার উম্মাতের নারীদের জন্য সোনা ও রেশম হালাল করা হয়েছে, কিন্তু পুরুষের জন্য তা হারাম করা হয়েছে— (তিরমিযী, নাসায়ী, মিশকাত ৩৭৫ পৃঃ)। তিনি (ﷺ) রেশম পরতে নিষেধ করেছেন, কিন্তু দুই কিংবা তিন অথবা চার আব্দুল জায়গা ছাড়া— (মুসলিম, মিশকাত ৩৭৪ পৃঃ)।




তিনি (ﷺ) বলেন, মু'মিনের পরনের কাপড় হাঁটু এবং পায়ের গাঁটের মাঝ বরাবর থাকবে। তবে ওথেকে নেমে গাঁটের ওপর কজ্জি পর্যন্তও যদি থাকে তাতেও আপত্তি নেই। কিন্তু গাঁটের নীচে নামলে তা জাহান্নামের আগুনে যাবে। এ কথা তিনি তিনবার বলেছেন। আর যে ব্যক্তি তার পরনের কাপড় গর্ব ভরে ঝুলিয়ে রাখবে আল্লাহ তার দিকে কিয়ামতের দিনে তাকাবেন না— (আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ)। তিনি যখন জামা পরতেন তখন ডানদিক থেকে শুরু করতেন— (তিরমিযী, মিশকাত ৩৭৪ পৃঃ)।


শারহে মুত্তাহা বলেন, পুরুষের সুন্নাহ হল নাভির উপরে পরনের কাপড় পরা এবং নাভির উপরেই পায়জামার দড়িটা বাঁধা। (আল-আসয়িলাহ ১ম খণ্ড ৯৯ পৃঃ)

একদা তিনি (ﷺ) 'আব্দুল্লাহ ইবনে 'আমর ইবনে আসির গায়ে একজোড়া হলদে (গেরুয়া) রং পোষাক দেখে বলেন, এটা কাফিরদের পোষাকের মধ্যে

একটি। অতএব এটা পর না। বরং এ দু'টোকে পুড়িয়ে দাও। (মুসলিম, মিশকাত ৩৭৪ পৃঃ)

একদা একজন লোক একজোড়া লাল রং এর কাপড় পরে যাবার সময় নাবী -কে সালাম দেন। কিন্তু তিনি তার জওয়াব দেননি। (তিরমিযী, আবু দাউদ, মিশকাত ৩৭৫ পৃঃ)


তিনি  বলেন, তোমরা যা পরে কবরে এবং মাসজিদে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করে থাক তন্মধ্যে সর্বোত্তম রং হলো সাদা- (ইবনে মাজাহ, মিশকাত ৩৭৭ পৃঃ)। আবু যার (রাঃ) বলেন, একদা আমি রসূলুল্লাহ -এর গায়ে দু'টি সবুজ রং এর চাদর দেখলাম- (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী)। 'আয়িশা (রাযিঃ) বলেন, একদা নাবী  সকালে বের হলেন। তখন তাঁর দেহে কাল রং চাদর ছিল- (আহমাদ, মুসলিম, তিরমিযী)।



উক্ত বর্ণনাগুলো প্রমাণ করে যে, পুরুষদের জন্য গেরুয়া ও লাল রং পোষাক চলবে না। কিন্তু লাল রং এর চাদর গায়ে দেয়া যাবে- (মুওয়াত্তা মালিক)। এছাড়াও যে পুরুষ মেয়েদের পোষাক পরে এবং যে নারী পুরুষদের পোষাক পরে রসূলুল্লাহ  তার উপরে অভিসম্পাত দিয়েছেন- (আহমাদ, আবু দাউদ)।

## নামাযের সময়ের বিবরণ

পাকসাক্ষ্য হয়ে ভাল লেবাস পরার পর নামাযের নির্দিষ্ট সময় হলে নামায পড়তে হবে। সেজন্য নামাযের সময়গুলো জানা একান্ত প্রয়োজন। তাই নামাযের সময়ের বিবরণ দেয়া হল।

আল্লাহ বলেন, “নিশ্চয়ই নামায মু'মিনদের উপর নির্দিষ্ট সময়ে ফরয করা হয়েছে।” (সূরা নিসা ১০৩ আয়াত)

'আয়িশা (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ  তাঁর জীবনে মাত্র দু'বার ছাড়া কখনো কোন নামায শেষ ওয়াক্তে পড়েননি। (তিরমিযী, মিশকাত ৬১ পৃঃ)

ইবনে মাস'উদ (রাঃ) বলেন, আমি একদিন নাবী -কে জিজ্ঞেস করলাম, আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় আমল কী? তিনি বললেন, নামায তার নির্দিষ্ট সময়ে পড়া- (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৫৮ পৃঃ)। এজন্যই রসূলুল্লাহ  একদা

‘আলী (রাঃ)-কে বলেছিলেন, হে ‘আলী! তিনটি কাজে মোটেই দেৱী কৰবে না, তা হল : (১) নামাযের সময় যখন হবে [তখনই তা আদায় কৰবে], (২) জানাযা যখন হাযির হবে [তখনই তা দাফন কৰবে], (৩) স্বামী হারা মেয়ের যখনই জুড়ি (স্বামী) পাওয়া যাবে তখনই তার বিয়ে দিয়ে দিবে- (তিরমিযী ২৪ পৃঃ)।

আবু য়ার (রাঃ) বলেন, একদিন রসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন, হে আবু য়ার! যখন তোমাদের উপর এমন শাসক আসবে যারা নির্দিষ্ট ওয়াক্তে নামায না পড়ে দেৱী করে পড়বে, তখন তুমি কী কৰবে? আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আপনিই বলুন, তখন আমি কী কৰব? তিনি বললেন, তখন তুমি নামাযের নির্দিষ্ট সময়ে নামায পড়ে নেবে। তারপর ঐ শাসকদের সাথে যদি তুমি ঐ নামাযকে জামা‘আতে পাও তাহলে আবার তা পড়ে নিও। (তখন এ দ্বিতীয়) নামাযটা তোমার জন্য নফল হয়ে যাবে। (মুসলিম, মিশকাত ৬০-৬১ পৃঃ)

অতএব নামাযের আসল ওয়াক্ত কন্টা তা আমাদের জানা একান্ত দরকার।

## পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : আল্লাহ পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয কৰেছেন। (আবু দাউদ, আহমাদ, মালিক, নাসায়ী, মিশকাত ৫৮ পৃঃ)

তিনি (ﷺ) বলেন, জিবরাঈল (আঃ) কাবা ঘরের কাছে এসে দু’বার আমার নামাযের ইমামতি করেন। সুতরাং তিনি আমাকে যোহরের নামায পড়ালেন যখন সূর্য মাথার উপর থেকে একটু ঢলে যায় এবং তার ছায়াটা জুতোর চামড়ার মত হয়। তারপর তিনি আমাকে আসরের নামায পড়ালেন যখন প্রত্যেক জিনিসের ছায়া তার সমান হয়। তারপর তিনি আমাকে মাগরিবের নামায পড়ালেন যখন রোযাদাররা ইফতার করে (অর্থাৎ সূর্য ডোবার সাথে সাথেই)। তারপর তিনি আমাকে এশা পড়ালেন, যখন “শাফাক” বা সন্ধ্যা বেলায় পশ্চিমাকাশের লাল রং দূর হয়ে যায়। তারপর তিনি আমাকে ফজরের নামায পড়ালেন যখন রোযাদারের উপর ঝাওয়া ও পান করা হারাম হয়ে যায়। অতঃপর যখন দ্বিতীয় দিন এলেন তখন তিনি আমাকে সেই সময় যোহর পড়ালেন যখন তার ছায়া সমান হয় এবং আসর তখন পড়ালেন যখন তার ছায়া দ্বিগুণ হয়। আর মাগরিব পড়ালেন যখন রোযাদার



ইফতার করে এবং এশা তখন পড়ান যখন তিন ভাগের এক ভাগ রাত গত হয়ে যায়। আর ফজর তখন পড়ান যখন ফর্সা হয়ে যায়। তারপর তিনি আমার দিকে মুখ করে বললেন, হে মুহাম্মাদ! এটা আপনার পূর্বের নাবীদের সময় এবং এ দুই ওয়াক্তের মধ্যবর্তী সময়ই হল আসল ওয়াক্ত। (আবু দাউদ, তিরমিযী, মিশকাত ৫৯ পৃঃ)

কেউ কেউ বলেন, ফজরের নামায আদমের, যোহর দাউদের, আসর সলায়মানের, মাগরিব ইয়াকুবের এবং এশা ইউনুস (‘আঃ)-এর ছিল।

অতঃপর ঐ সবগুলোই এই উম্মাতের জন্য একত্রিত করে দেয়া হয়েছে।

(শামী ১ম খণ্ড ৩২৫ পৃঃ)

### ফজরের আউওয়াল অক্ত

ফজরের নামাযের সময় সুবহে সাদিক হতে সূর্য উঠার আগ পর্যন্ত। আনাস (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ “গালাসি” (অর্থাৎ একটু অন্ধকার থাকতে) ফজরের নামায পড়তেন— (বুখারী ও মুসলিম)। এবং ‘আয়িশা (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ ফজরের নামায এমন (অন্ধকার) সময়ে পড়তেন যে, নামাযী মেয়েরা চাদর জড়িয়ে ফেরার সময় অন্ধকারের কারণে তাদেরকে চেনা যেত না— (ঐ, মিশকাত ৬০ পৃঃ)।

আকাশবিদ পণ্ডিতদের অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে, সূর্য ডোবা থেকে সূর্য ওঠা পর্যন্ত সময়টাকে আট ভাগে ভাগ করলে ৮ ভাগের শেষ ও ৮ ভাগের শুরুটা ফজরের আউওয়াল অক্ত। এরূপ চান্দ্রমাসের ১৩ তারিখে চাঁদ ডোবার ও ২৬ তারিখে চাঁদ ওঠার সময়টাও ফজরের আউওয়াল ওয়াক্ত বলে প্রমাণিত হয়। অভিজ্ঞতায় এটাও প্রমাণিত হয়েছে যে, সাধারণতঃ সূর্য ওঠার দেড় ঘণ্টা আগে এবং মৌসুম অনুযায়ী কখনো তারও ১৫-২০ মিনিট আগে পরে সুবহে সাদিক উদ্ভিত হয়, যাকে ফজরের আউওয়াল ওয়াক্ত বলে।

ইমাম তাহাভী হানাফী (রহঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবায়ে কিরাম থেকে বর্ণিত হাদীস মোতাবেক গালাসে ফজরের নামায শুরু করা উচিত এবং এ সফালে (একটু ফর্সা হলে) শেষ করা উচিত। এটাই হল ইমাম আবু হানীফা, ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ (রহঃ) প্রমুখের মত। (শারহে মাআ-নীল আসা-র ১ম খণ্ড ৯০ পৃঃ)

## যোহরের সময়

সূর্য মাথার উপর থেকে পশ্চিমে ঢলে যাওয়ার পর হতে শুরু করে যতক্ষণ পর্যন্ত কোন জিনিসের ছায়া সেই জিনিসের সমান না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত যোহরের সময়- (মুসলিম)। আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ ﷺ গরম কালে ঠাণ্ডা হয়ে দেরী করে যোহর পড়তেন এবং শীতকালে জলদি পড়তেন- (নাসায়ী, মিশকাত ৬২ পৃঃ)।

## আসরের সময়

কোন জিনিসের ছায়া সমপরিমাণ হয়ে যাবার পর ঝিগুণ হতে শুরু করা থেকে সূর্য ডোবা পর্যন্ত আসরের সময়- (মুসলিম)। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, সূর্য যখন হলদে রং হয় এবং শয়তানের দুই শিংয়ের মাঝখানে এসে যায় তখন মুনাফিকরা আসরের নামায পড়ে- (মুসলিম, মিশকাত ৬০ পৃঃ)। সুতরাং সূর্যের আভা একটু হলদে রং হয়ে আসবার পূর্বেই আসর পড়া উচিত।

ইমাম আবু হানীফা থেকেও বর্ণিত যে, আসরের ওয়াক্তের শুরু হল এক ছায়া হতে। ইমাম আবু ইউসুফ, ইমাম মুহাম্মাদ এবং ইমাম যুফার ও অন্য তিনজন ইমামের মতও তাই। হানাফী মুহাদ্দিস ইমাম তাহাভী বলেন, আমরান এটাকে গ্রহণ করি- (তাহাভী ৭৮ পৃঃ)। গুরারুল আকরে এটাই গৃহীত হয়েছে। জিবরাইলের বর্ণনা থেকে এটাই সুস্পষ্ট যে, এ ব্যাপারে এটাই হল সঠিক 'নাস' ও হাদীস- (দুররে মুখতার ১ম খণ্ড ৫৯ পৃঃ)।

ফাতা-ওয়া হাম্বা-দিয়াতে আছে যে, ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদ (রহঃ)-এর ফাতওয়াই হানাফীদের ফাতওয়া। অর্থাৎ যোহরের শেষ সময় ও আসরের শুরু হল এক ছায়া হতে। মূলতাকাল আবহুয়ে আছে, ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) তাঁর উক্ত দুই ছাত্রের এ মতের প্রতি প্রত্যাভর্তন করেছিলেন। মোত্তা আবিদ সিন্ধী বলেন, দুই ছাত্রের ফাতওয়ার প্রতি ইমাম আবু হানীফার মত পাল্টানোর কথা ফাতায়া শামী, কিতাবুল আনীস এবং আল-জওয়াহরুল মুনীর শারহে তানতীরুল আবসার প্রভৃতি গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে। (মাওয়াহিবে লাতীফিয়াহ ২০৪ পৃঃ, যাহরাতো রিয়া-যিল আবরার ৬৫ পৃঃ)

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি আসরের নামায ছেড়ে দেয় তার আমল নষ্ট হয়ে যায়। (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৬০ পৃঃ)

### মাগরিবের সময়

সূর্য ডোবার পর থেকে পশ্চিম আকাশে লাল আভা দূর না হওয়া পর্যন্ত মাগরিবের সময়- (মুসলিম, মিশকাত ৫৯ পৃঃ)। রাফি' ইবনে খুদাইজ বলেন, আমরা রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে নামায পড়তাম। তারপর আমাদের কেউ গিয়ে তীর ছুঁড়লে আমরা তার সেই তীর পড়ার জায়গাটা দেখতে পেতাম- (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৬০ পৃঃ)।

### এশার সময়

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, পশ্চিম আকাশের লাল আভা দূর হবার পর থেকে অর্ধেক রাত পর্যন্ত এশার ওয়াস্ত- (মুসলিম, মিশকাত ৫৯ পৃঃ)। নু'মান ইবনে বাশীর থেকে বর্ণিত যে, চাঁদ উঠে তিন ঘড়ি গত হবার পর রসূলুল্লাহ ﷺ এশার নামায পড়তেন- (আবু দাউদ, মিশকাত ৬১ পৃঃ)।

### কোন কোন সময়ে নামায পড়া নিষেধ

উকবা ইবনে আমির (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে তিন সময়ে নামায পড়তে এবং মাইয়িতের দাফন করতে নিষেধ করেছেন। তা হল : (১) যখন সূর্য উঠতে থাকে এবং যতক্ষণ না সে উপরে উঠে যায়, (২) ঠিক দুপুর বেলায় যতক্ষণ না সূর্য একটু চলে যায়, (৩) সূর্য ডোবার সময় যতক্ষণ না সে ডুবে যায়। (মুসলিম, মিশকাত ৯৪ পৃঃ)

### জুমু'আর দিনে দুপুর বেলা নামায পড়া চলবে না

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নাবী ﷺ সূর্য না ঢলা পর্যন্ত ঠিক দুপুর বেলায় নামায পড়তে মানা করেছেন। কিন্তু জুমু'আর দিনে নয়- (মুসনাদে শাফি'রী, আবু দাউদ, মিশকাত ৯৫ পৃঃ)। এ হাদীস দু'টি যযীফ হলেও ইমাম বায়হাকী এর সমর্থনে কতিপয় যযীফ হাদীস বর্ণনা করেছেন। ঐ সমস্ত যযীফগুলো একত্রিত

হওয়ায় এটি শক্তিশালী হয়— (বায়হাকী ২য় খণ্ড ৪৬৪ পৃঃ ও ৩য় খণ্ড ১৯৩ পৃঃ, মিরআত ২য় খণ্ড ৬০ পৃঃ)। হাকিম ইবনে হাজার আসকালানী বলেন, সা'লাবা ইবনে আবু মালিক থেকে বর্ণিত আছে যে, নাবী ﷺ এর সর্বসাধারণ সাহাবীগণ জুমু'আর দিনে দুপুরে নামায পড়তেন— (তালখীসুল হাবীর ৭০ পৃঃ)।

অতএব উক্ত যয়ীফ হাদীসগুলো আমলের অবোধ্য নয়। আবু যার (রাঃ) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, ফজরের পর সূর্য উঠা পর্যন্ত এবং আসরের পর সূর্য ডোবা পর্যন্ত কোন নামায নেই। তবে মক্কা ছাড়া, মক্কা ছাড়া, মক্কা ছাড়া। (আহমাদ, মিশকাত ৯৫ পৃঃ)

## কাবা শরীফে কোন সময়েই নামায মানা নেই





আব্বাহুর রসূল ﷺ বলেন, হে মানাফ বংশ! তোমরা দিন ও রাতের কোন সময়েই কোন ব্যক্তিকে কাবা ঘরের তাওয়াফ করতে ও নামায পড়তে মানা কর না— (তিরমিযী, বুল্গল মারাম ১৩ পৃঃ, দারাকুতনী ১ম খণ্ড ১৬৩ পৃঃ, বায়হাকী ২য় খণ্ড ৪৬১ পৃঃ)। এ হাদীস প্রমাণ করে যে, কাবা শরীফে কোন সময়েই ইবাদত মানা নেই।

## ওযর থাকলে সূর্যোদয় এবং অস্তের সময়ও নামায চলবে

নাবী ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি সূর্য ওঠার আগে ফজরের এক রাক'আত নামায পায় সে ফজরের নামায পেয়ে গেল এবং যে ব্যক্তি সূর্য ডোবার আগে আসরের নামায মাত্র এক রাক'আত পড়তে পায় সে আসরের নামায পেয়ে গেল। (বুখারী, মুসলিম, বুল্গল মারাম ১৩ পৃঃ)


এ হাদীস প্রমাণ করে যে, কোন বৈধ কারণে কোন ব্যক্তি যদি এমন সময় নামায শুরু করে যে, সূর্য ডোবার আগে সে মাত্র এক রাক'আত নামায পড়তে পেল এবং সূর্য ডোবার পর বাকি তিন রাক'আত নামায পড়ল তার আসরের নামায আদায় হয়ে গেল। এক্ষণে কোন ব্যক্তি ফজরের নামায এমন সময় শুরু করল যে, সূর্য উঠার আগে সে এক রাক'আত পেল এবং দ্বিতীয় রাক'আতটি সূর্য ওঠার পরে পড়ল তার ফজরের নামাযও আদায় হয়ে গেল। এ হাদীস প্রমাণ করে যে, ওযর থাকলে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময় নামায পড়তে মানা নেই।

## ফজরের ফরযের পর সুন্নাত পড়তে মানা নেই

মুহাম্মাদ ইবনে ইব্রাহীম কায়স ইবনে 'আমির থেকে বর্ণনা করেন যে, একদা আব্বাহর নাবী  দেখতে পেলেন যে, একজন লোক ফজরের ফরযের পর দুই রাক'আত নামায পড়ছে। ফলে তিনি বললেন, ফজরের নামায তো দুই রাক'আত। লোকটি তখন বললো, হুজুর! এটা ফজরের ফরযের আগের দুই রাক'আত সুন্নাত নামায, যা আমার আগে পড়া হয়নি তাই এখন পড়লাম। জওয়াব শুনে রসূলুল্লাহ  চুপ হয়ে গেলেন— (আবু দাউদ, তিরমিযী, মিশকাত ৯৫ পৃঃ)। ইবনে 'উমর (রাঃ)-এর গোলাম ইয়াসার বলেন, একদা ফজর উদয় হওয়ার পর আমাকে নামায পড়তে দেখে ইবনে 'উমর (রাঃ) বললেন, একবার রসূলুল্লাহ  আমাদের কাছে এলেন তখন আমরা ঠিক এ সময়েই নামায পড়ছিলাম। অতঃপর নাবী  বললেন, তোমরা উপস্থিত ব্যক্তি অনুপস্থিত লোকদেরকে এ কথা বলে দিও যে, ফজরের পরে কোন নামায নেই, কিন্তু দুই রাক'আত নামায আছে— (আহমাদ, আবু দাউদ)।

ইমাম শওকানী বলেন, এ হাদীসটি তিরমিযী ও দারাকুতনীতেও আছে। ইমাম তিরমিযী এ হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন, সমস্ত আহলে 'ইলম বা বিদ্বানরা এ বিষয়ে একমত যে, ফজরের পর দুই রাক'আত সুন্নাত ছাড়া অন্য (নফল) নামায পড়া মকরুহ। (নায়লুল আওতার ২য় খণ্ড ৩৩৮ পৃঃ)

উল্লিখিত হাদীসগুলো দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কেউ যদি ফজরের জামা'আতে শরীক হওয়ার ফলে সুন্নাত পড়ার সময় না পায় তাহলে সে জামা'আতের পরেই তা পড়ে নেবে। সূর্য ওঠার পর তাকে তা কাযা করতে হবে না। কিংবা জামা'আত চলাকালীন জামা'আতে শরীক না হয়ে তাড়াতাড়ি চুবচাব করে দু'রাক'আত সুন্নাত পড়ে জামা'আত ধরতে হবে না।

ইবনে 'আব্বাস বলেন, একদা আমি নামায পড়ছিলাম। এমতাবস্থায় মুআযযিন ইকামত দিতে শুরু করলেন। তখন রসূলুল্লাহ  আমায় টেনে ধরে বলেন, ফজরের নামায কি চার রাক'আত পড়ছ? (বায়হাকী, তাবারানী, আবু দাউদ তায়ালীসী, আবু ইয়ালা, হাকিম ১ম খণ্ড ৩০৭ পৃঃ)। অন্য এক হাদীসে আছে, যখন কোন নামাযের জন্য ইকামত দেয়া হয় তখন ফরয নামায ছাড়া অন্য কোন (সুন্নাত

বা নফল) নামায হবে না- (আহমাদ, মুসলিম ও সুনান গ্রন্থাবলী, ফিকহুস সুন্নাহ ১ম খণ্ড ১০৯ পৃঃ)। সুতরাং ফজরের জামা'আত দাঁড়িয়ে গেলে আর সুন্নাত পড়া যাবে না। যারা পড়ে আল্লাহ তাদের সুমতি দিন- আমীন।

অন্য বর্ণনায় আছে, কেউ বলেন, হে আল্লাহর রসূল ﷺ! ফজরের দু'রাক'আত (সুন্নাতও) নয়? তিনি বললেন, না। ফজরের দু'রাক'আত সুন্নাতও নয়। (আলকা-মিল লি ইবনে আদী)।

## আযানের বিবরণ

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, নামাযের অঙ্ক হলে তোমাদের কেউ আযান দেবে- (বুখারী, মুসলিম)। কারণ শয়তান নামাযের আযান শুনে ৩৬ মাইল দূরে পালায়- (মুসলিম, মিশকাত ৩৬ পৃঃ)। সুতরাং এখন আযানের কথা আলোচনা করা যাক।

মহানাবী ﷺ-এর মক্কায় তের বছর থাকা কালে আযানের প্রচলন হয়নি। কিন্তু যখন তিনি মদীনায় হিজরত করে এসে একটি মাসজিদ তৈরী করেন তখন নামাযের সময় জানান দেবার জন্য সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করেন। ফলে কেউ বললেন, একটি উঁচু জায়গায় আশুন জ্বালানো হোক। কেউ বললেন শাক ও বিউগল বাজানো হোক। অন্যান্য সাহাবীরা বললেন, আশুন ও বিউগল ইয়াহুদী এবং খৃষ্টানদের রীতি। সুতরাং এ কাজ করলে তাদের ও আমাদের ওয়াক্তের সাথে গোলমাল সৃষ্টি হবে। অতঃপর সেই রাতে 'আব্দুল্লাহ ইবনে যায়দ (রাঃ) স্বপ্নে দেখলেন যে, একজন লোক নামাযের জন্য এভাবে চেপ্পাচ্ছে 'আল্লাহ আকবর' 'আল্লাহ আকবর'..... 'লা- ইলাহা- ইল্লাল্লাহ'। পরদিন সকালে তিনি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে এ স্বপ্নের কথা বললেন। তিনি তখন বললেন, এটা নিশ্চয়ই সত্য স্বপ্ন।

অতএব তুমি যাও এবং বিলালের সঙ্গে আযান দাও। কারণ তোমার চেয়ে তার আওয়াজের জোর বেশী। অতঃপর তারা দু'জন যখন আযান দিলেন তখন 'উমর (রাঃ) এ আযান শুনে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে ছুটে এলেন এবং বললেন, যিনি আপনাকে সত্য নাবী করে পাঠিয়েছেন তার কসম! আমিও ঐ স্বপ্ন দেখেছি যা সে বলেছে। তখন নাবী ﷺ বললেন, ফালিহা হিহি হাম্দ অর্থাৎ আল্লাহরই সমস্ত প্রশংসা- (আবু দাউদ, দারিমী, ইবনে মাজাহ, মিশকাত ৬৪ পৃঃ)। একটি বর্ণনায়

পাওয়া যায় যে, ঐ রাতে নাকি ১১ জন সাহাবী আযানের স্বপ্ন দেখেছিলেন—  
(মিরকাত ১ম খণ্ড ৪১৫ পৃঃ)।

কাসীর ইবনে মুররাহ বলেন, জিবরাঈল ('আঃ) আসমানে আযান দিয়েছিলেন যা 'উমর ইবনে খাত্তাব (স্বপ্নে) শুনেছিলেন— (মাবসূত ১ম খণ্ড ১৮২ পৃঃ)। হাফিয় ইবনে হাজ্জার আসকালানী বলেন, এ হাদীসের সূত্র একেবারে বাজে। এছাড়াও আরো দু'টি অত্যন্ত দুর্বল হাদীসে আছে যে, ইব্রাহীম ('আঃ)-এর আযান থেকে এ আযান গ্রহণ করা হয়েছে (আবুশ শায়খ)। অন্য বর্ণনায় আছে যে, আদম ('আঃ)-কে যখন জান্নাত থেকে নামিয়ে দেয়া হয় তখন জিবরাইল ('আঃ) তার জন্য আযান দিয়েছিলেন— (আবু নুআইম, ফাতহুল বারী ২য় খণ্ড ৭৮-৭৯ পৃঃ)।

### আযানের নিয়ম

আবু মাহযুরা (রাঃ) বলেন : আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আপনি আমাকে আযানের নিয়ম শিখিয়ে দিন। তখন নাবী ﷺ কপালে হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন, বল—

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ - اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ -

আল্লাহ্ আকবর (৪ বার) তারপর আন্তে আন্তে বলবে।

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ - أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ - أَشْهَدُ أَنْ  
مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ - أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ -

“আশহাদু আল্লা- ইলা-হা ইল্লাল্লাহ” (২ বার) এবং “আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রসূলুল্লাহ” (২ বার)। তারপর আবার জোরে চিৎকার করে বলবে, “আশহাদু আল্লা- ইলা-হা ইল্লাল্লাহ” (২বার) এবং “আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রসূলুল্লাহ” (২বার) তারপর বলবে,

حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ - حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ ، حَيَّ  
عَلَى الْفَلَاحِ - اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ - لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ - اَلصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ

النَّوْمِ - اَلصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ .

“হাইয়া ‘আলাস সলা-হ’ (২বার) এবং “হাইয়া ‘আলাল ফালাহ’ (২বার) যদি ফজরের আযান হয় তাহলে এর পরে বলবে, “আস্‌সলা-তু খায়রুম্ব মিনান নাওম” (২বার) তারপর বলবে, “আল্লাহ্‌ আকবর” (২ বার) তারপর “লা- ইলা-হা ইল্লাল্লাহ্‌” (১বার)। (মুসলিম, আবু দাউদ, মিশকাত ৬৩ পৃঃ)

আযানের তর্জমা : আল্লাহ সবচেয়ে বড় (৪ বার), আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ্‌ ছাড়া আর কেউ ইবাদতের যোগ্য নেই (২ বার), আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর রসূল (২ বার), নামাযের জন্য এসো (২ বার), মুক্তির জন্য এসো (২ বার), ঘুমের চেয়ে নামায উত্তম (২ বার কেবল ফযরের আযানে)। আল্লাহ সবচেয়ে বড় আল্লাহ্‌ ছাড়া আর কেউ উপাস্য নেই। (মুসলিম, আবু দাউদ, মিশকাত ৬৩ পৃঃ)

হানাফী ফিক্‌হ গ্রন্থ কুদুরীর ব্যাখ্যাকার আল্লামা আবু বাকর ইবনে মুহাম্মাদ আল-হাদ্দাদ ইয়ামানী হানাফী (রহঃ) বলেন, ফারসী ভাষায় আযান দিলেও তা চলবে যখন এটা জানা যাবে যে, ওটা আযান- (আল্‌জ ওহরাতুন নাইয়িরাহ্‌ ৪২ পৃঃ)। কিন্তু মুসলমানদের অন্য সবার মতে আরবী ছাড়া অন্য কোন ভাষাতেই আযান চলবে না।

## আযানের জওয়াব

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন যে, যে ব্যক্তি খালসে দেলে আযানের জওয়াব দেবে তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব ও অপরিহার্য হয়ে যায় (নাসায়ী, মিশকাত ৬৬ পৃঃ)। তাই তিনি (ﷺ) বলেন, তখন তোমরা তাই বলবে, সে যা বলে। তারপর আমার উপর দরুদ পাঠ করবে। কারণ আমার উপর যে একবার দরুদ পড়ে আল্লাহ তার উপরে দশবার রহমত বর্ষণ করেন- (মুসলিম, মিশকাত ৬৪ পৃঃ)।

তিনি বলেন, মুআযযিন যখন “হাইয়া ‘আলাস্‌ সলা-হ’ ও “হাইয়া ‘আলাল ফালা-হ’ বলবে তখন তোমরা “লা- হাওলা- ওয়ালা কুওওয়াতা ইল্লা- বিল্লাহ্‌” বলবে। (মুসলিম, মিশকাত ৪৬ পৃঃ)

নোট : ফজরের আযানে “আস্‌সলাতু খায়রুম্ব মিনান নাওম” এর জওয়াবে ঐ শব্দগুলোই বলতে হবে। কারণ ওর জওয়াবে “সাদাক্তা ওয়াবারারতা” বলার কোন



প্রমাণ সহীহ হাদীসে পাওয়া যায় না। হাফিয ইবনে হাজার আসকালানী বলেন, এ ব্যাপারে স্পষ্ট রিওয়ায়াত হল নাসায়ীর রিওয়ায়াকৃত উম্মে হাবীবাহ বর্ণিত হাদীস। যাতে আছে যে, নাবী ﷺ তাই বলতেন মুআয্বিন যা বলতো- (মিরকাত ১ম খণ্ড ৪৩৬)। এ রিওয়ায়াত প্রমাণ করে যে, রসূলুল্লাহ ﷺ নিজেও “আস্‌সালা-তু খায়রুম মিনান নাওম”-এর জওয়াবে ঐ শব্দগুলোই বলতেন, অন্য শব্দ নয়।

## আযানের দু’আ

আযানের পর দরুদ পড়ার কথা উপরের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং দরুদ এই-

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ  
وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ  
مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ.

বাংলা উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা সল্লি ‘আলা- মুহাম্মাদিও ওয়া‘আলা- আ-লি মুহাম্মাদিন কামা সল্লাইতা ‘আলা- ইব্রাহীমা ওয়া‘আলা- আ-লি ইব্রাহীমা ইন্নাকা হামীদুম্ মাজীদ। আল্লা-হুম্মা বারি-ক ‘আলা- মুহাম্মাদিও ওয়া‘আলা- আ-লি মুহাম্মাদিন কামা বা-রাকতা ‘আলা- ইব্রাহীম ওয়া‘আলা- আ-লি ইব্রাহীমা ইন্নাকা হামীদুম্ মাজীদ। (বুখারী, মিশকাত ৮৬ পৃঃ)

তরজমা : হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মাদ ও মুহাম্মাদের পরিবারবর্গের উপর রহমত বর্ষণ কর যেমন তুমি ইব্রাহীম ও ইব্রাহীমের পরিবারের উপর রহমত করুণা করেছিলে। নিশ্চয় তুমি প্রশংসনীয় ও সম্মানীয়। হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মাদ ও মুহাম্মাদের বংশধরদের উপর বরকত নাযিল কর যেমন তুমি ইব্রাহীমের বংশধরদের উপর বরকত নাযিল করেছিলে। নিশ্চয়ই তুমি প্রশংসনীয় ও সম্মানীয়।

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, তারপর (অর্থাৎ দরুদ পাঠের পর) তোমরা আমার জন্য আল্লাহর কাছে ওয়াসীলাহ চাও। কারণ যে ব্যক্তি আমার জন্য ওয়াসীলাহ চায় তার জন্য আমার শাফাআত হালাল হয়ে যায়। (মুসলিম, মিশকাত ৬৫ পৃঃ)

## অসীলাহর দু'আ

জাবির (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আযান শুনে যে ব্যক্তি এ দু'আ পড়ে, তার জন্য আমার শাফাআত হালাল হয়ে যায়। (বুখারী, মিশকাত ৬৫ পৃঃ)

দু'আটি এ :

اَللّٰهُمَّ رَبِّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلٰوةِ الْقَائِمَةِ اَنْتَ مُحَمَّدَنْ الْوَسِيْلَةَ  
وَالْفَضِيْلَةَ وَاَبْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا الَّذِي وَعَدْتَهُ اِنَّكَ لَا تَخْلِفُ الْمِيْعَادَ.

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা রব্বা হা-যিহিদ দা'ওয়াতিত্ তা-ম্মাতি ওয়াসসালা-তিল  
ক্বা-য়িম্মাতি আ-তি মুহাম্মাদানিল ওয়াসীলাতা ওয়ালফাযীলাতা ওয়াব-'আসহ  
মাক্বা-মাম্ মাহমূদা নিল্লাযী ওয়া'আদতাহ ইন্নাকা লা- তুখলিফুল মী'আ-দ।

বায়হাকীর রিওয়ায়াতে “ওয়াআদতাহর” পর “ইন্নাকা লা-তুখলিফুল মী'আ-দ”  
শব্দ কয়টি বাড়তি আছে। (বায়হাকী খণ্ড ৪১০ পৃঃ, ফাতহুল বারী ২য় ৯৫ পৃঃ)

তরজমা : এসব পরিপূর্ণ দু'আ ও প্রতিষ্ঠিত নামাযের প্রভু হে আল্লাহ! মুহাম্মাদ  
ﷺ-কে জান্নাতের ওয়াসীলা নামক মনযিলটি ও সম্মান দান কর এবং তুমি তাকে  
সেই মাকামে মাহমূদ বা প্রশংসিত জায়গায় পৌছে দিও যা তাকে দেবার জন্য তুমি  
ওয়াদা করেছ। নিশ্চয় তুমি ওয়াদা খেলাফ কর না।

## আযানের দু'আতে মনগড়া শব্দ

মুসলমানদের মধ্যে একদল লোকের মজ্জাগত স্বভাব হল নাবীর হাদীসের  
শব্দের মধ্যে কিছু আলিমদের মনগড়া শব্দ ঢুকিয়ে দিয়ে বিদআত সৃষ্টি করা এবং  
হাদীস বিকৃত করা। এ স্বভাব অনুযায়ী আমার কিছু ভাই উপরে লিখিত আযানে  
সুন্নাতী দু'আতে “ওয়াসীলার” পর “ওয়াদদারাজাতার রাফী'আতা” এবং  
“ওয়াদতাহর” পর “ওয়ারযুকনা শাফাআতাহ ইয়াওমাল কিয়ামাতি” ও সবশেষে  
“ইয়া আরহামা রাহীমীন” শব্দগুলো বাড়িয়ে দিয়েছেন এবং নাবী ﷺ এর  
হাদীসকে বিকৃত করেছেন। ঐ শব্দগুলো রসূলুল্লাহ ﷺ-এর কোন হাদীসেই  
পাওয়া যায় না।

যেমন হাফিয় ইবনে হাজ্জার আসকালানী ও আল্লামা মোল্লা আলী কারী হানাফী বলেন, “অদদারাজাতার রাফীআত এবং ইয়া আরহামার রাহিমীন” শব্দগুলোর কোন প্রমাণই নেই— (তালখীসুল হাবীর ১ম খণ্ড ৭৮ পৃঃ, মিরকাত ১ম খণ্ড ৪২৫ পৃঃ, মওযুআতে কাবীর ৩৮ পৃঃ, শামী ১ম খণ্ড ৩৭০ পৃঃ)। দেওবন্দের প্রতিভাশালী মুদাররিস মওলানা ইজ্জায় আলী (রহঃ) আল্লামা সাখাবীর বরাত দিয়ে বলেন, ঐ শব্দগুলো কোন হাদীসেই পাওয়া যায় না— (শরহে নিকায়াহ ১ম খণ্ড ৬২ পৃষ্ঠার ১নং টীকা, আলমাকা-দিলু হাসানাহ ২১২ পৃঃ)।

হায়দারাবাদ থেকে প্রকাশিত ইবনে সুন্নীর আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লাইলার ২৭ পৃষ্ঠায় “অদদারাজাতার রাফীআত” শব্দ দু’টি পাওয়া যায়। এ ব্যাপারে এক হানাফী আলিম মাওলানা আব্দুল্লাহ দেহলভী বলেন, এটা মনে হয় মুদ্রক ও প্রকাশক কিংবা সংশোধকের ভুল। কারণ, ইবনে সুন্নী এ হাদীসটি তার ওস্তাদ ইমাম নাসায়ী থেকে বর্ণনা করেছেন। অথচ নাসায়ীতে ঐ শব্দ দু’টি নেই। আর ইমাম সাখাবীর সামনে ইবনে সুন্নীর ঐ বই ছিল যাতে উক্ত শব্দ দু’টি ছিল না— (ইস্তিখাবুত তারগীব ওয়াত্‌তারহীব ১ম খণ্ড, ৩৭৯ পৃঃ ১নং টীকা)। সুতরাং হায়দারাবাদের প্রকাশিত উক্ত শব্দ দু’টি বিকৃত।

হাদীস বিকৃতি সম্পর্কে মহানবী ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি (আমি যা বলিনি তা বলে) আমার নামে ইচ্ছাকৃত মিথ্যা বলে সে তার ঠিকানা জাহান্নামে করে নিক— (বুখারী, মিশকাত ৩২ পৃঃ)। শুধু তাই নয় সহীহুল বুখারীতে অযূর অধ্যায়ে আছে যে, রসূলুল্লাহ ﷺ রাতে অযূ অবস্থায় শুয়ে শুয়ে পড়বার জন্য একটি দু’আ একজনকে শেখান এবং ঐ হাদীসটির রাবী বারা ইবনে আযিব দু’আটি পড়ে নাবীজিকে যখন শোনান তখন তিনি একটি শব্দ “বি-নাবিইয়িকা” এর জায়গায় বি-রসূলিকা পড়েন। ফলে প্রিয়নবী ﷺ রেগে যান এবং বলেন, আমার শেখানো শব্দ “বি-নাবিইয়িকা” বল, বিরসূলিকা নয়— (বুখারী ১ম খণ্ড ৩৮ পৃঃ)। অন্য হাদীসে আছে, নাবী ﷺ তাঁর হাত দিয়ে সাহাবীর বুকে খোঁচা মেরে বলেন, বল বি-নাবিইয়িকা— (তিরমিযী ২য় খণ্ড ১৭৫ পৃঃ)।

প্রিয় পাঠক! দেখছেন, যিনি নাবীর জায়গায় রসূল শব্দ শুনে ভীষণ রেগে ওঠেন তিনি আমার ঐ বিদআতী ভাইদের বানোয়াট ও বাড়তি শব্দ শুনে খুশী কি হবেন? না, তাদেরকে কিয়ামতের মাঠে দূর হও দূর হও বলে তাড়িয়ে দেবেন তা

সবাই সহজেই বুঝতে পারছেন। হে আল্লাহ! সুল্লাতের ধ্বজাধারীর নামে হাদীস জালকারীদের হিদায়াত দাও-আমীন।

## আযানের অন্য দু'আ

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি আযান শোনার পর এ কথাগুলো বলবে তার গুনাহ মাফ হয়ে যায়। (মুসলিম, মিশকাত ৬৫ পৃঃ)

কথাগুলো এই-

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ  
وَسُوَّلُهُ رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُوْلًا وَبِالْإِسْلَامِ دِيْنًا.

উচ্চারণ : আশহাদু আল্লা- ইলা-হা ইল্লাল্লাহ-হু ওয়াহদাহু লা- শারীকু লাহু  
ওয়াআশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুলহু ওয়ারাসূলুহ \* রাযীতু বিল্লাহি রাব-বান ওয়াবি  
মুহাম্মাদির রসূলান ওয়াবিল ইসলাম-মি দীনান।

তরজমা : আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কেউ উপাস্য  
নেই, তাঁর শরীকও নেই এবং সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর দাস ও প্রেরিত  
পুরুষ। আমি প্রভু হিসাবে আল্লাহকে এবং রসূল হিসেবে মুহাম্মাদ ﷺ-কে ও ধর্ম  
হিসেবে ইসলামকে নিয়ে সন্তুষ্ট।

নোট : আযানের পর দু'আগুলো পড়ার সময় দুই হাত তোলার কথা কোন  
সহীহ বা যযীফ হাদীসেও পাওয়া যায় না। সুতরাং এটা মনগড়া কাজ। তাই হাত না  
তুলে শুধু মুখে মুখে ঐ দু'আগুলো পড়তে হবে।

## তারজী আযান

আযানে “আশহাদু আল্লা- ইলা-হা ইল্লাল্লাহ ওয়াআশহাদু আন্না মুহাম্মাদার  
রসূলুল্লাহ” প্রথমে আস্তে আস্তে দু'বার বলে তারপরে উচ্চৈঃস্বরে দু'বার বলার নাম  
তারজী আযান- (মুসলিম, আবু দাউদ, মিশকাত ৬৩ পৃঃ)। তারজী ছাড়াও আযান  
দেয়ার হাদীস আছে। তাই তিন মাযহাবগন্থী ও আহলে হাদীসরা তারজী  
আযানওয়ালা হাদীসের উপর আমল করে। দ্বিতীয় আবু হানীফা আল্লামা যায়নুদ্দীন

ইবনে নুজাইম বলেন, হানাফী মতে তারজী আযান মুবাহ, মাকরুহ বা আপত্তিকর নয়- (আলবাহরর রা-য়িক ১ম খণ্ড ২৫৬ পৃঃ)।

## আযানের অন্যান্য নিয়মাবলী

রসূলুল্লাহ ﷺ বিলালকে আযান দেবার সময় তাঁর দুই কানে আব্দুল রাখবার আদেশ দিয়েছিলেন- (ইবনে মাজাহ, মিশকাত ৬৪ পৃঃ)। আবু জুহায়ফা বলেন, আমি বিলালকে আযান দিতে দেখলাম। তিনি যখন “হাইয়া ‘আলাস সলাহ” ও “হাইয়া ‘আলাল ফালাহ”-তে পৌঁছিলেন তখন ডানদিকে ও বামদিকে মুখ ঘোরালেন। কিন্তু তিনি নিজে ঘুরলেন না- (আবু দাউদ ১ম খণ্ড ৭৭ পৃঃ)। নাবী ﷺ বিলালকে বলেন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আযান দাও- (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৬৪ পৃঃ)। তবে ওয়র থাকলে বসে বসেও আযান দেয়া যাবে। যেমন রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবী আবু যায়দ জিহাদে পায়ে চোট পাবার পর বসে বসে আযান দিতেন- (আস্রম, আলমুগনী ১ম খণ্ড ৪২৪ পৃঃ)।

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আমার ইচ্ছা হয় যে, লোকদেরকে হুকুম দিই তারা যেন উঁচু টিবিতে দাঁড়িয়ে আযান দেয়- (আবু দাউদ ১ম খণ্ড ৭৪ পৃঃ)। তাই এক সাহাবী আবু বারযাহ আসলামী বলেন, সুনাত হল মিনারে আযান দেয়া এবং মাসজিদে ইকামত দেয়া (আবুশ শায়খ)। রসূলুল্লাহ ﷺ-এর মুআযযিন ইবনে উম্মে মাকতুম ঘরের উপরে আযান দিতেন- (এ নাসবুর রায়াহ ১ম খণ্ড ২৯২-২৯৩ পৃঃ)।

আওয়ালিলে সুযুতীতে আছে, সর্বপ্রথম যিনি মিসরের মিনারে আযানের জন্য চড়েন তিনি হলেন গুরাহবীল ইবনে আমির আল-মুরাদী। মুআবিয়ার হুকুমে আযানের জন্য মিনার তৈরী করা হয়। এর আগে মিনার ছিল না। (শামী ১ম খণ্ড, ৩৬০ পৃঃ)

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, অযু করে আযান দিবে। আযান দিবে ধীরে ধীরে এবং ইকামত দিবে তাড়াতাড়ি। যে আযান দেবে সেই ইকামত দেবে- (তিরমিযী)। হাফিয ইবনে হাজার আসকালানী বলেন, এ তিনটি হাদীসই যয়ীফ- (বুলুগুল মারাম ১৫ পৃঃ)।

## হাইয়া 'আলাস সলাহ ও ফালাহ বলার নিয়ম

আল্লামা কাফ্ফাল মারআযী বলেন, “হাইয়া ‘আলাস সলা-হ” একবার ডানে ও একবার বামে এবং “হাইয়া ‘আলাল ফালাহ” একবার ডানে ও একবার বামে বলতে হবে- (রওযাতুত্ তলবীন ১ম খণ্ড ২০০ পৃঃ)। কাহাস্তানীতে আছে, মার্ভের শায়েখগণ বলেন, সলাহ ও ফালাহ প্রত্যেকটাই একবার ডানে ও একবার বামে বলতে হবে- (শামী ১ম খণ্ড ৩৬০ পৃঃ)।

উক্ত মতটির প্রমাণে কোন হাদীস নেই। সুতরাং ঐ মত ভিত্তিহীন। এর বিপরীত মুসনাদে ইমাম ইসহাক ইবনে রাহুওয়্যের একটি হাদীসে পরিষ্কার আছে, ‘আব্দুল্লাহ ইবনে যায়দ (স্বপ্নে) যাঁকে আযান দিতে দেখেন তিনি ডান দিকে দু’বার “হাইয়া ‘আলাস সলাহ” এবং বামদিকে দু’বার “হাইয়া ‘আলাল ফালাহ” বলেন- (শারহে নিকায়াহ ১ম খণ্ড ৬১ পৃঃ)। তেমনি বিলালও যখন আযান দিতেন তখন কেবলার ডানদিকে দু’বার “হাইয়া ‘আলাস সলাহ” এবং কিবলার বামদিকে ফিরে দু’বার “হাইয়া ‘আলাল ফালাহ” বলেন- (মুসতাদরাকে হাকিম ৩য় খণ্ড ৬০৭ পৃঃ নাসবুর রায়াহ ১ম খণ্ড ২৭৬ পৃঃ)।

## রসূলুল্লাহ ﷺ এর নাম শুনে নখে ও

### আঙ্গুলে চুমু খাওয়া বিদআত

দায়লামীর মুসনাদে আহমাদে আছে, নাবী ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি মুআযযিনের এ বাক্যে “আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রসূলুল্লাহ ﷺ” শুনে ঐ শব্দগুলো বলে এবং দুই হাতের তর্জনি-আঙ্গুলদ্বয়ের ভেতরের অংশ চুমু খেয়ে তা চোখে ছোঁয়ায় তার জন্য আমার শাফাআত হালাল হয়ে যায়।

আবুল আব্বাস ইয়ামানী সুফী তদীয় ‘মুজিবাতুর রহমান ওয়াআযায়িমুল মাগফিরাহ’ গ্রন্থে খিযির (‘আঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, যে ব্যক্তি মুআযযিনের মুখে উপরোক্ত বাক্যটি শুনে বলে-মারহাবাম বিহাবীবী অকুর্রাতে আইনী মুহাম্মাদ ইবনে আব্দিল্লাহ তারপর সে তার বুড়ো আঙ্গুল দু’টো চুমু খায় এবং ঐ দু’টো চোখে ঠেকায় সে অন্ধ হবে না এবং তার চোখও উঠবে না।

উক্ত হাদীস দু'টো সম্পর্কে জাল হাদীসের নাড়িবিদ আল্লামা সাখাতী বলেন, দু'টো হাদীসই সহীহ নয় এবং ওর কোনটিরও সনদ রসূলুল্লাহ ﷺ পর্যন্ত পৌছায় না- (ফিকহুস সুন্নাহ ১ম খণ্ড ১২১ পৃঃ)। আল্লামা শামী বলেন, কাহাত্তানী লিখেছেন, ঐ ব্যাপারটা আযানের সাথে বিশেষিত। বহু খোজাখুজির পরও একামতের সাথে ওর কোন সম্পর্ক পাওয়া যায় না- (রদ্দে মুহতার ১ম খণ্ড ৩৭০ পৃঃ)। মাওলানা আব্দুল হাই লাক্কৌতী হানাকী বলেন, আযান ও ইকামতের সময় এবং যখনই নাবী ﷺ-এর নাম শোনা যায় তখনই দুই নখে চুমু খাওয়া কোন হাদীসে অথবা সাহাবীদের আসারে প্রমাণ পাওয়া যায় না। যে এ কথা বলে সে ডাছা মিথ্যুক। এ কাজ জঘন্য বিদআত- (সিআ-য়াহ ২য় খণ্ড, যাহরাতু রিয়াযিল আবরার ৭৬ পৃঃ)

### মুআয্যিনের গুণাবলী ও আযান দেয়ার ফযীলত

রসূলুল্লাহ ﷺ-এর মুআয্যিন আবু মাহযুরাহ (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ ২০ জন লোককে আযান দেয়ান। তাদের মধ্যে আমার স্বরটা তাঁর কাছে সবচেয়ে পছন্দনীয় হয়। ফলে তিনি আমাকে আযান শিখিয়ে দেন। (ইবনে খুযায়মা ১ম খণ্ড ১৯৫ পৃঃ)

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, মুআয্যিন এমন লোককে কর, যে ব্যক্তি আযান দিয়ে মজুরী নেয় না- (আহমাদ, আবু দাউদ, নাসায়ী, মিশকাত ৬৫ পৃঃ)। কিন্তু একদা নাবী ﷺ তাঁর মুআয্যিন আবু মাহযুরাকে আযান দেবার পর তাঁকে একটি ধলে দান করেন, যাতে কিছু চাঁদি ছিল- (বায়হাকী ১ম খণ্ড ৪৩০ পৃঃ)। অন্য হাদীসে আছে যে, খলীফা 'উসমান (রাযিঃ) মুআয্যিনের জীবিকার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন- (ঐ ৪২৯ পৃঃ, আঃ রায্যাক ১ম খণ্ড ৪৮৩ পৃঃ)।

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, মুআয্যিনের আযানের শব্দ যতদূর পৌছায় তার মধ্যবর্তী প্রত্যেক জিন ও ইনসান এবং প্রত্যেক জিনিস তার সাক্ষ্য দেয়- (বুখারী, মিশকাত ৬৪ পৃঃ)। নাবী ﷺ বলেন, মুআয্যিনের আযান শুনে যত নামাযী নামায পড়বে তত নেকী ঐ মুআয্যিন পাবে- (নাসায়ী)। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি সাওয়াবের আশায় ৬ বছর আযান দেয় তার জন্য জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি সনদ লিখে দেয়া হয়- (তিরমিযী, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ)। তিনি বলেন, যে

ব্যক্তি ১২ বছর আযান দেয় তার জন্য বেহেশত ওয়াজিব ও অপরিহার্য হয়ে যায় এবং আযানের জন্য ৬০টি ও ইকামতের জন্য ৩০টি করে নেকী তার নামে লেখা হয়— (ইবনে মাজ্জাহ, মিশকাত ৬৫-৬৬)।

মুআযযিনের মাথার উপরে রহমানের (করুণাময়ের) হাত থাকে। তিনি তার গোনাই মাফ করে দেন, যতদূর তার আওয়াজ পৌছায়। অন্য একটি যয়ীফ হাদীসে আছে, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যে সম্প্রদায়ের মধ্যে সকালে আযান দেয়া হয় তারা সন্ধ্যা পর্যন্ত আল্লাহর নিরাপত্তায় থাকে এবং যে সম্প্রদায়ের মধ্যে সন্ধ্যায় আযান দেয়া হয় তারা সকাল পর্যন্ত আল্লাহর নিরাপত্তায় থাকে। (তাবারানী, কাবীর, মাজমাউয যাওয়ায়িদ ১ম খণ্ড ৩২৮ পৃঃ)

## সাহরী-সফর ও বালা-মুসীবতের আযান

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, রাতে বিলাল (সাহরীর) আযান দেয়। সুতরাং তোমরা যতক্ষণ ইবনে উম্মে মাকতূমের (ফজরের) আযান শুনতে না পাও ততক্ষণ পর্যন্ত খাওয়া দাওয়া কর। (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৬৬ পৃঃ)

মালিক ইবনে হুওয়ারিস (রাঃ) বলেন, একদা আমি ও আমার চাচাতো ভাই নাবী ﷺ-এর কাছে এলাম। তিনি বললেন, যখন তোমরা দু'জন সফর করবে তখন আযান দেবে, ইকামত দেবে এবং তোমাদের মধ্যে যে বড় সেই ইমামতি করবে। (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৬৬ পৃঃ)

শায়খুল ইসলাম আল্লামা সানাউল্লাহ অমৃতসারী লিখেছেন, ওয়াবা ও মুহাম্মারী এবং ঝড়-তুফান প্রভৃতি বালা-মুসীবতের সময়ে আযান দেয়ার কোন প্রমাণ হাদীসে পাওয়া যায় না। সুতরাং এটা বিদআত। (ফাতওয়া সানায়িয়াহ ১ম খণ্ড ১০১ পৃঃ)

## সন্তান ভূমিষ্ঠ হলে আযান ও ইকামত

আবু রাফি' (রাঃ) বলেন, আমি দেখেছি যে, হাসান ইবনে আলী যখন ভূমিষ্ঠ হন তখন রসূলুল্লাহ ﷺ হাসানের কানে আযান দেন— (তিরমিযী, আবু দাউদ, মিশকাত ৩৬৩ পৃঃ)। অন্য বর্ণনায় আছে, যার কোন সন্তান হয় অতঃপর সে তার



ডান কানে আযান এবং বাম কানে ইকামত দেয় ঐ সন্তানকে উম্মুস সিবয়্যান শয়তান কোন ক্ষতি করতে পারে না- (মুসনাদে আবু ইয়লা)। 'উমর ইবনে আবদুল আযীয তাঁর সন্তান হলে ডান কানে আযান ও বাম কানে ইকামত দিতেন- (শারহুস সুন্নাহ, ফাতাওয়া নায়ীরিয়াহ ২য় খণ্ড ৪৫০ পৃঃ)।

## ঝড় বৃষ্টি ও ঠাণ্ডা রাতে আযানের বিশেষ শব্দ

ঝড়, বৃষ্টি ও ঠাণ্ডা রাতে জামা'আতে নামায পড়া কষ্টকর মনে হলে আল্লাহর রসূল ﷺ মুআযযিনকে বলতেন যে, আযানের মধ্যে এ শব্দগুলো বল- "আলা-সল্লু ফী রিহা-লিকুম"।

তরজমা : ওগো লোকেরা! তোমরা ঘরে নামায পড়ে নিও। (আবু দাউদ ১ম খণ্ড ১৫২ পৃঃ, বুখারী ৮৮ পৃঃ)

এ শব্দগুলো "হাইয়্যা 'আলাস সলাহ, হাইয়্যা 'আলাল ফালা-হ" এরপর বলা যেতে পারে। অথবা ঐ দুই শব্দের বদলে বলা যেতে পারে। কিংবা সবশেষে বলা যেতে পারে। তবে সবশেষে বললে আযানের ধারাটা ঠিক থাকে। সেজন্য শেষে বলাটাই উত্তম মনে হয়। (আওনুল মা'বুদ ১ম খণ্ড ৪১১ পৃঃ)

ইবনে 'উমর (রাঃ) একদা ঠাণ্ডা ও ঝড়ের রাতে আযানের শেষে ঐ শব্দগুলো বলেছিলেন। (আবু দাউদ ১ম খণ্ড ১৫২ পৃঃ)

## আযানে ও ইকামতে মনগড়া শব্দ

রসূলুল্লাহ ﷺ ফজরের আযানে "আস্‌সলা-তু খায়রুম মিনান্ নাওম" এবং ইকামতে "ক্বাদকামা-তিস সলাহ" এবং ঝড়বৃষ্টির সময় আলা-সল্লু ফী রিহা-লিকুম" ছাড়া আর কোন শব্দ বাড়াননি। সুতরাং উক্ত বাড়তি শব্দগুলো সুন্নাহ। কিন্তু পরবর্তীকালে কিছু লোক আযানে সুন্নাহী শব্দের সাথে কতিপয় মনগড়া শব্দ ঢুকিয়ে দিয়ে আযানেও বিদআত সৃষ্টি করেছেন। হিজরীর প্রথম শতকের শেষ দিকে খলীফা কিংবা গভর্নর অথবা জনগণ যখন মাসজিদে পৌছতো তখন মুআযযিন আযান এবং ইকামতের মাঝে বারংবার বলতেন "ক্বাদ-কামা-তিস

সলাহ” এবং “হাইয়্যা ‘আলাল ফালাহ”। একদা বিখ্যাত সাহাবী ‘আব্দুল্লাহ ইবনে ‘উমর (রাযিঃ) কোন মাসজিদে ঐরূপ বলা দেখে নিজের সাধীকে বলেন, বিদআতীদের মাসজিদ থেকে বেরিয়ে চল। অতঃপর সেখানে তারা নামায পড়লেন না। (তিরমিযী ১ম খণ্ড ২৭ পৃঃ)

১। উমাইয়া খলীফাদের যুগে “হাইয়্যা ‘আলাস সলাহ ইয়া খলীফাতা রসূলিল্লাহ-হ” শব্দগুলো বাড়ানো হয়।

২। মিসরের শিয়া ফাতিমী খলীফাদের যুগে ৩৪৭ হিজরীতে “মুহাম্মাদুন ওয়া আলিইয়ুন খায়রুল বাশার” শব্দগুলো যোগ করা হয়।

৩। এক ফাতিমী খলীফা মুয়িয় লি দীনিল্লাহ ৩৫৯ হিজরীতে “হাইয়্যা আলা খায়রিল আমাল” শব্দগুলো জারী করেন।

৪। ৪০১ হিজরীতে আযানের পর “আস্‌সলা-তু ‘আলা- আমীরিল মু‘মিনীন ওয়ারহমাতুল্লাহ” শব্দগুলো সংযোজিত হয়।

৫। ৪০৫ হিজরীতে “আস্‌সলা-তু রহিমাকাল্লাহ” বাড়ানো হয়।

৬। আবুল মায়মুন ইবনে ‘আব্দুল মাজীদ ৫২৪ হিজরীতে উক্ত ২নং ও ৪ নম্বরে বর্ণিত শব্দগুলো আযান থেকে বাতিল করে দিলেও ৫২৬ হিজরীতে হাফিয লিদ্দীনিল্লাহ আবার তা জারী করেন।

৭। ৫৬৭ হিজরীতে সুলতান সালাহুদ্দীন আইয়ুবী ফাতিমী শিয়াদের ঈমান করে মিসরে আবার হিজযী তথা সুন্নাতী আযান প্রচলন করেন।

৮। ৭৬০ হিজরীতে মুহতাসিব সালাহুদ্দীন ‘আব্দুল্লাহ বারীযী “আস্‌সলা-তু ওয়াস্‌সালামু ‘আলায়কা ইয়া রসূলুল্লাহ” শব্দগুলো চালু করেন।

৯। সিনেমার গানের সঙ্গে আযান দেয়া হয় তা ফাতিমী-রাফিযীদের তৈরীকৃত। হিজরীর ৮ম শতকের শুরুতে নাজমুদ্দীন তাবান্দী নামে এক দারোগা ঐ টং চালু করেন। যা ৭৯১ হিজরীতে মিসর ও সিরিয়ার সমস্ত শহরে ছড়িয়ে পড়ে। কয়েক বছর হল ব্রেলবীরা পাকিস্তানে ঐ টং শুরু করেছেন “ইন্না- লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলায়হি রাজিউন”।

(মাকরীযীর আল খিতাত ওয়াল আ-সা-র ৪র্থ খণ্ড ৪৪/৪৭ পৃঃ, রসূলে আকরাম কী নামায ৩৩-৩৫ পৃঃ)

## হানাফী মতে আযানের বাড়াবাড়ি

হানাফী মাযহাবের দুই নম্বর ইমাম আব্দামা আবু ইউসুফ (রহঃ) বলেন, শাসক, মুফতী, কাযী ও শিক্ষক প্রভৃতিকে জানান দেবার জন্য যদি কোন মুআযযিন আযানের পর এ কথাগুলো বলে, আসসালামু 'আলায়কা আইয়ুহাল আমীর \* হাইয়্যা 'আলাস সলা-হ \* হাইয়্যা 'আলাল ফালাহ \* আস্‌সলাতু ইয়ারহামু কাল্লাহ" তাহলে কোন আপত্তি নেই। ফাতওয়া কাযী খানও এটাকে গ্রহণ করেছেন।

কিন্তু ইবনুল মালিক উল্লেখ করেছেন যে, এ ব্যাপারে ইমাম আবু হানীফা ইমাম মুহাম্মাদের সাথে আছেন। এ সম্পর্কে ইমাম মুহাম্মাদ বলেন, আবু ইউসুফের জন্য আফসোস! যিনি শাসকদের জন্য আযানে বাড়াবাড়ি নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। (আলবাহরর রায়েক ১ম খণ্ড ২৬১ পৃঃ, মাবসূত ১ম খণ্ড ১৩১ পৃঃ)

## মেয়েদের আযান ও ইকামত

হানাফী ফকীহরা বলেন, মেয়েরা ইকামত দেবে কিন্তু আযান দেবে না- (বাহারর রায়েক ১ম খণ্ড ২৫৭ পৃঃ)। ইমাম সারাখসী হানাফী বলেন, মেয়েরা যদি আযান ও ইকামত দিয়ে নামায পড়ে তাহলে তাদের নামায আপত্তি সহকারে জাযিয় হবে হাদীসের খেলাফ হবারও জন্য এবং ফিতনার কারণে- (মাবসূত ১ম খণ্ড ১৩৩ ৪০৮ পৃঃ)।

ইমাম সারাখসীর মন্তব্য ঠিক নয়। কারণ, হাদীসে আছে যে, 'আযিশা (রাযিঃ) আযান ও ইকামত দিতেন এবং মেয়েদের ইমামতি করতেন ও তাদের মাঝখানে দাঁড়াতেন। (মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বা ১ম খণ্ড ২২৩ পৃষ্ঠা, বায়হাকী ১ম খণ্ড ৪০৮ পৃষ্ঠা)

তাই ইমাম শাকিরী বলেন, ওরা আযান ও ইকামত দিলে কোন আপত্তি নেই। ইমাম আহমাদ বলেন, দিলে আপত্তি নেই, না দিলেও জাযিয়। (আল-মুগনী ১ম খণ্ড ৪২২ পৃঃ, ফিকহুস সুন্নাহ ১ম খণ্ড ১২০ পৃঃ)

## ইকামত বা তাকবীরের বিবরণ

ইবনে 'উমর (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে আযান দুই দুইবার করে এবং ইকামত এক একবার করে বলা হত। তাছাড়া ইকামতে "কাদ-ক্বা-মাতিস

সলাহ” (নিশ্চয় নামায কাযিম হল) ২বার করে বলা হত। (আবু দাউদ, নাসায়ী, দারিমী, মিশকাত ৬৩ পৃঃ)

আযানের মত দুই দুইবার করে ইকামত দেয়ারও হাদীস আছে। কিন্তু ইমাম নওয়াব সিদ্দীক হাসান খান বলেন, একবার করে ইকামত দেয়ার হাদীসগুলো বেশী জোরদার— (বাবুলুল মানকাআহ ১৯ পৃঃ)। হাদীসের হাক্কিয়রা বলেন, দু’বার করে ইকামত দেয়ার হাদীসের শব্দগুলো সুরক্ষিত নয়— (নাসবুর রায়াহ ১ম খণ্ড ২৭৩ পৃঃ)।

## তাকবীরের জওয়াব

আবু উমামা (রাঃ), বিলাল তাকবীর দিতে দিতে যখন “কাদকা-মাতিস সলাহ” বলতেন তখন রসূলুল্লাহ ﷺ বলতেন—

أَنَا مَهَا اللَّهُ رَادَمَهَا آتَاكَ-মাহাদ্দা-হ ওয়াআদামাহা

(আল্লাহ নামাযকে কাযিম রাখুন এবং তাকে চিরস্থায়ী করুন)। এবং তাকবীরের অন্যান্য জওয়াব আযানের জওয়াবের মতই তিনি দিতেন, যেমন ‘উমর (রাযিঃ) বর্ণিত হাদীসে আযানের জওয়াব বিবৃত হয়েছে। (আবু দাউদ, মিশকাত ৬৬ পৃঃ)

ব্যাখ্যা : ‘উমর (রাযিঃ) বর্ণিত হাদীসে “হাইয়্যা ‘আলাস সলাহ” ও “হাইয়্যা ‘আলাল ফালাহ” এর জওয়াবে “লা- হাওলা- ওয়ালা- কুওওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ” আছে। অতএব তাকবীরেও “হাইয়্যা ‘আলাস সলাহ” ও “হাইয়্যা ‘আলাল ফালাহ” এর জওয়াবে “লা- হাওলা- ওয়ালা- কুওওয়াতা ইল্লা- বিল্লাহ” বলতে হবে।

## ইকামতের মধ্যেই জামা‘আত শুরু করা

### সূরাতের খেলাফ কাজ

হানাফী ফকীহরা বলেন, ইকামত দানকারী তাকবীর দেয়ার সময় যখন “হাইয়্যা ‘আলাস সলাহ” বলবে তখন ইমাম মুক্তাদীগণ উঠে দাঁড়াবে এবং ক্বাদ কাযাতিস সলাহ বলার সময় ইমাম ও মুক্তাদী নামায শুরু করবে এ হল ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম মুহাম্মাদের অভিমত। কিন্তু ইমাম আবু ইউসুফের সঙ্গে পক্ষ করার পর। শেষ শব্দের ব্যাখ্যায় খুলাসাহ এচ্ছে আছে যে, মুআয্বিন যখন

“কাদক্-মাতিস সালাহ” বলা শেষ করবে তখন ইমাম নামায শুরু করবে। আল্লামা মোল্লা আলী কারী হানাফী বলেন, এরূপ করা মুস্তাহাব ও পছন্দনীয়। (শারহুন নিকায়াহ ১ম খণ্ড ৬৩ পৃঃ)

হানাফী ফকীহদের উক্ত ফাতওয়া বিবেক প্রসূত। কারণ ঐ মতের প্রমাণে কোন হাদীস নেই। বরং ওর বিপরীত হাদীস পাওয়া যায়। যেমন উপরে বর্ণিত হয়েছে যে, বিলাল (রাঃ) ইকামত দিলে রসূলুল্লাহ ﷺ আযানের মত পুরো একামতের জওয়াব দিতেন— (আবু দাউদ, মিশকাত ৬৬ পৃঃ)। এ হাদীস প্রমাণ করে যে, ইকামত সম্পূর্ণ শেষ হওয়ার পর ইমামের তাকবীরে তাহরীমা বলা সুন্নাত— (নায়লুল, আওতার ১ম খণ্ড ৩৫৩ পৃঃ)।

রসূলুল্লাহ ﷺ এরপর খুলাফায়ে রাশিদীনও ইকামত শেষ করে তাকবীর তাহরীমা বলতেন। যেমন- বর্ণিত আছে যে, ‘উমর (রাঃ) কাতার সোজা করার জন্য একজন লোককে দায়িত্ব দিতেন এবং কাতার সোজা হবার খবর না হওয়া পর্যন্ত তিনি তাকবীরে তাহরীমা উচ্চারণ করতেন না। আরো বর্ণিত আছে যে, ‘উসমান এবং ‘আলী (রাযিঃ) ঐ ব্যাপারে লক্ষ্য রাখতেন এবং কাতার সোজা করার কথা বলতেন, পরিশেষে তাকবীরে তাহরীমা দিতেন। (তিরমিযী ১ম খণ্ড ৩১ পৃঃ)

অতএব হানাফী ফকীহদের কিয়াসী ফাতওয়া অনুসারে ইকামত শেষ না হতেই নামায শুরু করা সুন্নতের খেলাফ কাজ। আল্লাহ আমাদেরকে সুন্নাতী কাজের সুমতি দিন-আমীন।

## ইকামত ও জামা‘আতের মধ্যে ব্যবধান

আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর বর্ণনায় আছে, একদা রসূলুল্লাহ ﷺ ঘর থেকে বের হলেন। তখন ইকামত হয়ে গিয়েছিল এবং নামাযের কাতারও সোজা করা হয়েছিল। পরিশেষে তিনি যখন তাঁর নামাযের জায়গায় দাঁড়ালেন তখন আমরা তাঁর তাকবীরে তাহরীমা বলার অপেক্ষা করছিলাম। কিন্তু (হঠাৎ) তিনি ফিরে গেলেন এবং বললেন, তোমরা যে যার জায়গায় থাক। তাই আমরা ঐ অবস্থায় থাকলাম। অবশেষে তিনি আমাদের নিকট বেরিয়ে এলেন। তখন তাঁর মাথা থেকে পানি ঝরছিল তিনি গোসল করেছিলেন। (বুখারী ৮৯ পৃঃ)

আনাস (রাঃ) বলেন, একবার নামাযের ইকামত দেয়া হল। তখন নাবী ﷺ মাসজিদের কোন একজন লোকের সাথে ফিসফিস করে কথা বলছিলেন। কিন্তু তিনি নামাযের জন্য সেখান থেকে উঠলেন না। পরিশেষে লোকদের চোখে ঘুম এসে গেল। (বুখারী ৮৯ পৃঃ)

মুসলিমের বর্ণনায় এতটা বাড়তি আছে যে, তারপর তিনি উঠলেন, অতঃপর নামায পড়ালেন। (ফাতহুল বারী ২য় খণ্ড ১২৪ পৃঃ)।

উক্ত দু'টি হাদীসও প্রমাণ করে যে, ইকামত শেষ হতে না হতেই ইমামের তাকবীরে তাহরীমা বলে হাত বেঁধে নামায শুরু করা মোটেই যাবে না, বরং অনিবার্য কারণ থাকলে ইকামত ও জামা'আত শুরু করার মাঝে পাঁচ দশ মিনিট দেবী করাও যাবে।

## কয়েক ওয়াক্ত কাযা নামাযের আযান এবং ইকামত

ইবনে মাস'উদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, খন্দকের যুদ্ধের দিনে মুশরিকরা নাবী ﷺ-কে চার ওয়াক্ত নামায হতে বিরত রাখে। পরিশেষে রাত হয়ে যায়। অতঃপর বিলালকে হুকুম দেন। তাই তিনি আযান দেন, তারপর ইকামত দেন। ফলে তিনি (ﷺ) যোহর পড়লেন। তারপর ইকামত দিয়ে আসর, আবার ইকামত দিয়ে মাগরিব, ফের ইকামত দিয়ে এশা পড়লেন— (আহমাদ, নাসায়ী ১ম খণ্ড ৭২ পৃঃ, তিরমিযী)। জাবির (রাঃ)-এর বর্ণনায় আছে, একদা মুয়দালিফায় এসে এক আযানে ও দুই ইকামতে মাগরিব এবং এশা পড়েন— (মুসলিম, বুখারী মারাম ১৪ পৃঃ)।

## মাসজিদের গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য

নাবী ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি আযান শোনে অতঃপর সে (অসুখ বা ভয় প্রভৃতি) কোন ওয়র ছাড়া নামাযে হাযির হয় না (ঘরে পড়ে) তার নামায হয় না। (দারাকুতনী, মিশকাত ৯৭ পৃঃ)।

এ হাদীস দ্বারা মাসজিদের গুরুত্ব প্রমাণিত হয়। সুতরাং এবার মাসজিদের কথা শুনুন। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় জায়গা মাসজিদ এবং সবচেয়ে ঘৃণিত জায়গা হাট-বাজার। (মুসলিম, মিশকাত ৬৮ পৃঃ)

নাবী ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি আদ্বাহর ওয়াস্তে মাসজিদ বানায় তার জন্য আদ্বাহ জালাতে ঘর বানান। (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৬৮ পৃঃ)

‘আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে মহদ্বায় মহদ্বায় মাসজিদ বানাবার এবং সেগুলোকে পাক সাফ রাখবার ও খোশবু দিয়ে সুবাসিত করার হুকুম দিয়েছেন। (আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, মিশকাত ৬৯ পৃঃ)

## মাসজিদে নামাযের সাওয়াব

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, একজন লোক ঘরে নামায পড়লে একটি নেকী পায়, সে ওয়াস্তিয়া মাসজিদে নামায পড়লে ২৫ গুণ, জুমু‘আ মাসজিদে পড়লে পাঁচশ গুণ, মাসজিদে আকসায় পড়লে পঞ্চাশ হাজার গুণ, আমার মাসজিদ অর্থাৎ মাসজিদে নববীতে পড়লে পঞ্চাশ হাজার গুণ এবং মাসজিদুল হারাম বা কাবার ঘরে পড়লে এক লাখ গুণ সাওয়াব পাবে- (ইবনে মাজাহ, মিশকাত ৭২ পৃঃ)। যদি কেউ জঙ্গলে ও মাঠে রুকু ও সিজদা ঠিকমত আদায় করতঃ ফরয নামায পড়ে তাহলে সে ৫০ গুণ সাওয়াব পাবে- (আবু দাউদ ৮৩ পৃঃ, হাকিম ১ম খণ্ড ২০৮ পৃঃ)। এ হাদীস প্রমাণ করে যে, জঙ্গলে ও মাঠে একা নামায পড়ায় জামা‘আতে নামায পড়ার চেয়ে সাওয়াব বেশী। এটা হল ফরয নামাযের হুকুম- (বায়লুল মানফাআহ ২২ পৃঃ)।

## মাসজিদে কী কী করা নিষেধ

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, পিয়াজ ও রসুন (কাঁচা) খেয়ে মাসজিদের কাছে এসো না। কারণ এতে ফিরিশতারা কষ্ট পায়- (বুখারী, মুসলিম)। তিনি (ﷺ) বলেন, মাসজিদে থুথু ফেল না- (ঐ)। যদি কোন নামাযীকে নামায পড়া অবস্থায় থুথু ফেলতে হয় তাহলে সে যেন তার সামনে না ফেলে। কারণ ঐ সময় সে আদ্বাহর সাথে চুপে চুপে কথা বলে। এবং সে যেন ডানদিকেও না ফেলে কারণ তা ডানদিকে ফেরেশতা থাকে। অতএব হয় সে বামদিকে ফেলবে কিংবা পায়ের নীচে ফেলবে। পরে সেটাকে মুছে দেবে- (ঐ)। তিনি বলেন, মাসজিদকে চাকচিক্যময় করবে না এবং ইয়াহুদী ও নাসারাদের মত নক্সা ও কারুকার্য করবে না- (আবু দাউদ, মিশকাত ৬৯ পৃঃ)।

তিনি (ﷺ) মাসজিদে কবিতা আবৃত্তি করতে, বেচাকেনা করতে ও ছুমু'আর দিনে নামাযের আগে গোল হয়ে বসে চক্র বানাতে নিষেধ করেছেন— (আবু দাউদ, তিরমিযী) তিনি বলেন, এমন একটা যুগ আসবে যখন মানুষ মাসজিদে দুনিয়ার কথা বলবে, তখন তুমি তাদের সাথে বসবে না— (বায়হাকী)। তিনি মাসজিদে কেসাস (খুনের প্রতিশোধ) নিতে এবং হৃদ (শরীআতী শাস্তি) দিতে মানা করেছেন— (আবু দাউদ, মিশকাত ৭০-৭১)। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি মাসজিদে কাউকে কোন হারানো জিনিসের কথা ঘোষণা করতে শুনবে সে যেন বলে যে, আল্লাহ তোমার ঐ জিনিসটা ফিরিয়ে না দেন। কারণ মাসজিদ এজন্য তৈরী হয়নি— (মুসলিম, মিশকাত ৬৮ পৃঃ)।

## সাত জায়গায় নামায পড়তে মানা

রসূলুল্লাহ (ﷺ) সাত জায়গায় নামায পড়তে মানা করেছেন। (১) জঞ্জাল ফেলার জায়গা, (২) যবহ করার জায়গা, (৩) কবর স্থানে, (৪) রাস্তায়, (৫) গোসলখানায়, (৬) উট বাঁধার জায়গায়, (৭) কা'বার ছাদের উপর। (তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, মিশকাত ৭১)

রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, গোরস্থান ও গোসলখানা ছাড়া সমস্ত যমীনটাই মাসজিদ। (আবু দাউদ, তিরমিযী, দারিমী, মিশকাত ৭০ পৃঃ)

## ঘরেও মাসজিদ বানাও

রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, তোমাদের কিছু নামায (অর্থাৎ সুন্নাতে ও নফল নামাযগুলো) নিজেদের ঘরে পড় এবং (ঘরে ঐ সব নামায না পড়ে) সেটাকে কবরে পরিণত করো না। (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৬৯ পৃঃ)

যায়দ ইবনে সাবিত (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁর ঘরে নামাযের জন্য একটি খাস হজুরা করে রেখেছিলেন। অনেক লোক তাঁর কাছে আসতো এবং তাতে নামায পড়তো। তিনি (ﷺ) বলেন, ফরয ছাড়া পুরুষের অন্যান্য সুন্নাতে, নফল নামায ঘরে পড়া উত্তম— (বুখারী, মুসলিম, বুলুগুল মারাম ২৯ পৃঃ)। এ হাদীসের ভিত্তিতে উলামায়ে কিরাম বলেন, মাসজিদে নববীর পড়শীদের ফরয ছাড়া



অন্যান্য নামায মাসজিদে নববীতে পড়ার চেয়ে ঘরে পড়া উত্তম- (বায়লুল মানফাআহ ২৩ পৃঃ)।

## মাসজিদে ঢোকান ও বের হবার দু'আ

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যখন তোমাদের কেউ মাসজিদে ঢুকবে তখন এ দু'আ পড়বে :

اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ.

উচ্চারণ : আল্লা-হুয়াফ তাহলী আব-ওয়া-বা রাহমাতিকা ।

অর্থঃ হে আল্লাহ! তুমি আমার জন্য তোমার রহমতের দরজাগুলো খুলে দাও । যখন বের হবে তখন এ দু'আ পড়বে,

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ.

উচ্চারণ : আল্লাহুয়া ইন্নী আস-আলুকা মিন ফাযলিকা ।

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে তোমার অনুগ্রহ প্রার্থনা করছি ।

(মুসলিম, মিশকাত ৬৮ পৃঃ)

মাসজিদে ঢোকান সময় প্রথমে ডান পা রাখতেন- (তাবারানী, কানযুল উম্মাল খণ্ড ৭৪ পৃঃ)। বের হবার সময় প্রথমে বাম পা বের করতে হবে- (হাকিম ১ম খণ্ড ২১৮ পৃঃ)। মাসজিদে ঢোকান আরো দু'টি দু'আ আবু দাউদ ও তিরমিযীতে আছে ।

## মাসজিদে যাকাত ও ঢোকান পর করণীয়

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি নিজের ঘর থেকে অম্বু করে ফরয নামায পড়ার উদ্দেশ্যে মাসজিদের দিকে যায় সে ব্যক্তি একজন ইহরামওয়ালা হজ্জ সমাধানকারীর নেকী পায় । (আহমাদ, আবু দাউদ, মিশকাত ৭০ পৃঃ)

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যখন তোমরা কেউ মাসজিদে ঢুকবে তখন বসার আগে দু'রাক'আত নামায পড়ে নেবে । (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৬৮ পৃঃ)

এ হাদীস প্রমাণ করে যে, যারা মাসজিদে ঢুকে নামাযে না দাঁড়িয়ে প্রথমে বসে পড়ে এবং ঐ বসটাকে সুন্নাত মনে করে তারা বিদআত কাজ করে । আল্লাহ তাদেরকে বিদআত ত্যাগ করার সুমতি দিন-আমীন ।

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যখন তোমরা জান্নাতের বাগানে ঘোরাফেরা করবে তখন কিছু ফলমূল খেয়ে নিও। সাহাবীরা বললেন, জান্নাতের বাগান কোন্টা? তিনি (ﷺ) বললেন, মাসজিদগুলো; তাঁরা বললেন, তার ফল খাওয়া কেমন? তিনি বললেন, এ তাসবীহগুলো পড়া : “সুবহানা দ্বা-হ, আলহামদুলিল্লাহ, ওয়াল্লা ইলা-হা, ইল্লাল্লাহু আদ্বাহু আকবার”। (তিরমিযী, মিশকাত ৭০ পৃঃ)।

তরজমা : আদ্বাহ পবিত্র, সমস্ত প্রশংসা আদ্বাহর, আদ্বাহ ছাড়া আর কেউ ইবাদতের যোগ্য নয় এবং আদ্বাহ সবচেয়ে বড়।

## পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের রাক'আতের বিবরণ

পাঁচ ওয়াক্তে ফরয নামায মোট ১৭ রাক'আত :

(১) ফজরে ২ রাক'আত, (২) যোহরে ৪ রাক'আত, (৩) আসরে ৪ রাক'আত, (৪) মাগরিবে ৩ রাক'আত, (৫) এশায় ৪ রাক'আত। (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৭০-৮০ পৃঃ)

সুন্নাত নামায কমপক্ষে ১০ রাক'আত, বেশী হলে বার রাক'আত।

ইবনে 'উমর (রাঃ) বলেন, আমি নাবী ﷺ থেকে ১০ রাক'আত নামায মুখস্থ করেছি। তা হল এ : যোহরের আগে ২ রাক'আত ও পরে ২ রাক'আত, মাগরিবের পরে তাঁর ঘরে ২ রাক'আত। এশার পরে তাঁর ঘরে ২ রাক'আত এবং ফজরের আগে ২ রাক'আত। (বুখারী, মুসলিম, বুলুগল মারাম ২৬ পৃঃ)

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি দিনরাতে ১২ রাক'আত নামায পড়ে তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর বানানো হয়। রাক'আতগুলো এই- যোহরের আগে ৪ রাক'আত এবং পরে ২ রাক'আত, মাগরিবের পরে ২ রাক'আত, এশার পরে ২ রাক'আত, ও ফজরের আগে ২ রাক'আত। (তিরমিযী, মিশকাত ১০৩ পৃঃ)

## যোহর ও আসরের সুন্নাত

উম্মে হাবীবা (রাঃ) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি সর্বদা যোহরের আগে ৪ রাক'আত এবং পরে ৪ রাক'আত নামায পড়বে আদ্বাহ তার উপর জাহান্নামের আগুন হারাম করে দেবেন। (আহমাদ, তিরমিযী, নাসায়ী, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, মিশকাত ১০৪ পৃঃ)

‘আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ ﷺ (কখনো) আসরের আগে ৪ রাক‘আত নামায পড়তেন (তিরমিযী)। কিন্তু তা দুই সালামে পড়তেন— (ঐ)। আবার কখনো আসরের আগে ২ রাক‘আত পড়তেন— (আবু দাউদ, মিশকাত ১০৪ পৃঃ)। আল্লাহর রসূল বলেন, যে ব্যক্তি আসরের আগে ৪ রাক‘আত নামায পড়বে আল্লাহ তার উপরে রহম করুন— (আহমাদ, আবু দাউদ, তিরমিযী, বুলুগুল মারাম ২৬ পৃঃ)।

### মাগরিবের আগে ও এশার পরে সুন্নাত

নাবী ﷺ বলেন, তোমরা মাগরিবের আগে ২ রাক‘আত পড়, তোমরা মাগরিবের আগে ২ রাক‘আত পড়। তৃতীয়বারে তিনি বললেন, যার যার ইচ্ছা সে পড়। যাতে করে লোক এটাকে সুন্নাতে মাতাআদাদাহ (তাকিদ করা) মনে না করে। (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ১০৪ পৃঃ)

সহীহ ইবনে হিব্বানে আছে যে, নাবী ﷺ মাগরিবের আগে দু‘রাক‘আত নামায পড়েছেন। বুখারী ও মুসলিমে আনাসের (রাঃ) বর্ণনায় আছে যে, মুআয্বিন যখন মাগরিবের আযান শেষ করতেন তখন নাবী ﷺ-এর সাহাবীদের মধ্যে বহু লোক ধামের কাছে দৌড়ে গিয়ে দু‘রাক‘আত নামায পড়তেন। তখন যদি কোন বিদেশী ব্যক্তি মাসজিদে ঢুকতো তাহলে সে বহু লোকের নামায পড়ার কারণে মনে করত যে, নামায বোধ হয় শেষ হয়ে গেছে। (কাবীরী ৩৭০ পৃঃ, মিশকাত ১০৫ পৃঃ)

এ হাদীসগুলো প্রমাণ করে যে, মাগরিবের আযান এবং জামা‘আত দাঁড়াবার মাঝে দু‘রাক‘আত নামায পড়বার মত সময়ের ব্যবধান থাকতে হবে।

কিন্তু ইমাম আবু হানীফার মতে উভয়ের মাঝে বসাও চলবে না। অর্থাৎ আযান দিয়েই নামায শুরু করতে হবে। যেমন ইমাম আবু ইউসুফ ইয়াকুব বলেন, একদা আমি ইমাম আবু হানীফাকে মাগরিবের আযান ও ইকামত দিতে দেখলাম। তখন তিনি আযান এবং ইকামতের মাঝে মোটেই বসলেন না— (হিদায়া ১ম খণ্ড ৭৪ পৃঃ)। ইমাম সাহেবের উক্ত আমল হাদীস সম্মত নয়। মনে হয় তিনি উপরোক্ত হাদীসগুলো পাননি।

‘আয়িশা (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ এশার নামায পড়ে সর্বদা আমার কাছে আসতেন এবং ৪ কিংবা ৬ রাক‘আত নামায পড়তেন। (আবু দাউদ, মিশকাত ১০৪ পৃঃ)

## ফজরের সুন্নাত

‘আয়িশা (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ ফজরের ২ রাক‘আত সুন্নাতের চেয়ে আর কোন নফল নামাযের প্রতি অত গুরুত্ব দিতেন না। (বুখারী, মুসলিম)

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, ফজরের ২ রাক‘আত সুন্নাত দুনিয়া ও তার মধ্যে যা কিছু আছে সে সবেদর চেয়ে বেশী উত্তম ও শ্রেয়। (মুসলিম, মিশকাত ১০৪ পৃঃ)

এ হাদীস দ্বারা বোঝা যায় যে, ফজরের দু‘রাক‘আত সুন্নাতের গুরুত্ব কত। কিন্তু এ সুন্নাতের গুরুত্ব যতই হোক না কেন ফরযের তুলনায় এর গুরুত্ব কম। সেজন্য ফজরের জামা‘আত চলতে থাকলে ঐ জামা‘আতে शामिल না হয়ে তাড়াহুড়ো করে সুন্নাত পড়ে জামা‘আতে शामिल হওয়াটা হাদীসের খেলাফ কাজ।

‘আব্দুল্লাহ ইবনে সারজাস বলেন, একজন লোক এল। তখন রসূলুল্লাহ ﷺ ফজরের নামাযে ছিলেন। ফলে লোকটি দু‘রাক‘আত পড়ে জামা‘আতে ঢুকল। অতঃপর রসূলুল্লাহ ﷺ যখন তাঁর নামায শেষ করলেন তখন বললেন, ওগো অমুক! তোমার নামায কোনটা? যেটা আমাদের সাথে পড়লে, না যেটা তুমি একা পড়লে? (নাসায়ী, মাবসূত ১ম খণ্ড ১০১ পৃঃ, লাহোরী ছাপা)।

তাই হানাফী ইমাম মুহাম্মাদ বলেন, সুন্নাত না পড়ে জামা‘আতেই ঢুকতে হবে। (মাবসূত ১ম খণ্ড ১৬৭ পৃঃ)

অন্যত্র নাবী ﷺ বলেন, যখন ফরয নামাযের তাকবীর দেয়া হয়ে যায় তখন ফরয ছাড়া (সুন্নাত বা নফল) কোন প্রকার নামাযই হবে না- (মুসলিম, মিশকাত ৯৬ পৃঃ)। বরং কেউ যদি সুন্নাত বা নফল নামায পড়তে থাকে এমন সময়ে যদি ফরয নামাযের জামা‘আতের জন্য তাকবীর দেয়া হয় তাহলে এ সুন্নাত বা নফল নামায ছেড়ে দিয়ে জামা‘আতে शामिल হতে হবে- (আত তা‘লীকা-তুস সালাফিয়াহ আলান নাসায়ী, ১ম খণ্ড ১০০ পৃঃ)। জামা‘আতে शामिल হওয়ার

কারণে কেউ যদি সূর্য ওঠার আগে সুন্নাত না পড়তে পারে তাহলে সে সূর্য ওঠার পরেও পড়তে পারে— (তিরমিযী ১ম খণ্ড ৫৭ পৃঃ)।

## ফজরের সুন্নাতের পর ডান কাতে শোয়া সুন্নাত

‘আয়িশা (রাঃ) বলেন, নাবী ﷺ ফজরের দু’রাক’আত সুন্নাত পড়ার পর ডান কাতে হয়ে শুতেন— (বুখারী, বুলুগল মারাম ২৬ পৃঃ)। তিনি (ﷺ) বলেন, তোমাদের কেউ যখন ফজরের দু’রাক’আত (সুন্নাত) পড়ে নেবে সে যেন ডান কাতে শোয়— (তিরমিযী ১ম খণ্ড ৫৬ পৃঃ)। ‘আয়িশা (রাঃ)-এর অন্য বর্ণনায় আছে, যখন তিনি ঘরে ফজরের সুন্নাত পড়তেন তখন ডান কাতে শুতেন— (ঐ)।

হাফিয ইবনে হাজার ফতহুল বারীতে বলেন, কতিপয় সালাফের মতে ঘরে শোয়া মুস্তাহাব, মাসজিদে নয়। এটা ইবনে ‘উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। আমাদের কিছু শায়খ বলেন, নাবী ﷺ মাসজিদে শুয়েছিলেন বলে কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না। ‘উমর (রাঃ) মাসজিদে কাউকে শুতে দেখলে বলতেন, ওকে কাঁকর মার। (ইবনে আবী শায়বা ২য় খণ্ড ২৪৮ পৃঃ)

## বিত্র নামায

বিত্র নামায এক, তিন, পাঁচ ও নয় রাক’আত পর্যন্ত পড়া যেতে পারে।

(সিহাহ সিত্তাহ, মিশকাত ১১১-১১২)

## নামায কেন পড়তে হবে?

কুরআনের প্রায় ৮২ জায়গায় আদ্বাহ তাবারাক ওয়াতা’আলা নামাযের কথা বলেছেন, এবং মহানবী ﷺ এ নামাযের ব্যাপারে সবচেয়ে বেশী তাকিদ করেছেন।

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, ইসলামের বুনিয়াদ পাঁচটি জিনিসের উপর, তা হল : (১) এ কথা সাক্ষ্য দেয়া যে, আদ্বাহ ছাড়া ইবাদতের যোগ্য আর কেউ নেই এবং মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর দাস ও প্রেরিত দূত, (২) নামায কায়িম করা, (৩) যাকাত দেয়া, (৪) রমায়ানের রোযা রাখা ও (৫) হজ্জ করা। (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ১২ পৃঃ)

তিনি (☞) বলেন, আব্বাহর দাস ও কুফরী কাজের মধ্যে পার্থক্য হলো নামায না পড়া- (মুসলিম)। মু'মিন ও শিরকের মধ্যে তফাৎ হলো নামায ছেড়ে দেয়া- (মুসলিম)। আমাদের ও তাদের মধ্যে যে অঙ্গীকার আছে তা হল নামায। অতএব যে ব্যক্তি নামায ছেড়ে দেয় সে নিশ্চয়ই কুফরী করে- (আহমাদ, তিরমিযী, নাসায়ী)। যে ব্যক্তি নামায ছেড়ে দেয় সে ইসলামী মিল্লাহ থেকে বেরিয়ে যায়- (তাবারানী)। যে ব্যক্তি নামায ছেড়ে দেয় সে শিরক করে- (ঐ)। যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত নামায ত্যাগ করে সে প্রকাশ্যে কাফির হয়ে যায়- (ঐ)। সাহাবায়ে কিরাম বেনামাযীদেরকে কাফির মনে করতেন- (তিরমিযী)।

ইসলামের রশি ও ধর্মের বুনিয়াদ ৪টি জিনিসের উপর রাখা হয়েছে। তন্মধ্যে যে কেউ একটা ছেড়ে দেবে সে কাফের হবে এবং তাকে হত্যা করা হালাল হবে। জিনিসগুলো এই : (১) আব্বাহ ছাড়া কেউ মাবুদ নেই-এ কথা'র সাক্ষ্য দেয়া, (২) ফরয নামায, (৩) রোযা, (৪) হজ্জ- (আবু ইয়ালা ও আহমাদ)। যে কেউ ওর মধ্যে একটিও ত্যাগ করল সে কাফির হবে, তার নফল ও ফরয কোন ইবাদতই কবুল হবে না এবং তার মাল নষ্ট করা হবে ও তাকে হত্যা করা হালাল- (আবু ইয়ালা)। মুহাম্মাদ ইবনে নাসর মারওয়যী বলেন, নাবী ☞-এর যুগ থেকে সমস্ত আলিমদেরই ফাতওয়া আছে, বিনা কারণে নামায ত্যাগকারী কাফির। অন্য রিওয়াযাতে আছে, বিনা কারণে নামায ত্যাগকারী কাফির। অন্য রিওয়াযাতে আছে, যে ব্যক্তি নামাযের হিফাযত করে না, নামায তার জন্য জ্যোতি, পথের দিশারী ও মুক্তির কারণ হবে না। বরং কিয়ামতের দিন তার হাশর কারুন, ফিরআওন, হামান ও উবাই ইবনে খাল্ফের সাথে হবে- (আহমাদ, দারিমী, মিশকাত ৫৮ পৃঃ)। রসূলুল্লাহ ☞ বলেন, যে ব্যক্তি বিনা কারণে দু'ওয়াক্তের নামায এক ওয়াক্তে জমা করে পড়ে সে ব্যক্তি কবীরা গুনাহ ও মহাপাপ করে- (হাকিম ১ম খণ্ড ২৭৫ পৃঃ)।

উল্লিখিত হাদীসগুলোর মধ্যে কতিপয় হাদীস তের শতকের মুজাদ্দিদ ইমাম নওয়াব সিদ্দীক হাসান খান তদীয় "বাশারাতুল ফুসুসাক" গ্রন্থের ২৯ ও ৩০ পৃষ্ঠায় নকল করেছেন এবং সবগুলোর সনদ নির্ভরযোগ্য, দলীলযোগ্য ও গ্রহণযোগ্য বলে মন্তব্য করেছেন।

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল বলেন : হাদীসে আছে, প্রত্যেক নাবী তাঁর মৃত্যুর পূর্বে মৃত্যুতে তাঁর উম্মাতকে শেষ যে ওয়াসীয়াত করেন তা হল নামায। অন্যান্য

হাদীস সমূহে আছে যে, রসূলুল্লাহ ﷺ-এরও তাঁর উম্মতকে শেষ ওয়াসীয়াত ছিল এ নামাযের। সর্বপ্রথম যে জিনিস উম্মাতে মুহাম্মাদীর উপর করয হয় তা হল নামায এবং ইসলাম থেকে সবশেষে যে জিনিস চলে যাবে তাও এ নামায। কিয়ামতের মাঠে বান্দাদেরকে সর্বপ্রথম সওয়াল করা হবে নামায সম্পর্কে। যদি নামায কবুল হয় তাহলে সব ইবাদত কবুল হবে, আর যদি নামায কবুল না হয় তাহলে সব আমল রদ হয়ে যাবে। এ নামায ইসলামের খুঁটি। নামায ছাড়া ইসলামও নেই, দীনও নেই। (কিতাবুস্ সলাত ১০-১১ পৃঃ)

প্রিয় পাঠক-পাঠিকা! উল্লিখিত সমস্ত হাদীসগুলো ঠাণ্ডা মাথায় পড়লে নিশ্চয়ই বুঝতে পারবেন যে, নামায কেন পড়তে হবে। বড়পীর ‘আব্দুল কাদির জিলানী (রহঃ) বলেন, যারা নামায পড়ে না ঐ সব বেনামাযীদেরকে মুসলমানদের গোরস্থানে কবর দিও না এবং তাদের জানাযা পড়বে না। (গুনইয়াতুত্ তা-লিবীন বাংলা অনুবাদ ২য় খণ্ড ৯ পৃঃ)

## নামায কিভাবে শুরু করতে হবে

আবু হুমায়দ আস সা‘দী বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ যখন নামাযে দাঁড়াতেন তখন কেবলার দিকে মুখ করতেন এবং দুই হাত তুলতেন ও আল্লাহ আকবার বলতেন—(ইবনে মাজাহ, মিশকাত ৬৭ পৃঃ)। এটা ছাড়া বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ ও মুসনাদে আহমাদে আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে রিওয়ায়াতে আছে যে, নাবী ﷺ আবু হুরায়রাকে কিবলার দিকে মুখ করে ‘আল্লাহ আকবার’ বলে নামায শুরু করতে বলেন—(বুলুগল মারাম ১৯ পৃঃ)।

উল্লিখিত হাদীসগুলো দ্বারা প্রমাণিত যে, রসূলুল্লাহ ﷺ কেবল ‘আল্লাহ আকবার’ বলে নামায শুরু করতেন। নামায শুরুর সময় এ “আল্লাহ আকবার” বলাকে তাকবীরে তাহরীমা বলা হয়।

এ প্রসঙ্গে এ কথাটাও উল্লেখযোগ্য যে, হানাকী মায়হাবের ইমাম আবু হানীফা (রাঃ) বলেন, কোন মুসল্মী যদি “তাকবীরে তাহরীমা” দেবার সময় ‘আল্লাহ আকবার’ না বলে তার পরিবর্তে ঐ অর্থবোধক কোন শব্দ যেমন ‘আল্লাহ আজাল্লা’ অথবা ‘আল্লাহ আ‘যাম’ কিংবা ‘আররহমানু আকবার’ প্রভৃতি শব্দ বলে, এমনকি আরবী শব্দ না বলে যদি কাশীতেও আল্লাহ বুয়ুর্গ তারাত বলে এবং তারপরে হাত বাঁধে তাহলেও তার নামায সিদ্ধ হবে। (হিদায়া ১ম খণ্ড ৮৪ পৃঃ)

কিন্তু সমস্ত মুহাদ্দিসীন কিরাম ও আহলে হাদীসদের মতে ‘আল্লাহ আকবার’ ছাড়া অন্য কোন শব্দ দ্বারা নামায আরম্ভ করলে নামায সিদ্ধ হবে না। কারণ, আল্লাহর রসূল ﷺ তাঁর সারা জীবনে নামায পড়াকালে তাকবীরে তাহরীমা দেবার সময় ‘আল্লাহ-হ আকবার’ ছাড়া অন্য কোন শব্দ কখনো বলেননি- (যা-দুল মা‘আদ ১ম খণ্ড ৫১ পৃঃ, মুগনী ১ম খণ্ড ৪৬০ পৃঃ)। তাই ইমাম তিরমিযী বলেন, কোন ব্যক্তি যদি ‘আল্লাহ আকবার’ না বলে বরং আল্লাহর নিরানব্বইটা নামের মধ্যে কোন একটি নাম দিয়ে নামায শুরু করে তাহলে তার নামায ঠিক হবে না- (তিরমিযী, ১ম খণ্ড ৩৩ পৃঃ)। সুতরাং বিবেক খাটিয়ে নতুন কোন শব্দ আবিষ্কার করা মুহাদ্দিসীনে কিরাম ও আহলে হাদীসদের মতে বিদআত।

তাকবীরে তাহরীমা বলার সময় মাথা নীচু করাও বিদআত। (শামী ১ম খণ্ড ৪৪৩ পৃঃ)

‘আল্লাহ আকবার’ উচ্চারণের সময় কেউ যেন দু’টো আলিফেই টান দিয়ে এরূপ না পড়ে ‘আ-ল্লা-হ আ-কবার’ তাহলে শব্দের মানে পাণ্টে যাবে। তখন মানে হবে আল্লাহ কি ঢোল? (আল-মুগনী ১ম খণ্ড ৪৬৩ পৃঃ)

তেমনি কেউ যেন ‘আকবার’ শব্দের ‘বা’ হরফটা টান দিয়ে আকবার না পড়ে। কারণ, আকবা-র শব্দটি আরবী ‘কাবার’ শব্দের বহু বচন। যার অর্থ ঢোল। (হাশিয়াতুল বাজুরী ২৪৮ পৃঃ)

## মুখে নিয়্যাত পড়া বিদআত

আল্লামা ইবনুল হুমাম হানাফী বলেন, হাদীসের কিছু হাফিয বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ থেকে সহীহ এবং যযীফ কোন সনদেও এ কথা প্রমাণিত নেই যে, তিনি নামায শুরু করার সময় বলতেন যে, আমি এরূপ নামায পড়ছি। কোন সাহাবী এবং তাবিযী থেকেও প্রমাণিত নেই। বরং এ কথা বর্ণিত আছে যে, তিনি (ﷺ) যখন নামায শুরু করতেন তখন কেবল তাকবীর বলতেন। তাই মুখে নিয়্যাত পড়া বিদআত- (ফাতহুল কাদীর ১ম খণ্ড ১০৮ পৃঃ, কাবীরী ২৫২ পৃঃ)। আল্লামা শামী হানাফী বলেন, হিলয়্যাহতে এতটা বাড়তি আছে যে, চার ইমাম থেকেও মুখে নিয়্যাত পড়া প্রমাণিত নেই- (শামী ১ম খণ্ড ৩৮৬ পৃঃ)। হানাফী ফিকহ শারহে মুনয়্যাহতে এরূপ আছে- (বাহরুর রায়িক ১ম খণ্ড ২৭৮ পৃঃ)।



আল্লামা মোল্লা আলী কারী হানাকী বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ ত্রিশ হাজার নামায পড়েছেন। তথাপি তাঁর থেকে এ কথা বর্ণিত নেই যে, আমি অমুক অমুক নামাযের নিয়্যাত করছি। তাঁর এ নিয়্যাত না করাটাই সুন্নাহ। যেমন তাঁর কোন কাজ করাটা সুন্নাহ— (মিশকাত ১ম খণ্ড ৩৭ পৃঃ)। তিনি অন্যত্র বলেন, শব্দ উচ্চারণ করে নিয়্যাত করা নাজাযিয। কারণ এটা বিদআত। অতএব যে কাজ শা-রে'অ নাবী ﷺ করেননি সেই কাজ সর্বদা যে করে সে বিদআতী— (ঐ, ৩৬ পৃঃ)।

হাফিয ইবনুল কাইয়িম বলেন, নিয়্যাত হল সংকল্প করা। এর জায়গা মন ও হৃদয়। যার সাথে মুখের কোন সম্পর্ক নেই। এজন্য নাবী ﷺ এবং তাঁর কোম সাহাবী থেকেও নিয়্যাতের ব্যাপারে কোন শব্দ পাওয়া যায় না। পাক হবার এবং নামায শুরু করার সময় নিয়্যাতের নামে যেসব শব্দ তৈরী করা হয়েছে তা হল খুঁতখুঁতে লোকেদের ধোঁকা দেবার জন্য শয়তানের ওয়াস্ওয়াসাহ বা কুমন্ত্রণা।

(ইগা-সাতুল লাহফান ১ম খণ্ড ১৩৬ পৃঃ)

নাবী ﷺ যখন নামাযে দাঁড়াতেন তখন বলতেন, আল্লাহ আকবার এবং এর আগে কিছু বলতেন না। নিয়্যাতের কোন শব্দ উচ্চারণ করতেন না। এ কথাও বলতেন না যে, অমুক নামায পড়ছি কিবলার দিকে মুখ করে, চার রাক'আত ইমাম হয়ে কিংবা মুক্তাদী হয়ে। এ কথাও না যে, এটা আদায় করছি কিংবা কাযা পড়ছি অথবা ফরয পড়ছি। এসব বিদআত নাবী ﷺ বিতর্ক সূত্রে কিংবা দুর্বল সনদে অথবা মুসনাদ বা মুরসাল সনদেও কখন বর্ণিত হয়নি। তার (ﷺ) কোন সাহাবী থেকেও এর প্রমাণ নেই। কোন তাবিয়ী এবং চার ইমামও এটাকে পছন্দ করেননি। (যাদুল মাআদ ১ম খণ্ড ৫১ পৃঃ)

এ কারণেই মনে হয় হানাকী ফিক্‌হের কোন গ্রন্থ যেমন হিদায়া, শারহে বিকারা, নূরুল ইয়াহ, কুদুরী, ফাতহুল কাদীর, মারা-কিল ফালা-হ, আল-জওহারাতুন নাইয়িরাহ, দুবুরে মুখতার, রদুল মুহতার, বাহরুর রা-য়িক, মুনয়্যাতুল মুসান্নী ও গুনয়্যাতুল মুস্তামলী, কানযুদ দাকা-য়িক, হাশিয়া তাহতা-ভী প্রভৃতিতে নামাযের নিয়্যাতের কোন শব্দই খুঁজে পাওয়া যায় না।

মালিকীরা এরূপ নিয়্যাতকে মাকরুহ এবং হাযলীরা বিদআত বলেন— (মিরকাত ১ম খণ্ড ৩৬ পৃঃ)। আল্লাহ আমাদেরকে বিদআত থেকে বাঁচার সুমতি দিন-আমীন।

## দুই পায়ের মাঝখানে কতটা ফাঁক থাকবে

জামা'আতে নামায পড়ার সময় কাতার দেয়া সম্পর্কে আব্দুল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, তোমরা (ইটের জোড়া লাগার মত) লাইনগুলো মিলিয়ে দাও এবং ঘেসাঘেসি হয়ে কাঁধের সাথে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়াও। যাঁর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে তাঁর কসম! আমি দেখেছি যে, বকরীর বাচ্চার মত শয়তান তোমাদের কাতারের মাঝখানে ফাঁকগুলোতে ঢুকছে— (আবু দাউদ, মুসলিম, মিশকাত ৯৮ পৃঃ)। আনাস (রাঃ) বলেন, আমাদের (সাহাবীদের) প্রত্যেকে তাঁর সাথীর কাঁধের সাথে কাঁধ এবং পায়ের সাথে পা মিলিয়ে রাখতেন— (বুখারী ১০০ পৃঃ)।

এই হাদীস দুটো প্রমাণ করে যে, একজন মুসল্লী দাঁড়িয়ে তার ডান ও বাম পাশে দু'জন মুসল্লীকে দাঁড় করিয়ে এবং তাদের পায়ের সাথে পা কাঁধের সাথে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়ালে তার দুই পায়ের মাঝখানে যতটা ফাঁক থাকে সে একা নামায পড়ার সময়ও তার দুই পায়ের মাঝখানে ততটা ফাঁক রাখবে। এ হিসেবে মোটা লোকদের ফাঁক একটু বেশী হবে এবং রোগা লোকদের ফাঁকটা একটু কম হবে।

আহলে হাদীস ভাইদের অনেকের খুব বেশী পা ফাঁক করে দাঁড়ান যেমন বদ-অভ্যাস, তেমনি হানাফী ভাইদের অনেকে দুই পার মাঝখানে ফাঁক না রেখে দু'টো পা এক জায়গায় রেখে নামায পড়েন এটাও বদ অভ্যাস। এ দুই বদ অভ্যাসই ত্যাগ করা উচিত। যারা দুই পায়ের মাঝখানে তিন বা চার আঙ্গুল ফাঁক রাখার কথা বলে তা তাদের মনগড়া ফাতওয়া, হাদীসের নয়।

## হাত কতটা ও কখন তুলতে হবে

আবু হোমায়দা আসসাদী (রাঃ) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখেছি যখন তিনি তাকবীরে তাহরীমা দিতেন তখনই অর্থাৎ তাকবীরের সাথে সাথেই দু'টি হাত কাঁধ বরাবর তুলতেন। (বুখারী, মিশকাত ৭৫ পৃঃ)

ওয়ায়িল ইবনে হজর (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি নাবী রসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখেছেন যে, নামায শুরু কালে তিনি প্রথমে দুই হাত কান পর্যন্ত তুলতেন। তারপর তাকবীর (তাহরীমা) দিতেন। (আবু দাউদ, মিশকাত ৭৬ পৃঃ)

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল বলেন, কাঁধ বরাবর হাত তোলা হাদীসের বর্ণনাকারীর সংখ্যা বেশী- (আল-মুগনী ১ম খণ্ড ৪৭০ পৃঃ)। আল্লামা আবদুল ওয়াহ্‌হাব সাদ্‌রী বলেন, আল্লাহর রসূল বেশীর ভাগ কাঁধ বরাবর হাত তুলেছেন এবং কানের তুলনায় কাঁধ পর্যন্ত হাদীসগুলো বেশী সহীহ- (হিদায়াতুন নাবী ৩২ পৃঃ)।

মওলানা রুহুল আমীন (রহঃ) বলেন, নামাযের নিয়্যাত করে দুই হাত উঠিয়ে দু'টি বৃদ্ধ আঙ্গুল দ্বারা দুই কানের লতি স্পর্শ করবে- (নামায শিক্ষা ১১৬ পৃষ্ঠা ৭ম সংস্করণ)। কিন্তু আল্লামা আবদুল হাই লাক্কৌভী হানাফী বলেন, তাকবীরে তাহরীমার সময় কানের লতি পর্যন্ত ছোঁয়ানো সুনাত নয় কারণ এর কোন প্রমাণই নেই- (শারহে বিকা-য়াহা ১ম খণ্ড ১৪৩ পৃষ্ঠা ১১ নং টীকা)।

হাফিয ইবনুল কাইয়িম বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ হাত তোলার সময় আঙ্গুলগুলো খোলা রাখতেন এবং হাতের তালু কেবলার দিকে করতেন- (যা-দুল মা-আদ ১ম খণ্ড ৫১ পৃষ্ঠা)। আর পায়ের আঙ্গুলগুলোও কিবলার দিকে মুখ করে রাখতেন- (বুখারী ৫৬ পৃষ্ঠা)।

## হাত কোথায় বাঁধতে হবে

নামাযে হাত কোথায় বাঁধতে হবে এ সম্পর্কে আলিমদের মধ্যে ৩টি মত প্রচলিত আছে- (১) নাভির নীচে, (২) নাভির উপরে বুকের নীচে, (৩) বুকের উপরে। নাভির নীচে হাত বাঁধা সম্পর্কে ৪টি হাদীস এসেছে : (১) আবু জুহায়ফার রিওয়াযাত দারাকুতনী, বায়হাকী ও মুসনাদে আহমাদে, (২) আবু হুরায়রার রিওয়াযাত আবু দাউদে, (৩) ইবনে আবী শায়বার রিওয়াযাত তদীয় মুসান্নাফে এবং ইবনে হায়মের রিওয়াযাত মুহাদ্দাতে। ১নং ও ২নং হাদীসের সনদে আব্দুর রহমান ইবনে ইসহাক ওয়াসিতী নামক একজন রাবী আছেন যাকে ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল, ইমাম বুখারী, ইমাম বায়হাকী, ইমাম আবু হাতিম, ইমাম ইবনে মাজিন এবং ইমাম নববী শায়ফী প্রমুখ সবাই যরীফ বলেছেন। (নাসবুর রা-য়াহ ১ম খণ্ড ৩১৪ পৃঃ)

৩নং হাদীস সম্পর্কে আল্লামা শায়খ মুহাম্মদ হায়াত সিদ্ধী হানাফী ফাতহুল গাফুর পুস্তিকায় লিখেছেন যে, “তাহতাস সুররাহ” (নাভির নীচে) শব্দটি ইবনে আবী শায়বার আসল গ্রন্থে নেই। ৪র্থ রিওয়াযাতটির সনদ অজ্ঞাত। এছাড়াও হানাফীরা দু'জন তাবিয়ীর দু'টি রিওয়াযাত পেশ করেন। কিন্তু তাবিয়ীদের ঐ

রিওয়াযাত দু'টি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সহীহ মরফু রিওয়াযাতের খেলাফ বলে বাতিল ও অগ্রহণযোগ্য। (মিরআত ১ম খণ্ড, ৫৫৮ পৃষ্ঠা)

হানাফী মাযহাবের মহাবিধান আল্লামা আইনী বলেন, নাভির নীচে হাত বাঁধা হাদীসটির সনদ রসূলুল্লাহ ﷺ পর্যন্ত বিত্ত্বক নয়। এটা 'আলী (রাঃ)-এর উক্তি এবং 'আলী (রাঃ) থেকে ঐ বর্ণনার মধ্যে গোলমাল আছে। কারণ ওর সনদে আব্দুর রহমান ইবনে ইসহাক কুফী আছেন, যাকে ইমাম আহমাদ বলেন, লোকটি একেবারে বাজে এবং অস্বীকৃত। (উমদাতুল কারী ৫ম খণ্ড ২৭৯ পৃঃ)

হিদায়ার ব্যাখ্যাকার আল্লামা ইবনুল হুমাম হানাফী বলেন, ইমাম নবভী বলেছেন, আবু দাউদ ও মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত হাদীসটি যয়ীফ হবার ব্যাপারে সবাই একমত— (ফাতহুল কাদীর ১ম খণ্ড ১১৭ পৃষ্ঠা, মিশকাত ১ম খণ্ড ৫০১ পৃষ্ঠা, কাবীরী ২৯৪ পৃষ্ঠা)। ঐ হিদায়ারই এক টীকাকার আল্লামা আব্দুল হাই লখনভী হানাফী বলেন, ঐ হাদীসটি দোষে পরিপূর্ণ যা যয়ীফ হবার কারণে ওয়ায়িল ইবনে হুজুর বর্ণিত (বুকে হাত বাঁধা) হাদীসের মোকাবেলায় প্রত্যাখ্যানযোগ্য— (হিদায়া ১ম খণ্ড, ৮৬ পৃষ্ঠার ২৩ নং টীকা)।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানীপথী হানাফীর ওস্তাদ আল্লামা মাযহার জানে জানা মুজাদ্দিদী হানাফী বুকে হাত বাঁধা হাদীসটিকে প্রাধান্য দিতেন এবং তিনি নিজেও বুকে হাত বাঁধতেন— (আইনুল হিদায়া ১ম খণ্ডের ভূমিকা, ১১৬ পৃষ্ঠা)। অতএব নাভির নীচে হাত বাঁধার হাদীস দলীলের অযোগ্য। তাই হানাফী ছাড়া বাকি তিন মাযহাবের লোক নাভির নীচে হাত বাঁধে না।

নাভির উপরে বা বুকের নীচে হাত বাঁধার সম্পর্কে একটি হাদীসও রসূলুল্লাহ ﷺ থেকে পাওয়া যায় না। এ ব্যাপারে আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত একটি রিওয়াযাত উল্লেখ করা হয়। কিন্তু 'আলী ও ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে “ফাসলি লিরব্বিকা ওয়ানহার” এর তাফসীরে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতে নামাযে বুকের উপর হাত বাঁধার হুকুম দিয়েছেন— (তাফসীর মাআ-লিমুত তানযীল, বোম্বাই ছাপা ৯৯৭ পৃষ্ঠা, তাফসীরে খাযিন ৭ম খণ্ড ২৫৪ পৃষ্ঠা ও তাফসীরে কাবীর ৮ম খণ্ড ৫০২ পৃষ্ঠা)। অতএব নাভির ওপরে বা বুকের নীচে হাত বাঁধার মতটাও প্রত্যাখ্যানযোগ্য।

বুকের উপর হাত বাঁধা সম্পর্কে ৪টি হাদীস পাওয়া যায়। (১) ওয়ায়িল ইবনে হজ্র বলেন, আমি নাবী ﷺ-এর সাথে নামায পড়েছি। তিনি তাঁর ডান হাতটি বাম হাতের ওপরে রেখে বুকের উপরে হাত বাঁধেন— (ইবনে খুয়ানমা ১ম খণ্ড ২৪৩ পৃষ্ঠা, বুল্গল মারাম ২০ পৃষ্ঠা, মুসনাদে বায্‌যার, নাসবুর রায়াহ ১ম খণ্ড ৩১৬ পৃষ্ঠার টীকা)। এ হাদীসটি সহীহ হওয়ার ব্যাপারে কারো কোন মতভেদ নেই।

দ্বিতীয় হাদীস তাউস থেকে বর্ণিত— (মারাসারে আবু দাউদ ৬ পৃঃ)। তৃতীয় হাদীস হুন্ব সাহাবী থেকে বর্ণিত— (মুসনাদে আহমাদ ৫ম খণ্ড ২২৬ পৃঃ)। এবং চতুর্থ রিওয়ায়াত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত হয়েছে— (তাকসীরে ইবনে আবী হাতিম বায়হাকী ২য় খণ্ড ৩১ পৃষ্ঠা)।

## হাত বাঁধায় নারী-পুরুষে কোন পার্থক্য নেই

হাত বাঁধা সম্পর্কে ৩টি মতবাদের কথা উল্লেখ করা হলো। ঐ তিনটি মতবাদ অনুসারে যারা যেটার ওপরে আমল করবেন তাদের নারী ও পুরুষের আমল একই প্রকার হবে। যেমন আহলে হাদীস, শাফিয়ী, হাম্বলী ও মালিকী সবেই নারী ও পুরুষ উভয়েই বুকে হাত বাঁধে। সেই অনুসারে হানাফী নারীদের তাদের মাযহাব অনুযায়ী নাভির নীচে হাত বাঁধা উচিত। কিন্তু হানাফী পুরুষদের নাভির নীচে হাত বাঁধা এবং ঐ হানাফী নারীদের বুকে হাত বাঁধার কথা আব্দাহর রসূল ﷺ কিংবা সাহাবীদের কোন হাদীসেই পাওয়া যায় না— (মিরআত ১ম খণ্ড ৫৫৮ পৃষ্ঠা)। সুতরাং এরূপ করা মনগড়া ব্যাপার নয় কি? মাওলানা রুহুল আমীন (রহঃ) বলেন, জীলোকে বুকের উপর ডান হাতের তালুকে বাম হাতের উপর রাখিবেন— (নামায শিক্ষা ১১৬ পৃষ্ঠা)।

হানাফী ফিকহের টীকাটিপ্পনী লেখায় ভারতে হানাফীদের অধিতীয় আলিম আব্দামা 'আব্দুল হাই লাক্কৌতী বলেন, মেয়েদের বুকে হাত বাঁধা সম্পর্কে কোন হাদীসই আমার চোখে পড়েনি। (ফাতওয়া আব্দুল হাই মুবাওয়াব ২০২ পৃষ্ঠা)

এ কারণেই মনে হয় হানাফী ফিকহের মাসআলাগুলোর প্রমাণে হাদীস পেশকারী দুই হানাফী মনীযী আব্দামা ইব্রাহীম হালাবী ও আব্দামা মোল্লা আলী কারী হানাফী তাঁদের গ্রন্থ গুন্যাতুল মুত্তামলী ও শারহে নিকায়াহতে কোন হাদীসই পেশ করতে পারেননি।

## হাতের উপরে হাত কিভাবে থাকবে

হাতের উপরে হাত কিভাবে থাকবে এ সম্পর্কে কয়েক রকম হাদীস পাওয়া যায়। যেমন আব্দুল্লাহর রসূল ﷺ ডান হাতটা বাম হাতের তালুর পিঠ ও কবজির উপর রাখতেন— (আহমাদ, আবু দাউদ, নাসায়ী)। (২) আব্দুল্লাহর নাবী বাম হাতটি ডান হাত দিয়ে মুঠো করে ধরতেন— (নাসায়ী, তিরমিযী, ইবনে মাজা)। (৩) আব্দুল্লাহর রসূল ﷺ ডান হাতটা বাম হাতের তালু, কজি ও কিছু বাড়তি অংশের উপর রেখেছিলেন— (আহমাদ, আবু দাউদ, মিরআত ১ম খণ্ড ৫৫৬ পৃষ্ঠা)।

উল্লিখিত হাদীস তিনটি প্রমাণ করে যে, আব্দুল্লাহর রসূল ﷺ বিভিন্ন সময়ে উপরোক্ত তিন রকমভাবে হাতের উপরে হাত রাখতেন। সুতরাং আপনারাও ঐ তিনভাবে হাত রাখতে পারেন। তবে ঐ ব্যাপারে যত হাদীস পাওয়া যায় সবগুলোর মধ্যে সবচেয়ে সহীহ ও জোরদার হাদীস হল ঃ সাহল ইবনে সা'দ (রাঃ) বলেন, (রসূলুল্লাহর তরফ থেকে) লোকদেরকে ডান হাতটা বাম যেরা বা গজ-হাতের উপর রাখবার হুকুম দেয়া হতো। (বুখারী, মিশকাত ৭৫ পৃষ্ঠা)

এ হাদীসটি কওলী বা বাচনিক এবং উপরের হাদীসগুলো ফেলী বা আমলকৃত। সমস্ত মুহাদ্দিসীনে কিরামের ঐকমত্যের ফাতওয়া হল এ যে, একটি বিষয়ে যখন কওলী ও ফেলী, দু'রকম হাদীস পাওয়া যাবে তখন কওলী হাদীস প্রাধান্য পাবে। আব্দামা আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী হানাফী বলেন, অধিকাংশ হাদীস বিশারদের মতে সহীহুল বুখারী অন্য সমস্ত হাদীস গ্রন্থের তুলনায় প্রাধান্য পাবে। (মিশকাতের মুকাদ্দামা ৭ম পৃষ্ঠা, নুখবাতুল ফিকর ২৮ পৃষ্ঠা)

তাই সবার উপরে প্রাধান্য প্রাপ্ত বুখারীর এ রিওয়ায়াতটি প্রমাণ করে যে, হাত বৃকে বাঁধতে হবে। কারণ, যেরা বা গজ হাতের উপর গজ-হাত রেখে যদি তাহরিমা নাভির নীচে বা নাভির ঠিক উপরটায় বাঁধা যায় তাহলে পিঠটা কুঁজো হয়ে যাবে। কিন্তু যদি সীনার উপরে গজ-হাতের উপর গজ-হাত রেখে তাহরিমা বাঁধা হয় তাহলে ঠিক তার প্রমাণ হল ইবনে খুযায়মার ঐ রিওয়ায়াতটি যাতে “আলা সাদরিহী” বা সীনার উপর শব্দটি আছে। (সহীহ ইবনে খুযায়মা ১ম খণ্ড ২৪৩ পৃঃ)

উপরে বর্ণনা করা হয়েছে যে, আব্দুল্লাহর রসূল ﷺ কখনো বাম হাতের উপর ডান হাত রাখতেন, কখনো ডান হাত দিয়ে বাম হাতটি মুঠো করে ধরতেন। সেজন্য বাম গজ-হাতের উপর ডান গজ-হাত রাখবার সময় ডান হাতের বুড়ো ও

কড়ে আঙ্গুল দিয়ে বাম হাতটিকে বেড় দিয়ে ধরে ডান হাতের বাকি তিনটি আঙ্গুল অর্থাৎ শাহাদত, মধ্যমা, অনামিকা আঙ্গুলগুলো যদি বাম গজ্জ-হাতের উপর কনুইয়ের কাছাকাছি বিছিয়ে রাখা হয় তাহলে “ধরা ও রাখা” দু’রকম রিওয়াযাতের উপর আমল হয়ে যায়। একমাত্র হানাফী ছাড়া শাফিয়ী, হাম্বলী ও মালিকীরাও আহলে হাদীসদের মত এ হাদীসের উপর আমল করে বুকের উপর হাত বাঁধে। মুওয়াত্তা ইবনে মালিকের ৫৬ পৃষ্ঠায় বাম যেরার উপর ডান হাত রাখার হাদীস বর্ণিত আছে। সেজন্য ইমাম মালিকও বুকে হাত বাঁধতেন।

কিন্তু খলিফা মনসুর একদা ইমাম মালিককে মারধোর করে তাঁর হাত দু’টো অবশ করে দেয়ায় শেষ জীবনে তিনি হাত বাঁধতে পারতেন না বলে হাত ছেড়ে নামায পড়তেন। তাই কিছু মালিকী, মুওয়াত্তা ইমাম মালিকে বর্ণিত রসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীস অনুযায়ী বুকে হাত না বেঁধে ইমাম মালিকের অক্ষম অবস্থার অন্ধ তাকলীদে হাত ছেড়ে নামায পড়েন। এটা তাদের মনগড়া ফাতওয়া, অন্যথায় হাত ছেড়ে নামায পড়ার প্রমাণে কোন সহীহ হাদীসই পাওয়া যায় না।

দু’টি মওকুফ হাদীসে আছে যে, হাসান, মুগীরা এবং ইবনে যুবারর নাকি হাত ছেড়ে নামায পড়তেন— (মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বা ১ম খণ্ড ৩৯১ পৃঃ)। এ হাদীস দু’টি অত্যন্ত যয়ীফ এবং সহীহ মরফু হাদীসের বিপরীত। তাই পরিত্যাজ্য ও দলীলের অযোগ্য। রাফিযীরা হাত ছেড়ে নামায পড়ে— (ফাতহুল কাদীর ১ম খণ্ড ১১৭ পৃঃ)।

## নামাযের অবস্থায় দৃষ্টিপাতের জায়গা

কোন নামাযী নামাযে দাঁড়ালে তার দৃষ্টি কোথায় থাকবে? সে সম্পর্কে মহানবী ﷺ বলেন, হে আনাস! যেখানে তুমি সিজদা দেবে সেই জায়গাতেই তোমার দৃষ্টি রাখ। (বায়হাকী ২য় খণ্ড ২৮৪ পৃষ্ঠা, মিশকাত ৯১ পৃষ্ঠা, মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বা ২য় খণ্ড ২৬০-২৬১ পৃষ্ঠা)

হানাফী মতে নামাযে দাঁড়ানো অবস্থায় সিজদার জায়গায়, রুকুতে দুই পায়ে উপর, সিজদায় নাকের উপর এবং আস্তাহিয়াতু পড়ার সময় কোলের উপর নয়র থাকবে। (নিহায়াহ শারহি হিদায়াহ, মিশকাত ২য় খণ্ড ৩৬ পৃষ্ঠা)

আল্লামা 'উবায়দুল্লাহ রহমানী সাহেব বলেন, পূর্বোক্ত নিহায়াহ গ্রন্থ লেখক নামাযীর দৃষ্টিপাত সম্পর্কে যে বিশদ বিবরণ দিয়েছেন তার কোন প্রমাণ আমি রসূলুল্লাহ ﷺ কিংবা সাহাবীদের কোন হাদীসে পেলাম না। (মিরআতুল মাফাতীহ ২য় খণ্ড ১৫ পৃঃ)

অর্থাৎ উক্ত হাদীসে কেবল দাঁড়ানো অবস্থায় দৃষ্টিপাতের উল্লেখ আছে। বাকি জায়গাগুলোয় দৃষ্টিপাতের কথা হানাফী ফকীহদের বিবেকসম্মত কথা। একটি দুর্বল সূত্রে হাদীসে আছে তোমরা কেউ নামাযে দাঁড়ানো অবস্থায় চোখ বুজবে না। (তাবারানী, মাযমাউয যাওয়া-য়িদ ২য় খণ্ড ৮৩ পৃষ্ঠা)

## হাত বাঁধার পর কী পড়তে হবে

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ তাকবীরে তাহরীমা বলার পর কিরাআতের আগে একটু চুপ থাকতেন। তাই আমি তাঁকে এ চুপ থাকার কারণ জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, তখন আমি এ দু'আটি পড়ি :

اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ  
- اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنْقَى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ - اللَّهُمَّ  
اغْسِلْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالْثَّلَجِ وَالْبَرْدِ.

বাংলা উচ্চারণ : আল্লাহ্ম্মা বা-ইদ বায়নী ওয়াবায়না খাতা ইয়া-ইয়া কামা বা-আত্তা বায়নালা মাশরিকি ওয়ালা মাগরিবি, আল্লা-হ্ম্মা নাক্বিনী মিনাল খাতা-ইয়া কামা ইউনাঙ্কাস সাওবুল আব্বায়ায় মিনাদ দানাসি আল্লা-হ্ম্মাগসিল খাতা-ইয়া-ইয়া বিলমা-য়ি ওয়াস্-সালজ ওয়াল্-বারাদি। (বুখারী, মুসলিম, বুলগল মারাম ২০ পৃষ্ঠা, মিশকাত ৭৭ পৃষ্ঠা)

তরজমা : হে আল্লাহ! তুমি আমার ও আমার গুনাহসমূহের মধ্যে ততটা দূরত্ব সৃষ্টি করে দাও যতটা পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে তুমি করে রেখেছ। হে আল্লাহ! তুমি আমাকে পাপরাশি থেকে ঐরূপ পাক সাফ করে দাও যেমন সাদা কাপড় ময়লা থেকে পাক সাফ হয়। হে আল্লাহ! তুমি আমার পাপগুলো পানি দিয়ে, বরফ দিয়ে ও শিলাবৃষ্টি দিয়ে ধুয়ে দাও।



এ দু'আটিকে দু'আয়ে ইসতিফতাহ ও সানা বলে। এ সানা ছাড়া হাদীসে আরো ছয় রকম সানার উল্লেখ পাওয়া যায়। সব সানাগুলো সম্পর্কে আল্লামা আবদুল ওয়াহ্‌হাব সাদরী (রহঃ) বলেন : সমস্ত সানার মধ্যে এ সানাটি সবচেয়ে বেশী সহীহ ও জোরদার এবং অধিক আমলকৃত। সমস্ত মুহাদ্দিসীনে কিরাম তাকবীরে তাহরীমার পর এ সানা পড়তেন এবং অপরকে পড়াতেন। এরপরে “ওয়াজ্জাহতু ওয়াজ্জিয়া লিল্লাযী ফাতারাস সামাওয়াতি ওয়ালআরযা হানীফা ..... ওয়ালা” সানাটির স্থান। (হিদায়াতুন নাবী ৩৬ ও ৪৫ পৃষ্ঠা)

ইমাম নওয়াব সিদ্দীক হাসান খান বলেন, বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত এ সানাটি বহু সাহাবী কর্তৃক বর্ণিত মুতাওয়াতিহ হাদীস। তাই আহলে হাদীস এবং মালিকী ও হাম্বলীরা এ সানাটি পড়ে। শাফিয়ীরা মুসলিমে বর্ণিত হাদীস ওয়াজ্জাহতু ওয়াজ্জিয়া লিল্লাযী .... সানাটি পড়ে এবং হানাফীরা সুবহানাকাল্লাহুমা ..... গায়রুকা সানাটি পড়ে। এ শেষ সানার হাদীসটি রসূলুল্লাহর মরফু হাদীস নয়। বরং ‘আয়িশা (রাঃ)-এর মওকুফ হাদীস, যা বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত মরফু হাদীসের তুলনায় অতি দুর্বল হাদীস— (বায়লুল মানফাআহ ২৬)। হাফিয ইবনে হাজার আসকালানী (রহঃ) বলেন, মুসলিমে বর্ণিত এ সানার হাদীসটির সূত্র ছিল এবং দারাকুতনীর হাদীসটি রসূলুল্লাহর নয়, বরং সাহাবীদের মওকুফ হাদীস— (বুলগল মারাম ২০ পৃঃ)।

আল্লামা ইবনুল হুমাম হানাফী ও আল্লামা ইব্রাহীম হালাবী হানাফী বলেন, সুবহানাকাল্লা-হুমা ..... সানার হাদীসটি ইমাম তিরমিযী ও ইমাম আবু দাউদের মতে যরীফ এবং ‘আল্লা-হুমা ..... বা-‘ইদ বায়নী ..... সানার হাদীসটি সবচেয়ে বেশী সহীহ। (ফাতহুল কাদীর ১ম খণ্ড ১১৮ পৃষ্ঠা ও কাবীর ২৯৪-২৯৫ পৃষ্ঠা)

## আ‘উযুবিল্লা-হ পাঠ

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে মরফুভাবে বর্ণিত, তিনি (ﷺ) তাকবীরে তাহরীমার পর পড়তেন :

أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ هَمَزِهِ وَنَفْثِهِ وَنَفْسِهِ.

উদ্ধারণ : আ'উযুবিল্লা-হিস সামী'ইল 'আলীম মিনাশ্ শায়তানির রাজীম মিন হামযিহী ওয়ানাফযিহী ওয়ানাফসিহী ।

তরজমা : আমি বিতাড়িত শয়তানের ষোঁচা, ফুৎকার ও প্ররোচনা হতে জ্ঞানী শ্রবণকারী আল্লাহর আশ্রয় চাচ্ছি । (সুনানে আরবাআহ, আহমাদ, বুলুগুল মারাম ২০ পৃঃ)

নোট : ফরয, সুন্নাত ও নফল প্রভৃতি সব রকম নামাযের কেবলমাত্র প্রথম রাক'আতে নাবী ﷺ সানা ও আ'উযুবিল্লাহ পড়তেন, অন্য রাক'আতগুলোতে পড়তেন না । (মুসলিম, মিশকাত ৭৮ পৃষ্ঠা)

## বিসমিল্লাহ পাঠ

নু'আইম আল-মুজ্জের বলেন, আমি একদা আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর পিছনে নামায পড়লাম । তিনি প্রথমে 'বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম' পড়লেন, তারপর সূরা ফাতিহা পাঠ করেন ..... পরিশেষে সালাম ফিরে বললেন, যাঁর হাতে আমার জ্ঞান আছে তাঁর কসম! আমি তোমাদের মধ্যে রসূলুল্লাহর নামাযের সবচেয়ে বেশী সাদৃশ্য পেশকারী । (নাসায়ী, ইবনে খুযায়মা, বুলুগুল মারাম ১০ পৃষ্ঠা)

রসূলুল্লাহ ﷺ কখনো 'বিসমিল্লাহ' উচ্চৈঃস্বরে পড়তেন, আবার কখনো নীরবে পড়তেন । তবে বেশীর ভাগ নীরবে পড়তেন- (যাদুল মাআদ ১ম খণ্ড ৫২ পৃষ্ঠা) । সুতরাং দু'রকমই পড়া চলে । প্রত্যেক নামাযে ও প্রত্যেক রাক'আতে সূরা ফাতেহার আগে এবং তারপরে অন্য সূরার আগে 'বিসমিল্লাহ' অবশ্যই পড়তে হবে । কারণ রসূলুল্লাহ ﷺ আবু হুরায়রাকে বলেন, যখন তোমরা সূরা ফাতিহা পড়বে তখন 'বিসমিল্লা-হির রাহমা-নির রহীম'ও পড়বে । কারণ এটা ওর একটি আয়াত- (দারাকুতনী, বুলুগুল মারাম ২১ পৃষ্ঠা) ।

## সূরা ফাতিহা পাঠের বিবরণ

উপরে দু'টি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহর রসূল ﷺ সানা, আ'উযুবিল্লাহ ও বিসমিল্লাহ পাঠের পর সূরা ফাতিহা পড়তেন । শুধু তাই নয় তিনি এও বলেছেন, যে ব্যক্তি সূরা ফাতিহা পড়ে না তার নামাযই হয় না- (বুখারী ও মুসলিম) । তিনি বলেন, সে নামায পুরো হয় না যাতে সূরা ফাতিহা পড়া হয় না-

(ইবনে হিব্বান ও দারাকুতনী)। একদা নাবী ﷺ সাহাবীদেরকে জিজ্ঞেস করেন, মনে হয় তোমরা তোমাদের ইমামের পিছনে সূরা ফাতেহা পড় কি? হাদীসটির রাবী 'উবাদাহ ইবনে সামিত (রাঃ) বলেন, আমরা বললাম, হাঁ। রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমরা সূরা ফাতেহা ছাড়া আর কিছুই পড় না। কারণ তার নামাযই হয় না যে এটা পড়ে না- (আহমাদ, আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে হিব্বান, বুলুগল মারাম ২০ পৃষ্ঠা, দারাকুতনী, বায়হাকী, হাকিম, তালখীসুল হাবীর ৮৭ পৃষ্ঠা)।

সূরা ফাতেহা পাঠের বর্ণনা সিহাহ সিন্তাহ ছাড়াও সহীহ ইবনে খুযায়মা, সহীহ ইবনে হিব্বান, তাবারানী, মুসনাদে আবু ইয়্যালা, বায়হাকী ও তাহাভী প্রভৃতিতে বহু হাদীস পাওয়া যায়। তাই মুহাদিস সম্রাট ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেন, নামাযে সূরা ফাতেহা পড়ার হাদীসটি রসূলুল্লাহ ﷺ থেকে (বহু বর্ণনাকারী কর্তৃক) মুতাওয়াতির সূত্রে চলে আসছে যে, সূরা ফাতেহা ছাড়া কোন নামাযই হয় না- (জুয'উল কিরাআত ৪ পৃষ্ঠা)। এ ব্যাপারে তিনি একখানি বইও লিখেছেন।

## হানাফী পীর ও আলিমদের সূরা ফাতেহা পাঠের ফাতওয়া এবং আমল

মওলানা সাইয়িদ আবদুল হাই হানাফী বলেন : আল্লামা কিরমানী সিয়াকুল ওলামা গ্রন্থে লিখেছেন যে, খাজা নিযামুদ্দীন আউলিয়া হানাফী ছিলেন। তথাপি তিনি তাঁর ভক্তদেরকে ইমামের পেছনে সূরা ফাতেহা পড়ার প্রস্তাব করতেন এবং তিনি নিজেও তা মনে মনে পড়তেন। তাঁর সাখীদেরকে কেউ এ হাদীস- “কেউ যদি ইমামের পেছনে সূরা ফাতেহা পড়ে তার মুখে আশুন দেয়া হবে”- পেশ করে তাঁর বিরুদ্ধে আপত্তি করলে জওয়াবে তিনি বলেন : সহীহ হাদীসে আছে যে, সূরা ফাতেহা ছাড়া কোন নামাযই হয় না। অতএব (আশুন দেয়া) প্রথম হাদীসটি ধমক এবং দ্বিতীয়টি নামায বাতিল হওয়া প্রমাণ করে। আমি ধমককে সহ্য করতে পছন্দ করি, কিন্তু আমার নামায বাতিল হওয়াটা বরদাস্ত করতে পারি না। (নুয'হাতুল খাওয়াতির ১২৬ পৃষ্ঠা)

ফাতওয়া আলমগীরী য়ারা লেখেন তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদিস দেহলভীর পিতা শাহ আবদুর রহীম হানাফী (রহঃ)। ইনি মুখে

আশুন দেয়ার জাল হাদীসটির প্রতিবাদে বলেন, কিয়ামতের দিনে যদি আমার মুখে আশুন দেয়া হয় তা আমার নিকট “তোমার নামাযই হয়নি” বলার চেয়ে উত্তম— (ইমামুল কালা ২০ পৃষ্ঠা)। ইনি ইমামের পেছনে এবং জানাযায় সূরা ফাতিহা পড়তেন— (আনফাসুল আ-রিফীন ফারসী ৬৯ পৃষ্ঠা)।

মুজাদ্দিদ আলফে সা-নী আল্লামা শায়খ সারহিন্দী (রহঃ) ইমামের পেছনে সূরা ফাতিহা পড়তেন এবং তা পছন্দনীয় মনে করতেন। (যুবদাতুল মাঝা-মাত ২০৯ পৃষ্ঠা)

আল্লামা শাহ আবদুল আযীয মুহাদ্দিস দেহলভী হানাফী বলেন, সাহাবায়ি কিরাম নাবী ﷺ-এর অনুসরণে সূরা ফাতিহা পড়তেন। রসূলুল্লাহ ﷺ সূরা ফাতিহা পড়তে কখনো মানা করেননি। অতএব উচিত হল সমস্ত মুফাসসির এবং মুহাদ্দিসের অনুকরণে ইমামের পেছনে মুজাদ্দির সূরা ফাতিহা পড়া। কারণ, সূরা ফাতিহা না পড়লে তার আমল সহীহ হাদীসের খেলাফ হবে। এখন থাকলো ইমাম আবু হানীফার ফাতওয়া। তাতে আশ্চর্যের কী আছে? কারণ এ হাদীসটি বিস্তুদ্ধ সূত্রে তাঁর কাছে হয়ত পৌঁছেনি। কিন্তু শত শত নয় বরং হাজার হাজার গবেষক, উলামা যেমন ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম প্রমুখের নিকট এ হাদীসটি সহীহ প্রমাণিত হয়েছে। তাই সূরা ফাতিহা ছেড়ে দেয়া তিরস্কার যোগ্য এবং অভিশাপের কারণ হবে। (ফাতওয়া খানদানে ওয়ালিউল্লাহ ১৯২৮ সংস্করণ)

বাদশাহ আলমগীরের ওস্তাদ এবং হানাফী উসূলে ফিকহ গ্রন্থ নূরুল আনওয়ারের লেখক আল্লামা মোল্লা জীয়ন বলেন, হানাফী সুফী এবং বড় বড় আলেমগণ মুজাদ্দির জন্য সূরা ফাতিহা পড়া পছন্দ করতেন, যেমন ইমাম মুহাম্মাদ সতর্কতা অবলম্বন হিসেবে এটাকে পছন্দনীয় মনে করতেন। (তাফসীরে আহমাদী ২৮১ পৃষ্ঠা)

দিল্লীর বিখ্যাত হানাফী পীর মির্খা মাযহার জানে জা-নাঁ ইমামের পেছনে সূরা ফাতিহা পড়ার ফাতওয়া দেন এবং তিনি নিজেও তাই করতেন— (তিকসার ১১৩ পৃষ্ঠা, মামুলাতে মাযহারিয়াহ)। লাক্ষৌয়ের মির্খা হাসান আলী হানাফীও ঐরূপ ফাতওয়া দেন এবং তিনি হানাফী মাযহাবেরই কিতাব থেকে ইমামের পেছনে সূরা

---

\* হানাফী পীরদের সূরা ফাতিহা পাঠের আমল শিরোনামের অধীন অধিকাংশ বরাত কর্ণাটক রাজ্যের বাঙ্গালোরের চার মিনার মাসজিদের ইমাম মাওলানা হাফিয আব্দুল মাতীন সাহেব রচিত ‘হাদীসে নামায’ নামক গল্প থেকে সংকলিত-লেখক।

ফাতিহা পড়ার প্রমাণে এক পুস্তিকাও লেখেন— (মিসকুল খিতাম শারহে বুলুগল মারাম ১ম খণ্ড ২১৯ পৃঃ)।

মাওলানা 'আব্দুল হাই লাক্কৌভী বলেন, কোন হাদীসে এ কথা বর্ণিত নেই যে, তোমরা ইমামের পেছনে সূরা ফাতিহা পড় না, কিংবা রসূলুল্লাহ ﷺ নিষেধ করেছেন ইমামের পেছনে সূরা ফাতিহা পড়তে। তাছাড়া হানাফীদের দলীলে এমন কোন হাদীসই নেই যাতে ইমামের পেছনে সূরা ফাতিহা পড়তে স্পষ্ট নিষেধের প্রমাণ আছে। যেমন বিরোধী পক্ষের কাছে এমন হাদীস রয়েছে যা ইমামের পিছনে মুক্তাদীদের সূরা ফাতিহা পড়া প্রমাণ করে। যেমন এ হাদীস-তোমরা সূরা ফাতিহা ছাড়া আর কিছুই পড় না। (গায়সুল গামা-ম ১৫৪ পৃষ্ঠা)

তিনি আরো বলেন, কোন সহীহ মারফু হাদীসেই ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পড়া নিষেধ নেই এবং এ ব্যাপারে তারা (হানাফীদের) যেসব হাদীস উল্লেখ করেছেন তা হয় ভিত্তিহীন ও জাল, নতুবা সহীহ নয়। যেমন ইবনে হিব্বানের কিতাবুয্ যুআফায় বর্ণিত মুখে আঙুন ভরার হাদীস (আত্-তালীকুল মুমাজ্জাদ আল-মুওয়াত্তা মুহাম্মাদ ১০১ পৃঃ ১ নং টীকা)।

দেওবন্দী হানাফীদের মতে যিনি ভারতের ইমাম বুখারী সেই আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী বলেন, আবু হানীফা (রহঃ) ইমামের পেছনে সূরা ফাতিহা পড়তে মানা করেননি, যদিও সূরা ফাতিহা না পড়া তাঁর আমল ছিল। (ফাসসুল খিতাব)

আল্লামা শা'রানী বলেন, ইমাম আবু হানীফা এবং ইমাম মুহাম্মাদ (রহঃ) থেকে ইমামের পিছনে মুক্তাদীর সূরা ফাতিহা না পড়া এবং পড়া দু'রকমই প্রচলিত ছিল। পরিশেষে তারা দু'জনই তাদের প্রথম উক্তি 'না পড়া' থেকে শেষ উক্তি পড়ার দিকে সতর্কতামূলক হিসেবে রুজু করেন। (গায়সুল গামাম ইমামুল কালা-ম সহ ১৫৬-১৫৭ পৃঃ)

উপরে বর্ণিত রসূলুল্লাহ ﷺ-এর স্পষ্ট ও সহীহ হাদীস সামনে রেখে এবং যাদের ফাতওয়ার ভিত্তিতে মাযহাবপন্থী ভাইয়েরা ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পড়া আপত্তিকর মনে করেন সেই ইমামদের শেষ জীবনে তাদের ফাতওয়া প্রত্যাহার করার খবর জেনে এবং তাদের মাযহাবেরই খোদাতীক পীর ও গবেষক আলিমদের ফাতওয়া পাওয়া সত্ত্বেও যারা আজও ইমামের পেছনে সূরা ফাতিহা পড়ে না তারা

কাল-কিয়ামতের ময়দানে আল্লাহর সামনে কী জওয়াব দেবেন? তারা ঠাণ্ডা মাথায় বিষয়টি একটু চিন্তা ভাবনা করবেন কি? আল্লাহ আমাদের সুমতি দিন- আমীন।

সুতরাং ইমাম হোক বা মুক্তাদী প্রত্যেককেই প্রত্যেক নামাযের রাক'আতেই সূরা ফাতিহা পড়তে হবে। সাধক চুড়ামণি 'আব্দুল কাদির জীলানী বলেন, নামাযে ফাতিহা পড়া ফরয। এটা নামাযের এমন একটা স্তম্ভ যা ছেড়ে দিলে নামায বাতিল হয়ে যায়। (গুনইয়াতুত তালিবীন লাহোর ছাপা ৭৩ পৃঃ, দিল্লী ছাপা ৫৩ পৃঃ)

### সূরা ফাতিহা এই :

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ \* الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ \* مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ \*  
اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ \* اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ \* صِرَاطَ الَّذِيْنَ  
اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ \* غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ \* اٰمِيْنَ

উচ্চারণ : আল্‌হামদু লিল্লা-হি রাব্বিল 'আ-লামীন। আর-রহমানির রাহীম। মা-লিকি ইয়াওমদ্দীন। ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাসতাঈন। ইহ্‌দিনাস সিরাতাল মুত্তাকীম। সিরাতাল লায়ীনা আন্ 'আম্‌তা 'আলাইহিম। গায়রিল মাগযুবি 'আলাইহিম ওয়ালায্-যল্লীন। আমীন।

অর্থ : সব রকম প্রশংসা একমাত্র সেই আল্লাহরই প্রাপ্য যিনি বিশ্বজগতের প্রতিপালক। (যিনি) পরম করুণাময় অসীম দয়াময়। (যিনি) প্রতিফল দিনের একমাত্র প্রভু। (উক্ত গুণসম্পন্ন আল্লাহ গো) আমরা তোমারই উপাসনা করি এবং কেবল তোমারই কাছে সব রকম সাহায্য প্রার্থনা করি। তুমি আমাদের সোজা পথে চালাও। সেসব লোকদের পথ যাদেরকে তুমি পুরস্কার দিয়েছ। যারা (তোমার) রাগের পাত্র নয় এবং পথভ্রষ্টও নয়।

বিখ্যাত হানাকী ফকীহ আব্দামা কাযী খান বলেন, যদি কেউ 'যল্লীন- শব্দটির প্রথম অক্ষর (যোয়াদ এর বদলে) যো পড়ে তাহলে নামায নষ্ট হবে না। কিন্তু দা-ল দিয়ে 'দল্লীন' পড়লে তার নামায নষ্ট হয়ে যাবে। (ফাতওয়া কাযী খান ১ম খণ্ড ৭০ পৃষ্ঠা)।

## আমীনের অর্থ এবং মাহাত্ম্য

ইবনে 'আব্বাস (রাঃ) বলেন, একদা আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল ﷺ! আমীনের অর্থ কী? তিনি বললেন, প্রভু গো! এটা করে দাও। অধিকাংশ আলিম বলেন, এর অর্থ কবুল কর। (তাকসীর ইবনে কাসীর ১ম খণ্ড ৩২ পৃষ্ঠা)

অন্য এক বর্ণনায় রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আমীন হল রাব্বুল 'আলামীনের মোহর, তাঁর মু'মিন বান্দাদের জন্য। নাবী ﷺ আরো বলেন, নামাযে এবং দু'আর সময় আমাকে আমীন দান করা হয়েছে। আমার আগে এটা কাউকে দান করা হয়নি। তবে মুসা (আঃ) দু'আ করতেন এবং হারুন (আঃ) আমীন বলতেন। অতএব তোমরা আমীন দিয়ে দু'আ শেষ কর। তাহলে আল্লাহ নিশ্চয়ই তোমাদের দু'আ কবুল করবেন। (ঐ পৃষ্ঠা ৩২)


রসূলুল্লাহ ﷺ যখন সূরা ফাতিহা পড়া শেষ করতেন তখন আমীন বলতেন। যদি তাঁর কিরাআত জোরে হত তাহলে তিনি আমীন জোরে বলতেন এবং তাঁর পিছনে যারা থাকতেন তারাও আমীন বলতেন— (যাদুল মাআদ ১ম খণ্ড ৫২ পৃষ্ঠা)। ওয়ায়িল ইবনে হযর বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে 'গায়রিল মাগযুবি 'আলায়হিম ওয়ালায-যন্নীন' পড়ে উচ্চৈঃস্বরে আমীন বলতে শুনেছি— (তিরমিযী, আবু দাউদ, দারিমী, ইবনে মাজাহ, মিশকাত ৮০ পৃষ্ঠা)। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ যখন বলতেন 'গায়রিল মাগযুবি 'আলায়হিম ওয়ালায-যন্নীন' তখন বলতেন আমীন। এমনকি প্রথম কাতারের লোক তা শুনতে পেত। ফলে মাসজিদ গুল্লরিত হত— (ইবনে মাজাহ ৬২ পৃষ্ঠা ও আবু দাউদ ১ম খণ্ড ১৩৫ পৃষ্ঠা)। এক নারী সাহাবী উম্মে হুসায়ন বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর পেছনে নামায পড়ি। অতঃপর যখন তিনি 'ওয়ালায-যন্নীন' বলেন, তখন বলেন, আমীন। আমি তা শুনতে পাই। তখন আমি মেয়েদের কাতারে ছিলাম— (মুসনাদে ইসহাক ইবনে রাহুওয়ায়হি, নাসবুর রায়াহ ১ম খণ্ড ৩৭১ পৃষ্ঠা)।

শুধু তাই নয়, তিনি মুক্তাদীদেরকেও বলেন, ইমাম যখন আমীন বলে তখন তোমরাও আমীন বল। কারণ যার আমীন ফেরেশতাদের আমীনের মোতাবেক হয় তারে আগের শুনাই মাফ হয়ে যায়— (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৭৯ পৃষ্ঠা)। অন্য বর্ণনায় আছে যে, তোমাদের কেউ যখন আমীন বলে তখন ফেরেশতারাও আকাশে

আমীন বলে- (বুখারী ১০৮ পৃষ্ঠা)। ইবনে যুবায়ের ও তাঁর মুক্তাদীগণ এত জোরে আমীন বলতেন যে, মদীনার মাসজিদে নববী গমগম করে উঠতো- (বুখারী ১০৭ পৃষ্ঠা)।

ইমাম আবু হানীফার ওস্তাদ আতা ইবনে রিবাহ তাবিয়ী বলেন, আমি এ মাসজিদুল কাবায় দু'শো সাহাবীকে এমন অবস্থায় পেয়েছি যে, ইমাম যখন 'ওয়ালায্ য-ল্লীন' বলেন তখন আমি তাদের আমীনের প্রতিনিধি শুনেছি- (বায়হাকী ২য় খণ্ড ৫৯ পৃঃ, আইনী ৬ষ্ঠ খণ্ড ৪৮ পৃঃ, ফাতহুল বারী ২য় খণ্ড ২৬৭ পৃঃ ও ইবনে হিব্বান ১৮৯ পৃঃ)। তখন থেকে আজ পর্যন্ত আল্লাহর ঘর কাবা এবং রসূলুল্লাহর মাসজিদ আমীনের আওয়াজে গমগম করছে। হাজীদের জিজ্ঞেস করুন।

ইমাম শাওকানী (রহঃ) নাসায়ী, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, মুসনাদে আহমাদ, তাবারানী, সহীহ আবু আওয়ানা, মুসনাদে শাফিয়ী ও ইবনে আবী হাতিম প্রভৃতি থেকে সতেরটি হাদীস এবং সাহাবীদের তিনটি আ-সা-র বর্ণনা করে উচ্চৈঃস্বরে আমীন বলা প্রমাণ করেছেন। (নায়লুল আওতার ২য় খণ্ড ১১৫ পৃষ্ঠা)

অন্য দিকে আল্লামা আব্দুল হাই লাক্কোভী হানাফী (রহঃ) মুসনাদে আহমাদ, আবু দাউদ, তিরমিযী, তাবারানী, দারাকুতনী ও হাকিম প্রভৃতি থেকে কতিপয় হাদীস দ্বারা নীরবে আমীন বলা প্রমাণ করার পর মন্তব্য করেন যে, হাদীসের সমস্ত হাফিজগণ এ বিষয়ে একমত যে, ঐ সমস্ত হাদীসগুলোর সূত্রে দোষ আছে। অতএব সঠিক মাসআলা হল উচ্চৈঃস্বরে আমীন বলা। যার প্রমাণ বহু সূত্রে রসূলুল্লাহ  থেকে আছে। ঐ সনদগুলো জোরদার হবার ব্যাপারে আমাদের কিছু হানাফী মনীযী যেমন ইবনুল হুমাম ফাতহুল কাদীরে এবং তাঁর ছাত্র ইবনে আমীরুল হাজ হিলয়্যাতুল মুহাল্লী শারহে মুনয়্যাতুল মুসাল্লীতে ইঙ্গিত করেছেন। (শারহে অকায়াহ ১৪৬ পৃষ্ঠা ১নং টীকা)

তিনি অন্যত্র বলেন, ইনসাফ হল এ যে, দলীলের দিক দিয়ে উচ্চৈঃস্বরে আমীন বলার হাদীসগুলো জোরদার বেশী। (মুওয়াত্তা ইমাম মুহাম্মাদ ১০৫ পৃষ্ঠা ৯ নং টীকা)



## আমীন শুনে ইয়াহুদীদের জ্বলন

আল্লামা সুযুতী ‘জামিউল জাওয়ামিআ’ গ্রন্থে বা-বুল মাহদী ও বাবুল ই‘তিসাম বিল কিতাব ওয়াস্‌সুন্নাহ অধ্যায়ে আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন যাতে আছে, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আমার উম্মাতের কিছু লোক এমন হবে যারা লোকদেরকে তাদের আলিম ও পীরদের দিকে ডাকবে এবং তারা সেই মোতাবেক আমল করবে, আর তারা মুসলমানদের উপর হিংসা করবে ইমামের পিছনে আমীন বলার জন্য, যেমন তোমাদের উপর ইয়াহুদীরা হিংসা করে ঐ ব্যাপারে। সাবধান! ওরা হল এ উম্মাতের ইয়াহুদী। সাবধান, ওরা হল এ উম্মাতের ইয়াহুদী। (ইবনুস সাকান, ইবনুল কাত্তান, যাহরাতু রিয়াযিল আবরার ১১০ পৃষ্ঠা ও হসূলুল মারাম ২০ পৃষ্ঠা)

‘আয়িশা (রাঃ) ও ইবনে ‘আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নাবী ﷺ বলেন, তোমাদের সালাম করা ও আমীন বলাতে ইয়াহুদীদের যত হিংসা হয় আর কোন জিনিসে ওদের অত হিংসা হয় না— (সহীহ ইবনে খুযায়মা ১ম খণ্ড ২২৮ পৃষ্ঠা, মুসনাদে আহমাদ ৬ষ্ঠ খণ্ড ১৩৫ পৃঃ)। অতএব তোমরা খুব বেশী করে আমীন বল— (ইবনে মাজাহ ৬২ পৃঃ, মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক ২য় খণ্ড ৯৮ পৃষ্ঠা)। অন্য বর্ণনায় আছে, ইমামের পেছনে ফরয নামাযে আমীন বললে মুসলমানদের উপর ইয়াহুদীদের হিংসা হয়— (তাবারানী আওসাত, মাজমাউয যাওয়ায়িদ ১ম খণ্ড ১৮৬ পৃষ্ঠা)। তাহলে উচ্চৈঃস্বরে আমীন শুনে যাদের রাগ ও হিংসা হয় তারা কি মুসলমান, না ইয়াহুদী?

এ হাদীসটি সম্পর্কে আল্লামা সিন্ধী হানাফী বলেন, ইসনা-দুহ সহীহন ওয়ারিজা-লুহ সিকা-তুন, অর্থাৎ হাদীসটির সনদ সঠিক এবং ওর রাবীগুলো নির্ভরযোগ্য— (মিসরী ছাপা ইবনে মাজাহ ১৪৫ পৃষ্ঠা)। যেসব নামাযের কিরাআত উচ্চৈঃস্বরে পড়া হয় সেসব নামাযে ইমাম ও মুক্তাদী উভয়েরই নীরবে আমীন বলা সম্পর্কে বাহরুল উলুম আল্লামা আব্দুল আলী হানাফী বলেন “লাম ইউরওয়া ফীহি ইল্লা-মা-রওয়াল হা-কিমু ওয়াহওয়া যয়ীফুন জিদ্দা” অর্থাৎ নীরবে আমীন বলা সম্পর্কে মুসতাদরকে হাকিমে বর্ণিত একটি মাত্র হাদীস ছাড়া আর কোন হাদীসই পাওয়া যায় না। কিন্তু ঐ একটি মাত্র হাদীসও অতি দুর্বল— (আরকানে আরবাতাহ, মসনুন নামায শিক্ষা, ৭৬ পৃষ্ঠা)।

আল্লামা আব্দুর রহমান মুবারকপুরী (রহঃ) বলেন, নীরবে আমীন বলার প্রমাণে কোন সাহাবী থেকে কোন মওকুফ হাদীসও পাওয়া যায় না- (তুহফাতুল আহওয়ায়ী ১ম খণ্ড ২০৯ পৃষ্ঠা)। তাছাড়া উচ্চৈঃস্বরে আমীন বলার বিরুদ্ধেও কোন সাহাবীর কোন ফাতওয়া পাওয়া যায় না। সুতরাং এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে, সমস্ত সাহাবায়ে কিরাম উচ্চৈঃস্বরে আমীন বলতেন- (সলাতুল মুস্তফা ১১০ পৃষ্ঠা)। তাই ইমাম তিরমিযী বলেন, সাহাবায়ে কিরাম ও তাবিয়ী এবং তাদের পরবর্তী আলিমগণ এ অভিমত দিয়েছেন যে, আমীন উচ্চৈঃস্বরে বলতে হবে, নীরবে নয়- (তিরমিযী ১ম খণ্ড ৩৪ পৃষ্ঠা)। এজন্য আহলে হাদীস, শাফিযী, হাম্বলী ও মালিকীরা উচ্চৈঃস্বরে আমীন বলেন। ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) বলেন, ইমামের পেছনে মুক্তাদীরা আমীন বলবে, কিন্তু ইমাম নিজে আমীন বলবে না- (মুওয়াত্তা মুহাম্মাদ ১০৫ পৃঃ)। অথচ সহীহ হাদীসে আছে যে, ইমামও আমীন বলবে- (আবু দাউদ, নাসায়ী, ফাতহুল বারী ২য় খণ্ড ২৬৪ পৃষ্ঠা)। কিছু হাদীসে আছে যে, ইমাম আমীন বলার পরই তোমরা আমীন বলবে এবং কিছু বর্ণনায় আছে যে, ইমাম যখন 'ওয়ালাহু য-ল্লীন' বলবে তখন তোমরা 'আমীন' বলবে। এ উভয় প্রকার বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায় যে, ইমামের সূরা ফাতিহা পাঠের শেষে আমীন বলার আগে কিংবা পরে মুক্তাদীরা আমীন বলতে পারে। তবে উভয়ের মাঝে সামঞ্জস্য বিধান করে জমহুর (অধিকাংশ) আলিম বলেন, ইমাম ও মুক্তাদীর এক সাথে আমীন বলা শ্রেয়- (ফাতহুল বারী ২য় খণ্ড ২৬৪ পৃষ্ঠা)।

## অন্য কিরাআত বা দ্বিতীয় সূরা পাঠ

সূরা ফাতিহা পাঠ করার পর রসূলুল্লাহ ﷺ একটু দম নিতেন। তারপর বিসমিল্লাহ পড়ে একটি সূরা বা কুরআনের কিছু আয়াত পড়তেন- (সিহাহ সিত্তাহ)। যোহর, আছর, ও এশার চার রাক'আত ফরয নামায পড়ার সময় তিনি (ﷺ) শেষ দুই রাক'আতে এবং মাগরিবের ফরয নামাযের শেষ রাক'আতে সূরা ফাতিহার সাথে কখনো সূরা মেলাতেন আবার কখনো মিলাতেন না- (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৭৯ পৃষ্ঠা)।

সুতরাং এ দুই রকম করাই তাঁর সুন্নাত। তবে হাঁ যদি কেউ জাহুরী অর্থাৎ ফজর, মাগরিব ও ইশার নামাযের জামা'আতে ইমামের কিরাআত শুনতে পায়

তাহলে তাকে সূরা ফাতিহা পাঠের পর প্রথম দুই রাক'আতে অন্য সূরা মেলাতে হবে না। বরং ইমামের কিরাআত শুনেতে হবে- (মুসলিম, মিশকাত ৭৯ পৃষ্ঠা)। কিন্তু শেষ এক রাক'আতে বা দুই রাক'আতে তার ইচ্ছা, অন্য কেরাআত পড়তে পারে, আবার নাও পড়তে পারে- (বুখারী, মুসলিম, বায়হাকী ২য় খণ্ড ৬২-৬৪ পৃষ্ঠা)।

মহানাবী ﷺ প্রত্যেক আয়াতের শেষে ওয়াক্ফ করতেন অর্থাৎ দম ছেড়ে দিতেন এবং একটু টান দিয়ে পড়তেন- (যা-দুল মাআদ ১ম খণ্ড ৫২ পৃষ্ঠা)। সুতরাং যেসব ইমাম এক দমে কিংবা দু'দমে নামাযে সূরা ফাতিহা পড়ান তারা সুন্নাতের খেলাফ করেন। আল্লাহ তাদের সঠিক জ্ঞান দিন। আ-মীন।

### পাঁচ ওয়াক্তের নামাযে সুন্নাতী কিরাআত

সূরা ফাতিহা পাঠের পর নামাযে অন্য কিরাআত হিসেবে কুরআনের যে কোন জায়গা থেকে ইচ্ছামত যে কোন সূরা বা আয়াত পড়া যেতে পারে। কিন্তু মহানাবী ﷺ কোন কোন নামাযে বিশেষ সূরা পাঠ করেছেন যাকে মাসনুন কিরাআত বলে। রসুলের সুন্নাতের মুহাব্বাতে আমরাও যদি ঐ সূরাগুলো পড়ার চেষ্টা করি তাহলে হয়ত দ্বিগুণ নেকী পেতে পারি। বিভিন্ন হাদীসে যে সব মাসনুন কিরাআত পাওয়া যায় তা এখানে উল্লেখ করা হল।

### ফজরের নামাযে কিরাআত

নাবী ﷺ ফজরের নামাযে কখনো সূরা ক্বা-ফ অথবা ঐরূপ সূরা পড়তেন, কখনো “ইযাশ শামসু কুওবিরাত”, কখনো সূরা মু'মিনুনের কিছু অংশ পড়েন- (মুসলিম)। তিনি সফরে সূরা না-স ও ফালাক পড়েছেন- (আহমাদ, আবু দাউদ, নাসায়ী)। একবার তিনি দুই রাক'আতেই সূরা “ইযা-যুলযিলাতিল আরযু” পড়েন। হাদীসটির রাবী বলেন, তিনি (ﷺ) এটা ইচ্ছা করে পড়েন, না ভুলে গিয়ে পড়েন, তা আমি জানি না- (আবু দাউদ, মিশকাত ৭৯-৮১)। কখনো তিনি ১ম রাক'আতে কুলু- আ-মান্না-বিদ্লাহ ওয়ামা- উন্যিলা- ইলায়না এবং ২য় রাক'আতে সূরা আল-ইমরানের “কুল ইয়া আহলাল কিভাবে তা'আলাও ইলা কালিমাতিন সাওয়া-ন্নিম বায়নানা ওয়াবায়নাকুম” পড়েছেন- (মুসলিম)।

## জুম্ম'আর দিনে ফজরে বিশেষ কিরাআত

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ জুম্ম'আর দিন ফজর নামাযের ১ম রাক'আতে সূরা সিজদাহ ও ২য় রাক'আতে সূরা দাহর পড়তেন- (বুখারী ও মুসলিম)। ইবনে মাস'উদের হাদীসে আছে, রসূলুল্লাহ ﷺ চিরদিন এরূপ করতেন- (তাবারানী, বুল্গল মারাম ২১ পৃষ্ঠা)।

'আব্দুল্লাহ ইবনে মাস'উদ বলেন, আমি কতবার যে আল্লাহর রসূলকে ফজর এবং মাগরিবের সুন্নাতে সূরা কা-ফিরন ও সূরা ইখলাস পড়তে শুনেছি তার ইয়ত্তা নেই। (তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, মিশকাত ৮০ পৃষ্ঠা)

## যোহর ও আসরের কিরাআত

জাবির ইবনে সামুরাহ (রাঃ) বলেন, নাবী ﷺ যোহরের নামাযে সূরা "ওয়াল্লায়লি ইয়া-ইয়াগশা" এবং কখনো "সাক্বিহিসমা রাব্বিকাল আ'লা" পড়তেন। আর আসরের সময় ঐরূপই পড়তেন- (মুসলিম, মিশকাত ৭৯ পৃষ্ঠা)। কখনো 'ওয়াস্সামায়ি যা-তিল বুরুয" এবং "ওয়াস্সামায়ি- ওয়াত্-তা-রিক"ও পড়েন- (যা-দুল মাআদ ১ম খণ্ড ৫৩ পৃষ্ঠা)। কখনো তিনি যোহরের নামাযে সূরা সিজদার মত লম্বা কিরাআত পড়তেন অথবা ৩০টির মত আয়াত পড়তেন। তখন আসরের সময় এর অর্ধেক পড়তেন- (মুসলিম, মিশকাত ৭৯- পৃষ্ঠা)। কিন্তু যখন যোহরে কিরাআত খুব দীর্ঘ হতো না তখন আসরের কিরাআতও ঐরূপ হতো- (যা-দুল মাআদ ১ম খণ্ড ৫৩ পৃষ্ঠা)।

## মাগরিবের কিরাআত

মাগরিবের নামাযে কখনো তিনি (ﷺ) তুর এবং কখনো সূরা মুরসালাত পড়েছেন- (বুখারী ও মুসলিম)। কখনো সূরা দুখান পড়েছেন- (নাসায়ী, মিশকাত ৭৯-৮০, ৮২ পৃষ্ঠা)।

কখনো তিনি সূরা সাফ্ফাত, কখনো "সাক্বিহিসমা রাব্বিকাল আ'লা", কখনো সূরা তীন, কখনো সূরা নাস ও ফালাক এবং কখনো "কিসা-রি মুফাস্সাল" পড়তেন। \* (যা-দুল মাআদ ১ম খণ্ড ৫৩ পৃষ্ঠা)

\* আমপারা সূরা কাদুর থেকে সূরা না-স পর্যন্ত ১৮টি সূরাকে কিসা-রি মুফাস্সাল বলা হয়।

## বৃহস্পতিবারে মাগরিব ও এশায় বিশেষ কিরাআত

জাবির ইবনে সামুরাহ বলেন, নাবী ﷺ বৃহস্পতিবার দিবাগত মাগরিবের নামাযে সূরা কাফিরুন ও সূরা ইখলাস পড়তেন। (শারহুস সুন্নাহ, মিশকাত ৮০ পৃঃ)

নাবী ﷺ বৃহস্পতিবার দিনগত রাতে এশার নামাযে সূরা জুমু'আ ও মুনাফিকুন পড়তেন (ইবনে হিব্বান, সলাতুল রসূল ২০১ পৃষ্ঠা)।

## এশার কিরাআত

বারা (রাঃ) বলেন, আমি নাবী ﷺ-কে এশার নামাযে সূরা 'ওয়াত্তীনি ওয়ায্‌যাতুন' পড়তে শুনেছি। (বুখারী, মুসলিম)

একদা মু'আয ইবনে জাবাল (রাঃ) এশার নামাযে সূরা বাকারা পড়ায় একজন সাহাবী বিরক্ত হয়ে নামায ছেড়ে দেন এবং একা একা নামায পড়ে নেন। তারপর তিনি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে ঐ লম্বা কিরাআতের অভিযোগ করলে নাবী রসূলুল্লাহ ﷺ মু'আযকে বলেন, তুমি কি লোকদেরকে কিতনায় ফেলবে? তুমি এশার নামাযে 'ওয়ালশামসি ওয়ায্‌যুহা-হা ওয়াল্লায়লি ইয়া-ইয়াগশা' এবং "সাববি হিসমা রাব্বিকাল আ'লা" পড়বে। (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৭৯ পৃষ্ঠা)

## রসূলুল্লাহ ﷺ সাধারণ কিরাআত ও তার বৈশিষ্ট্য

'আমর ইবনে ও'আইব ও তাঁর পিতা থেকে, তিনি তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করে বলেন, মুফাস্সালের এমন কোন ছোট ও বড় সূরা নেই যা আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে ফরয নামাযে ইমামতি করা অবস্থায় পড়তে শুনি। (মুওয়াত্তা ইমাম মালিক, মিশকাত ৮২ পৃষ্ঠা)

২৬ পারার সূরা হুজুরাত থেকে সূরা না-স পর্যন্ত সমস্ত সূরাগুলোকে মোফাস্সাল বলে। এতে মোট ৬৬টি সূরা আছে। এগুলো ৩ ভাগে বিভক্ত : (১) তিওয়ালে মুফাস্সাল তা হল সূরা হুজুরাত থেকে সূরা বুরুজ পর্যন্ত ৩৭টি সূরা, (২) আওসাতি মুফাস্সাল তা হল সূরা তারিক থেকে সূরা বাইয়িনাহ পর্যন্ত ১১টি সূরা (৩) কিসা-রি মুফাস্সাল তা হল সূরা কাদর থেকে সূরা না-স পর্যন্ত ১৮টি সূরা।

নাবী ﷺ যে কোন সূরা সম্পূর্ণ পড়তেন। কখনো তিনি ১টি সূরাকে দু'রাক'আতেও পড়তেন। কখনো তিনি সূরার শুরু দিকে পড়েছেন। কিন্তু সূরার শেষ দিকে বা মাঝখানে পড়েছেন এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। একই রাক'আতে দু'টি সূরা এক সাথে তিনি কখনো কখনো নফল নামাযে পড়েছেন। কিন্তু ফরয নামাযে এরূপ কোন প্রমাণ নেই। ইবনে মাস'উদের হাদীসে দু'টি করে সূরা পড়ার যে কথা আছে তাতে ফরয ও নফলের কোন উল্লেখ নেই। সব নামাযেই দ্বিতীয় রাক'আতের তুলনায় তাঁর (রসূলুল্লাহ ﷺ-এর) প্রথম রাক'আতটি একটু লম্বা হতো এবং ফজরের নামায অন্য সমস্ত নামাযের চেয়ে একটু বেশী লম্বা হতো। (যা-দুল মায়াদ ১ম খণ্ড ৫৪-৫৫ পৃষ্ঠা)

মদীনার কুবর মাসজিদে এক আনসারী সাহাবী ইমামতি করার সময় যখনই কোন সূরা পড়তেন তখন তার আগে তিনি সূরা এখলাস পড়তেন। এ ব্যাপারটি লোকেরা নাবী ﷺ-কে জানালে তিনি তাকে এর কারণ জিজ্ঞেস করেন। তিনি বলেন, আমি এটাকে ভালবাসি। অতঃপর নাবী ﷺ বলেন, সূরা ইখলাসকে তোমার ভালবাসা, তোমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে। (বুখারী, ১০৭ পৃষ্ঠা)। এ হাদীস প্রমাণ করে যে, কেউ যদি ফরয নামাযে দু'টি সূরা পড়তে চায় সে পড়তে পারে। এটা এক সাহাবীর সুন্নাত। যা রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাত নয় তবে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর অনুমোদিত।

## কুরআনের বিন্যাস অনুযায়ী নামাযের কিরাআত অপরিহার্য কি না?

একদা এক তাবিয়ী আহনাফ ইবনে কায়স প্রথম রাক'আতে (১৫ পারার) সূরা কাহফ এবং দ্বিতীয় রাক'আতে (১২ পারার) সূরা ইউসুফ কিংবা (১১ পারার) সূরা ইউনুস পড়েন এবং তিনি এও উল্লেখ করেন যে, 'উমর (রাঃ)-এর সাথে একবার তিনি ফজরের নামাযে ঐ সূরা দু'টোই পড়েছিলেন। (বুখারী ১০৭ পৃষ্ঠা)

এ হাদীস এবং এর আগে বর্ণিত হাদীস প্রমাণ করে যে, কেউ যদি এক সূরা ১ম রাক'আতে পড়ার পর ২য় রাক'আতে তার পরবর্তী সূরাসমূহের মধ্যে কোন সূরা না পড়ে বরং তার আগের সূরা পড়ে, যাতে কুরআনের বিন্যাসের বিপরীত হয় তাতে নামায নষ্ট হবে না। এরূপ পড়াও যেতে পারে। তবে এটা ইমাম শাফিয়ীর

মতে উত্তমের খেলাফ- (ফাতহুল বারী ২য় খণ্ড ২৫৫-২৫৭)। এবং ইমাম আহমাদের মতে আপত্তিকর নয়- (আল-মুগনী ১ম খণ্ড ৪৯৫ পৃষ্ঠা)।

আল্লামা হামাভী হানাফী বলেন, লাআ-লীতে আছে, কিরাআত পড়ার সময় কুরআনের বিন্যাস ত্যাগ করা জাযিয়, মাকরুহ নয়- (আলাআশ্বাহ আননাযায়ির, ১৩০ পৃষ্ঠা)। আল্লামা নাসাফী হানাফীর ‘মাজমাঅ’ গ্রন্থে আছে, সূরাগুলোর বিন্যাসের প্রতি লক্ষ্য রাখা নামাযের ওয়াজিব বা অপরিহার্য বিধানের মধ্যে গণ্য হয়- (যাহরাতু রিয়া-যিল আবরার ১৩৪ পৃষ্ঠা)।

## রফউল ইয়াদায়ন বা দুই হাত তোলা

আল্লাহর রসূল ﷺ যখন কিরাআত শেষ করতেন তখন একটু দম নিতেন। তারপর তিনি দুই হাত তুলতেন যেমন তাকবীরে তাহরীমার সময় তুলেছিলেন, তারপর ‘আল্লাহু আকবার’ বলে রুকুতে যেতেন- (সিহাহ সিত্তাহ, যাদুল মাআদ)। ইবনে ‘উমর (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ যখন নামায শুরু করতেন এবং যখন রুকুতে যেতেন আর যখন রুকু থেকে মাথা উঠাতেন তখন দুই হাত কাঁধ পর্যন্ত তুলতেন- (বুখারী ১০২ পৃষ্ঠা, মুসলিম ১ম খণ্ড ১৬৮ পৃষ্ঠা, নাসায়ী ১ম খণ্ড ১১৭ পৃষ্ঠা, ইবনে মাজাহ ৬২ পৃষ্ঠা, মুসনাদে আহমাদ ৫ম খণ্ড ৪২৪ পৃষ্ঠা, মুওয়াত্তা মালিক ২৫ পৃষ্ঠা, মুওয়াত্তা মুহাম্মাদ ৮৯ পৃষ্ঠা, তাহাভী ১ম খণ্ড ৯৬ ও ১০৯ পৃষ্ঠা, দারাকুতনী ১০৭-১১১ পৃষ্ঠা, সহীহ ইবনে খুযায়মা ১ম খণ্ড ২৩২ পৃষ্ঠা, মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বা ১ম ২৩৪-২৩৫ পৃষ্ঠা, মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক ২য় খণ্ড ৬৭-৬৯ পৃষ্ঠা, বায়হাকী ২য় খণ্ড ৭৩ পৃষ্ঠা, তালখীসুল হাবীর ৮২ পৃষ্ঠা, নাসবুর রায়াহ ১ম খণ্ড ৪০৭-৪০৮ পৃষ্ঠা)।

আবু হুমায়দ আস-সায়িদী বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ যখন তৃতীয় রাক‘আতের জন্য দাঁড়াতেন তখনও দুই হাত কাঁধ পর্যন্ত তুলতেন- (আবু দাউদ, দারিমী, মিশকাত ৭৫-৭৬ পৃষ্ঠা)। ইবনে ‘উমর (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ মৃত্যুকাল পর্যন্ত উল্লেখিত সময়ে দুই হাত তুলেছিলেন- (বায়হাকী, তালখীসুল হাবীর ৮১ পৃষ্ঠা ও নাসবুর রায়াহ ১ম খণ্ড ৪১০ পৃষ্ঠা, আদদিরায়াহ ৮৫ পৃষ্ঠা)।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, ভারতের হায়দারাবাদ থেকে সুনানে বায়হাকীর যে সংস্করণ ছাপা হয়েছে তাতে “ফামা-যা লাত তিলকা সলা-তুহ হাতা লাকিয়ান্নাহা

অর্থাৎ রসূলুল্লাহর (ﷺ) ঐক্য নামায মৃত্যুকাল পর্যন্ত ছিল, শব্দগুলো উঠিয়ে দেয়া হয়েছে। আল্লাহ ঐক্য চোরদের হিদায়াত দিন- আমীন। সাহাবী ওয়া-য়িল ইবনে হুজর বলেন, একদা শীতকালে আমি নাবী রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট এলাম, অতঃপর তাঁর সাহাবীদেরকে নামাযের মধ্যে কাপড়ের ভেতরে দুই হাত তুলতে দেখলাম। (আবু দাউদ ১ম খণ্ড ১০৬ পৃষ্ঠা)

রসূলুল্লাহ (ﷺ) এর প্রায় ১ লাখ ২৪ হাজার সাহাবী ছিলেন। তাদের সম্পর্কে দুনিয়ার হাফিয ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী (রহঃ) বলেন, একমাত্র ইবনে মাস'উদ (রাঃ) ছাড়া বাকি সমস্ত সাহাবায়ি কিরাম দুই হাত তুলতেন। (ফাতহুল বারী ২য় খণ্ড ২১৯ পৃষ্ঠা)

## ফেরেশতারাও দুই হাত তোলে

কেবল আল্লাহর রসূল (ﷺ) ও সাহাবায়ে কিরাম নন, বরং আসমানের ফেরেশতারাও তাদের নামাযে দুই হাত তোলে। কারণ, 'আলী (রাঃ) বলেন, আল্লাহর রসূলের উপর যখন সূরা কাওসার নাখিল হয় তখন রসূলুল্লাহ (ﷺ) জিবরাঈলকে জিজ্ঞেস করেন, “ওয়ানহার” বলে আমার রব আমাকে কিসের হুকুম দিয়েছেন? জিবরাঈল বললেন, এর মানে এ যে, যখন আপনি তাকবীরে তাহরীমা দেবেন ও রুকুতে যাবেন এবং রুকু থেকে মাথা উঠাবেন তখন দুই হাত তুলবেন- এ হুকুম দিয়েছেন। কারণ, এটাই হল আমাদের এবং সৈয়ব ফেরেশতাদের নামায যারা সাত আসমানে আছেন। তখন নাবী (ﷺ) বললেন, দুই হাত তোলা সেই বিনয় যার কথা আল্লাহ তা'আলা বলেছেন এ আয়াতে : তারা তাদের প্রভুর সামনে বিনয় প্রকাশ করে না এবং কাকুতি মিনতিও করে না। (বায়হাকী ২য় খণ্ড ৭৫-৭৬ পৃষ্ঠা, মুসতাদরাকে হাকিম ২য় খণ্ড ৫৩৮ পৃষ্ঠা, তাফসীর ফাতহুল বায়ান ১০ম খণ্ড ৩৪৮ পৃষ্ঠা)

অন্য বর্ণনায় এতটা বাড়তি আছে যে, প্রত্যেক জিনিসের একটি সৌন্দর্য আছে। তেমনি নামাযের সৌন্দর্য হল প্রত্যেক তাকবীরের সময় দুই হাত তোলা। (তাফসীর কাবীর ৮ম খণ্ড ৫০২ পৃষ্ঠা)

ইমাম বুখারী তাঁর “জুযউ রফয়িল ইয়াদায়ন” নামক গ্রন্থে লিখেছেন, হাসান ও হুমায়দ ইবনে হিলাল বলেছেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সমস্ত সাহাবী রফউল ইয়াদায়ন করতেন। তাঁর কোন সাহাবী হাত তুলতেন না বলে প্রমাণ পাওয়া যায়



না। ইমাম হাকিম বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ-এর এ সুন্নাতের ব্যাপারে জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত “আশারায়ে মুবশ্শারাহ” দশজন সাহাবী এবং তাদের পর বড় বড় সাহাবীগণও একমত ছিলেন। (তালখীসুল হাবীর ৮২ পৃষ্ঠা, নাসবুর রায়াহ ১ম খণ্ড ৪১৬ পৃষ্ঠা)

আল্লামা মাজদুদ্দীন বলেন, এ রফউল ইয়াদায়ন সম্বন্ধে চারশো সহীহ হাদীস ও আসার বর্ণিত হয়েছে- (সিফরুস সাআদাত ১৫ পৃষ্ঠা)। এজন্য ইমাম তাকীউদ্দিন সুবকী বলেন, নামাযের মধ্যে রফউল ইয়াদায়নের হাদীস এত বেশী পাওয়া যায় যে, রফউল ইয়াদায়নের হাদীসকে মুতাওয়াতার বলা ছাড়া কোন উপায়ই নেই- (জুয়উ রফউল ইয়াদায়ন)। ইমাম বুখারী ও ইমাম বায়হাকী বলেন : মক্কা, মদীনা, হিজাজ, ইয়ামান, সিরিয়া, ইরাক, বসরা ও খুরাসান প্রভৃতি দেশের লোকেরা সবাই রুকুতে যাবার সময় এবং রুকু হতে মাথা তোলার সময় দুই হাত তুলতেন- (জুয়উ বুখারী ৭ম পৃষ্ঠা ২য় খণ্ড ৭৫ পৃষ্ঠা)।

ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে নাসর মারওয়াযী বলেন, একমাত্র (ইমাম আবু হানীফার শহর) ছাড়া আর সবাই রফউল ইয়াদায়ন করে। হাফিয ইবনে হাজার আসকালানীর ওস্তাদ হাফিয আবুল ফযল রফউল ইয়াদায়নের হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীদের সংখ্যা তন্ন তন্ন করে খুঁজে মোট পঞ্চাশ জন পেয়েছেন। মালিক থেকে বর্ণিত, ইবনে উমর (রাঃ) যখন কাউকে রুকুতে যাবার সময় এবং রুকু হতে মাথা তোলার সময় দুই হাত না তুলতে দেখতেন তখন তাকে পাথর ছুঁড়ে মারতেন- (ফাতহুল বারী ২য় খণ্ড ২১৯-২২০ পৃষ্ঠা, তালখীসুল হাবীর ৮২ পৃষ্ঠা, আল মুগনী ১ম খণ্ড ৪৯৮ পৃষ্ঠা)। ইমাম হাকিম বলেন, আমরা নাবী ﷺ থেকে বর্ণিত এমন কোন সুন্নাতের কথা জানি না যে ব্যাপারে চার খলীফা, তারপর বিভিন্ন শহরের বহু বড় বড় সাহাবীগণ একমত হয়েছেন এ সুন্নাত ছাড়া- (নাসবুর রায়াহ ১ম খণ্ড ৪১৭-৪১৮ পৃষ্ঠা)।

উপরোল্লিখিত গুরুত্বের কারণে মালিকী, শাফিয়ী ও হাম্বলী মাযহাবপন্থীরা এবং কুরআন ও হাদীসের নির্ভেজাল সত্যের অনুসারী আহলে হাদীসরা পূর্বে বর্ণিত তিন সময়ে দুই হাত তোলেন।

আল্লাহর রসূল ﷺ এক রাক'আত নামাযে ৩ বার, দু'রাক'আত নামাযে ৫ বার, তিন রাক'আত নামাযে ৮ বার, চার রাক'আত নামাযে ১০ বার দুই হাত কাঁধ পর্যন্ত বা কান পর্যন্ত তুলতেন।

## দুই হাত না তোলা হাদীস বাতিল

ইবনে মাস'উদ (রাঃ) বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ কেবলমাত্র তাকবীরে তাহরীমা দেবার সময় স্রেক ১বার দুই হাত তুলতেন (আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী, মিশকাত ৭৭ পৃষ্ঠা)। হানাফীগণ এ হাদীসটির উপর আমল করে।

কিন্তু এ হাদীস সম্পর্কে ইমাম আবু দাউদ বলেন, হাদীসটি সহীহ নয় (মিশকাত ৭৭ পৃষ্ঠা)। তেমনি মোত্তা আলী কারী হানাফীও বলেন, মিনহা আহাদীসু মানুয়ি রফয়িল য্যাদায়েনে ফিসসলাতে ইনদার রুকুয়ে অররফয়ে মিনহু কুল্লুহা বা-তিলাতুন লা ইয়াসেহ্ শাইয়ুন কাহাদীসে ইবনে মাসউদিন।

অর্থাৎ নামায়ে রুকুতে যাবার সময় এবং রুকু থেকে উঠার সময় দুই হাত না তোলা সম্পর্কে যে সব হাদীস বর্ণিত হয়েছে সেগুলো সবই বাতিল হাদীস। তন্মধ্যে একটিও সহীহ নয় যেমন ইবনে মাস'উদের হাদীস। (মউযুআতে কাবীর ১১০ পৃঃ)

## দুই হাত তোলা সম্পর্কে হানাফী ফাতাওয়া

আল্লামা আইনী হানাফী রুকুতে যাবার আগে দুই হাত তোলার ব্যাপারে ইমাম আবু হানীফা সম্পর্কে লিখেছেন যে, ইমাম আবু হানীফা থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তা ত্যাগ করলে গুনাহ হবে। (উমদাতুল কারী, দারুল ফিকর ছাপা ৫ম খণ্ড ২৭২ পৃঃ)

দ্বিতীয় আবু হানীফা আল্লামা ইবনে নুজাইম বলেন, রুকুতে যাবার সময় এবং রুকু থেকে মাথা তোলার সময় দুই হাত তুললে নামায বরবাদ হবার কথা যা মক্হুল নাসাফী ইমাম আবু হানীফা থেকে বর্ণনা করেছেন তা বিরল বর্ণনা, যা রিওয়ায়াত ও দিরায়াত অর্থ বর্ণনাসূত্রঃ ও জ্ঞানতঃ ঠিক নয়। (বাহরি রায়িক ১ম খণ্ড ৩১৫ পৃষ্ঠা, যাহরাতু রিয়া-যিল আবরার ৮৯ পৃষ্ঠা)

আল্লামা শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী (রহঃ) বলেন, হাত তোলার হাদীস আমার কাছে অধিক পছন্দনীয়, হাত না তোলার চেয়ে। কারণ, তোলার হাদীসগুলো সংখ্যায় বেশী এবং অধিক প্রমাণিত—(হজ্জাতুল্লা হিল বালিগাহ ২য় খণ্ড ১০ পৃষ্ঠা)। আল্লামা সানাউল্লাহ পানীপথী বলেন, অধিকাংশ ফকীহ ও মুহাদ্দিস দুই হাত তোলাকে সুন্নাত প্রমাণ করেছেন—(মালা-বুদ্দা মিনহু, উর্দু তরজমা ২৭ পৃঃ)।

আল্লামা আব্দুল হাই লাক্কোভী বলেন, নাবী ﷺ থেকে ওর প্রমাণ বহু এবং প্রাধান্যযোগ্য। আর ইহা মনসুখ বা নাকচ হবার দাবী যা তাহাজী, ইবনুল হুমাম, আইনী প্রমুখ আমাদের দলের মনীষীদের তরফ থেকে প্রচারিত হয়েছে, তা এমনই প্রমাণহীন যে তদ্বারা রোগী নিরোগ হয় না এবং তৃষ্ণার্তও তৃপ্ত হয় না।

(আততালীকুল মুমাজ্জাদ ৯১ পৃষ্ঠা)

আল্লামা আবুল হাসান সিন্ধী মাদানী হানাফী বলেন, যারা এ কথা বলে যে, তাকবীরে তাহরীমা ছাড়া রুকুতে যাবার সময় এবং রুকু থেকে মাথা তোলার সময় দুই হাত তোলার হাদীস মনসুখ ও রহিত তাদের ঐ দাবী বেদলীল ও ভিত্তিহীন (মিসরী ছাপা ইবনে মাজাহ ১ম খণ্ড ১৪৬ পৃষ্ঠার টীকা)।

দেওবন্দের শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদুল হাসান বলেন, রফউল ইয়াদায়ন মানসুখ নয়। কিন্তু তার স্থায়িত্ব প্রমাণিত নেই— (ঈয়া-হুল আদিলাহ, রাসূলে আকরাম কী নামায ৬৭ পৃষ্ঠা)। আগে আল্লামা যায়লায়ী হানাফীর বরাত দিয়ে প্রমাণ করা হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ ﷺ রফউল ইয়াদায়ন মৃত্যুকাল পর্যন্ত করেছিলেন— (নাসবুর রায়াহ ১ম খণ্ড ৪১০ পৃষ্ঠা)।

দেওবন্দী হানাফীদের মধ্যে ভারতের অতুলনীয় মুহাদ্দিস আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী বলেন, এ কথা জানা উচিত যে, হাত তোলার হাদীস সূত্র ও আমলের দিক দিয়ে মুতাওয়াতির। এতে কোন সন্দেহ নেই। এটা মনসুখও নয় এবং এর একটি হরফও নাকচ নয়। কথা আছে কেবল উত্তম হওয়ার ব্যাপারে। (নায়লুল ফারকাদায়ন ২২ পৃষ্ঠা, রাসূলে আকরাম কী নামায ৬৯ পৃষ্ঠা)

ইবনে মাস'উদ (রাঃ) বলেন, আমি নাবী ﷺ এবং আবু বাক্বর (রাঃ) ও 'উমর (রাঃ)-এর সাথে নামায পড়েছি। কিন্তু তারা নামায শুরু করবার সময় ছাড়া তাদের দুই হাত আর তোলেননি— (মুসতাদরক হাকিম)। আল্লামা সুযুতী বলেন, এ হাদীসটি জাল— (আললাআ-লিল মাসনূআহ ফিল আহাদীসিল মউযুআহ ২য় খণ্ড ১৯ পৃষ্ঠা)।

উক্ত শব্দে এ হাদীসটিই দারাকুতনী ও ইবনে আদীতেও বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু ইমাম ইবনুল জাওয়যী ঐ দু'টো হাদীসকেই তদীয় জাল হাদীস গ্রন্থ 'মউযুআ-তির মধ্যে উল্লেখ করেছেন। এর বিপরীতে আল্লামা সুযুতী “আল আযহা-রুল মুতানা-সিরাহ ফিল আখবা-রিল মুতাওয়াতিরাহ” পুস্তিকায় উল্লেখ করেছেন যে,

হাত তোলার হাদীসটি নাবী ﷺ থেকে মুতাওয়া-তির। (আততা'লীকা-তুস সালাফিয়াহ আলান নাসায়ী ১ম খণ্ড ১০৩ পৃষ্ঠা, দিরাসা-তুল লাবীব ১৬৯ পৃষ্ঠা)

রুকুতে যাবার কালে এবং রুকু থেকে মাথা তোলার সময় দুই হাত না তোলার ব্যাপারে ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম আওয়ায়ীর এক বিতর্কের বর্ণনা অনেকে দিয়েছেন— (ফাতহুল কাদীর ১ম খণ্ড ২১৯ পৃষ্ঠা, কাবীরী ১১৬ পৃষ্ঠা)। এ বিতর্কের বর্ণনা সূত্রে তিনজন বর্ণনাকারী সূলায়মান শায়কুনী এবং হারিসী ও মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম হাদীস জাল করতেন— (আততা'হকীকুর রাসিখ ১৭৫ পৃষ্ঠা, আবু যুহরা রচিত 'হায়াতে আবু হানীফা' গ্রন্থের ৪৩৯ পৃষ্ঠার টীকা, সলাতুল মুসলিমীন ৪৬১ পৃষ্ঠা)।

হাত না তোলা সম্পর্কে কেউ কেউ এ কথা বলে থাকে যে, ইসলামের শুরু জীবনে পুতুল পূজারী নও-মুসলিম নামাযীরা নামাযের সময়ও বগলে করে পুতুল নিয়ে আসতো কিংবা মুনাফিকরা অস্ত্র নিয়ে আসতো। তাই আল্লাহর রসূল ﷺ তাদেরকে রুকুতে যাবার ও রুকু থেকে মাথা তোলার সময় দুই হাত তুলতে বলেছিলেন। এসব কথার প্রমাণে কোন হাদীস অথবা ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া যায় না। এগুলো হল হাত না-তোলা নেওলাদের গায়ের ঝাল মেটানোর কথা। আল্লাহ তাদের জ্বলন দূর করুন এবং প্রকৃত সুনাত মোতাবেক আমাদের সবাইকে আমল করার তওফীক দিন-আমীন।

## রফয়ে ইয়াদায়নের অর্থ এবং নেকী

আল্লামা রবী' ইমাম শাফি'রীকে জিজ্ঞেস করেন যে, রফয়ি ইয়াদায়নের অর্থ কী? তিনি বলেন, এটা আল্লাহর সম্মান ও তাঁর নাবীর সুনাতের অনুসরণ। (উমদাতুল কারী ৫ম খণ্ড ২৭২ পৃষ্ঠা)

ইমাম নববী বলেন, হাতের ইশারার অর্থ এ যে, নামাযী ব্যক্তি আল্লাহর বাধ্য এবং অনুগত দাস। কেউ বলেন, নামাযে ঢুকে বান্দা দুনিয়ার কার্যাবলী থেকে হাত তুলে নেয় এবং নিবিষ্ট মনে নামাযে মন দেয়। (নববী শারহে মুসলিম ১৬৮ পৃঃ)

আমার মত বলে, কার্ফুর সময় যেমন কার্ফু ভঙ্গকারী দুই হাত তুলে আত্মসমর্পণ করে তেমন নামাযী ও নামাযের প্রতি রাক'আতে একাধিকবার দুই হাত তুলে আল্লাহর সামনে বারবার আত্মসমর্পণ করে।

এর নেকী সম্পর্কে আল্লামা আইনী হানাফী লিখেছেন, ইবনে 'উমর (রাঃ) বলেন, রফয়ে ইয়াদায়ন হল নামাযের সৌন্দর্যের মধ্যে একটি শোভা। যাতে প্রত্যেক উত্তোলনের বদলে দশটি করে নেকী (অর্থাৎ) প্রত্যেক আঙ্গুলের বদলে একটি করে নেকী আছে- (উমদাতুল কারী ৫ম খণ্ড ২৭২ পৃষ্ঠা)। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, দুই হাত তোলার কারণে দু'রাক'আতে পঞ্চাশ এবং চার রাক'আতে একশো বাড়তি নেকী পাওয়া যায়। তাহলে প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্তের সতের রাক'আত ফরয নামাযে চারশো নেকী আছে, মাসের ত্রিশ দিনে বার হাজার নয়শো এবং এক বছরের নামাযে কেবল হাত তোলার নেকী এক লাখ চুয়ান্ন হাজার আটশো পাওয়া যায়।

এ হিসাব কেবল ফরয নামাযগুলোর। সুন্নাত, নফল, বিতর, তাহাজ্জুদ ও তারাবীহ প্রভৃতির সাওয়াব আলাদা, যা এ হিসেবেই পাওয়া যাবে। যারা প্রতিদিন ফরয, সুন্নাত ও নফল নামাযে দুই হাত না তুলে প্রায় হাজারখানেক নেকী থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন- আল্লামা আইনী বর্ণিত উক্ত হাদীসটি জেনে তাদের মনে কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হবে কি? আল্লাহ আমাদের হাদীস না-জানা মুফতীদের খপ্পর থেকে বাঁচান-আমীন।

### রুকু কিভাবে করতে হবে

রসূলুল্লাহ ﷺ যখন রুকু করতেন তখন দু'টো হাত দিয়ে হাঁটু দু'টো ময়বুত করে ধরতেন, পিঠটা সোজা রাখতেন- (বুখারী, মিশকাত ৭৫ পৃষ্ঠা)। তিনি পিঠটা এত সোজা রাখতেন যে, তাতে যদি পানি রাখা হোত তাহলে তা স্থির থাকতো- (ভাবারানী, কাবীর, আবু ইয়্যালা, মাজমাউয যাওয়ায়িদ ২য় খণ্ড ১২৩ পৃষ্ঠা)। মাথাটা খুব নীচুও করতেন না এবং খুব উঁচুও করতেন না, বরং কোমর ও পিঠ বরাবর রাখতেন- (মুসলিম)। হাত দু'টো পাজরা থেকে দূরে তীরের দড়ির মত সোজা করে রাখতেন- (আবু দাউদ, মিশকাত ৭৫-৭৬)। এবং আঙ্গুলগুলো ফাঁক ফাঁক করে রাখতেন- (হাকিম, বুলুগল মারাম ২২ পৃষ্ঠা)।

### রুকুর দু'আ

রুকুর দু'আ সম্পর্কিত বিভিন্ন হাদীসগুলো একত্রিত করলে জানা যাবে যে, আল্লাহর রসূল ﷺ রুকুতে প্রায় ৬ রকমের দু'আ পড়তেন। তন্মধ্যে প্রসিদ্ধ ও

অধিক প্রচলিত দু'আ এ তিনটি। ১নং দু'আ : হযায়ফা (রাঃ) বলেন, নাবী ﷺ রুকুতে পড়তেন,

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ সুবহানা রাব্বিয়াল 'আযীম।

অর্থাৎ আমি আমার মহান প্রভুর পবিত্রতা বর্ণনা করছি। (তিরমিযী, আবু দাউদ, দারিমী, মিশকাত ৮৩ পৃঃ)

ইমাম শাওকানী বলেন, এ দু'আর শেষে আবু দাউদ, দারাকুতনী, আহমাদ, তাবারানী ও হাকিম 'অবিহামদিহী' শব্দ বাড়তি আছে। কিন্তু এসব রিওয়াযাতগুলো যয়ীফ। (আততা'লীকুল মুগনী ১ম খণ্ড ১৩০ পৃঃ)

২নং দু'আ : 'আয়িশা (রাঃ) বলেন, নাবী ﷺ রুকু সিজদা (দু'টোতেই পড়তেন)

سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ

উচ্চারণ : সুব্বূহুন কুদুসুন রব্বুল মালা-য়িকাতি ওয়াবরুহ।

তরজমা : সমস্ত ফেরেশতা ও জিবরাঈলের প্রভু অত্যন্ত পুত পবিত্র। (মুসলিম, মিশকাত ৮২ পৃঃ)

৩নং দু'আ : 'আয়িশা (রাঃ) বলেন, কুরআনের (সূরা নাসর-এর) হুকুম অনুসারে নাবী ﷺ রুকু ও সিজদা (দু'টোতেই) এ দু'আ খুব বেশী করে পড়তেন,

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي.

উচ্চারণ : সুবহানাকাল্লা-হ্মা রব্বানা ওয়াবিহামদিকা আল্লা-হ্মাগ্ ফিরলী।

তরজমা : হে আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ! তোমার প্রশংসার সাথে তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করছি। (অতএব) তুমি আমাকে মাফ কর। (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৮২ পৃঃ, বুলুগুল মারাম ২১ পৃঃ)

রসূলুল্লাহর খাদিম আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ-এর রুকু ও সিজদা ১০ বার তাসবীহ পড়ার মত হতো— (আবু দাউদ, নাসায়ী, মিশকাত ৮৩ পৃঃ)। ইবনে মাস'উদ (রাঃ)-এর হাদীসে রাসূলে আকরাম ﷺ বলেছেন, যদি তোমাদের কেউ রুকুতে ৩ বার 'সুবহানা রাব্বিয়াল 'আযীম' বলে তাহলে তার রুকু পুরো হয়ে যাবে— (তিরমিযী, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ)। কিন্তু ইমাম তিরমিযী বলেন, এ হাদীসটির সনদ অবিচ্ছিন্ন নয়— (মিশকাত ৮৩ পৃঃ)।

সুতরাং ৩ বারের কম তাসবীহ পড়লে রুকু হবে না। ৩ বার সম্পর্কে ইমাম নওয়াব সিদ্দীক হাসান খান ভূপালী বলেন, যদি কেউ ৩ বার তসবীহ পড়ে তাহলে সে যেন 'সুবহানা-কা-ল্লা-ল্লা' প্রভৃতি বড় দু'আগুলো পড়ে- (আস্‌সায়েলুল জাররার, আস্‌সিরাজুল ওয়াহ্‌হাজ, হিদায়াতুন নাবী ৫৮ পৃঃ)। ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল বলেন, হাসান বাসরী থেকে একটি হাদীসে বর্ণিত আছে যে, পূর্ণ তসবীহ হল ৭ বার, মাঝামাঝি হল ৫ বার এবং সবচেয়ে কম হল ৩ বার- (কিতাবুস সলাত ১১ পৃঃ)।

### রুকু ও সিজদায় চুরি ও তার শাস্তি

নু'মান ইবনে মুররাহ বলেন, একদা রসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবীদেরকে জিজ্ঞেস করলেন কি-গো, মদখোর, ব্যভিচারী ও চোর সম্পর্কে তোমাদের মতামত কী? তারা বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রসূলই ভাল জানেন। তিনি (ﷺ) বললেন, এগুলো কাবীরা গুনাহ এবং ওর সাজাও খুব কঠিন। (এবার কান খুলে শুনে নাও) সবচেয়ে জঘন্য চুরি সেই চুরি যে ব্যক্তি নামাযে চুরি করে। সাহাবীরা জিজ্ঞেস করলেন, নামাযে চুরি কিভাবে হয় হে আল্লাহর রসূল? তিনি বলেন, যে নামাযী রুকু ও সিজদা পুরো করে না- (মালিক, আহমাদ, দারিমী, মিশকাত ৮৩ পৃঃ)।

প্রিয় পাঠক! চিন্তা করুন যে, দুনিয়ায় চুরি করলে হাত কাটা যায়, মদ খেলে কশাঘাত খেতে হয়, ব্যভিচার করলে কোড়া খেতে হয় বা সঙ্গেসার করা হয়। তাহলে ওদের চেয়ে নিকৃষ্ট নামায চোরের দশা কী হবে?

শারীক বলেন, একদা সাহাবী হুযায়ফা (রাঃ) একজনকে রুকু ও সিজদা পুরো না করতে দেখে নামায বাদ তাকে ডাকলেন। অতঃপর বললেন, তুমি তো নামায পড়নি। আমার মনে হয় এ অবস্থায় তুমি যদি মারা যাও তাহলে তুমি ঐ দীনের উপরে মরবে না যে দীন নিয়ে মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর তরফ থেকে এসেছেন।

(বুখারী, মিশকাত ৮৩ পৃঃ)

### রুকু থেকে দাঁড়ানোর পর কওমার দু'আ

রুকুর দু'আ পড়া শেষ হলে নাবী ﷺ 'سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ' 'সামি'আল্লাহ লিমান হামিদাহ' (যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রশংসা করে আল্লাহ তা শুনে থাকেন) বলে রুকু থেকে মাথা তুলতেন এবং দুই হাত কাঁধ বা কান পর্যন্ত ওঠাতেন। (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৭৫ পৃঃ)

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, আমরা যখন নাবী ﷺ-এর পেছনে নামায পড়তাম তখন তিনি 'সামি'আল্লাহ্ লিমান হামিদাহ' বললে তাঁর পেছনে যারা থাকতেন তারাও 'সামি'আল্লাহ্ লিমান হামিদাহ' বলত। (দারাকুতনী ১ম খণ্ড ১২৯ পৃঃ)

অন্য বর্ণনায় আছে, ইমাম যখন বলবে 'সামি'আল্লাহ্ লিমান হামিদাহ' তখন তোমরা বল, আল্লা-হুম্মা রব্বানা লাকাল হাম্দ- (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৮২ পৃঃ)। উক্ত দু'টি বর্ণনার ভিত্তিতে হানাফী ও মালিকী মতে ইমাম প্রথম বাক্যটি বলবে এবং মুক্তাদী দ্বিতীয় বাক্যটি বলবে- (তাহাভী ১ম খণ্ড ১১৬ পৃঃ)। কিন্তু শাফিয়ী, হাম্বলী ও অধিকাংশ আলিমের মতে ইমাম ও মুক্তাদী উভয়কেই দু'টি বাক্য বলতে হবে- (ফাতহুল বারী ২য় খণ্ড ২৮৪ পৃঃ)।

রিফাআহ ইবনে রা-ফি' (রাঃ) বলেন, একবার আমরা নাবী ﷺ-এর পিছনে নামায পড়ছিলাম। যখন তিনি রুকু থেকে মাথা তুলে "সামি'আল্লা-হ্ লিমান হামিদাহ" বললেন তখন একজন পেছন থেকে এ দু'আ পড়ল :

رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ.

উচ্চারণ : রাব্বানা ওয়ালাকাল হাম্দু হামদান কাসীরান তাইয়িবাম মুবা-রাকান ফীহি।

তরজমা : হে আমাদের পরওয়ারদিগার। তোমারই জন্যে বহু পবিত্র প্রশংসা রয়েছে যার মধ্যে বরকত নিহিত আছে।

অতঃপর তিনি (ﷺ) যখন সালাম ফিরলেন তখন জিজ্ঞেস করলেন, ঐ কথাগুলো কে বলল? লোকটি বলল, আমি। রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আমি ত্রিশের বেশী ফেরেশতাকে ছোটোছোটো করতে দেখলাম যে, ঐ কথাগুলো (নেকীর) খাতায় কে আগে লিখবে। (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৮২ পৃঃ)

বিঃ দ্রঃ এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, জামা'আতে নামায পড়ার সময় মুক্তাদীরা কওমার দু'আ উচ্চৈঃস্বরে পড়তে পারে। তবে আর কোন হাদীস দ্বারা মুক্তাদীদের কওমার দু'আ উচ্চৈঃস্বরে পড়া প্রমাণিত হয় না সেজন্য চুপে চুপে পড়া উত্তম। এ কারণেই মনে হয় দুই বাংলা ছাড়া সারা ভারত ও অন্যান্য দেশের আহলে হাদীসরা কওমার দু'আটি নীরবে পড়েন।



আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, আল্লাহর রসূল যখন রুকু থেকে মাথা তুলতেন তখন এ দু'আ পড়তেন,

اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمٰوٰتِ وَاَلْاَرْضِ وَمِثْلًا مَّا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ - اَهْلُ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ، اَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ، وَكُنَّا لَكَ عَبْدًا، {اَللّٰهُمَّ} لَا مَانِعَ لِمَا اَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ.

উচ্চারণ : আল্লা-হুমা রব্বানা- লাকাল হাম্দু মিলআস্ সামা-ওয়াতি ওয়াল আরযি ওয়ামিল্আ মা- শি'তা মিন শাইয়িম বা'দু \* আহলুস্ সানা-য়ি ওয়ালমাজ্জদি \* আহাক্কু মা- ক্বা-লাল 'আব্দু \* ওয়া-কুল্লুনা লাকা 'আব্দু \* আল্লা-হুমা লা-মা-নি'আ লিমা- আ'তায়তা ওয়ালা-মু'তিয়া লিমা- মানাআতা \* ওয়ালা-ইয়ান্ফা'উ যাল্জাদ্দি মিনকাল জাদু। (মুসলিম, মিশকাত ৮২ পৃষ্ঠা)

তরজমা : হে আমাদের প্রভু আল্লাহ! আসমান ও যমীন ভর্তি তোমার প্রশংসা এবং এর পরে তুমি যা চাও তাও ভর্তি তোমার তারীফ। হে গুণবান ও মাহাত্ম্য কীর্তনের অধিকারী। বান্দা যা বলে তুমিই তার বেশী হকদার। আমরা সবাই তোমারই বান্দা। হে আল্লাহ! তুমি যা দিয়ে থাক তার রোধকারী কেউ নেই এবং তুমি যা না দাও তা দানকারী কেউ নেই। আর কোন ধনীকে তার ধন তোমার থেকে কোন উপকার করিয়ে দিতে পারে না।

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ইমাম যখন “সামি'আল্লা-হু লিমান হামিদাহ” বলে তখন তোমরা “আল্লা-হুমা রাক্বানা লাকাল হাম্দু” (হে আমাদের প্রভু! তোমারই সমস্ত প্রশংসা) বলবে। কারণ যার এ বলাটা ফেরেশতাদের মোতাবেক হয় তার আগের গুনাহসমূহ মাফ হয়ে যায়। (মুসলিম, মিশকাত ৮২ পৃঃ)

অনেক নামাযী রুকু থেকে উঠে ভালভাবে না দাঁড়িয়ে সোজা সিজদায় চলে যায়। তাদের নামায হয় না। কারণ আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, সে লোকের নামায যথেষ্ট হয় না (কবূল হয় না), যে ব্যক্তি রুকু ও সিজদা থেকে পিঠ সোজা করে না— (আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ, দারিমী, মিশকাত ৮২ পৃঃ)। আনাস (রাঃ) বলেন, নাবী ﷺ কওমায় এত বেশীক্ষণ দাঁড়িয়ে দু'আ পড়তেন যে, আমরা

বলতাম মনে হয় তিনি ভুলে গেছেন— (মুসলিম, মিশকাত ৮২ পৃঃ)। বারা (রাঃ) বলেন, নাবী ﷺ এর রুকু ও সিজদা এবং দুই সিজদার মাঝখানে বসা ও রুকু থেকে উঠে দাঁড়িয়ে থাকা বা কওমা করা প্রায় একই রকম হতো— (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৮২ পৃঃ)।

একটু আগে আনাস (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে আপনারা জেনেছেন যে, রুকু ও সিজদাতে রসূলুল্লাহ ﷺ ১০ বার করে তাসবীহ পড়তেন। আর এ হাদীসে প্রমাণিত হচ্ছে যে, কওমা ও দুই সিজদার মাঝখানে বসায়ও তাঁর অতটা সময় লাগতো। সুতরাং কওমা ও দুই সিজদার মাঝে দশবার তাসবীহ পড়ার মত সময় দিতে হবে। রুকু থেকে উঠে কওমার দু'আ ভাল করে না পড়ে টপ করে সিজদায় পড়ে যাওয়া এবং দুই সিজদার মাঝখানে দু'আ ধীরস্থির ভাবে না পড়ে টপটাপ করে সিজদা দিলে নামায কবুল হবেই না, বরং সে নামায চোরের মধ্যে গণ্য হবে।

ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ (রহঃ) বলেন, কওমা ও দুই সিজদার মাঝখানে তাড়াতাড়ি করা বিদআতটা বানু উমাইয়াদের কতিপয় শাসকবর্গ চালু করেছেন— (যাদুল মাআদ ১ম খণ্ড ৫৬ পৃষ্ঠা)। আব্বাহ আমাদেরকে এসব বিদআত ছেড়ে দেবার এবং রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুনাত মোতাবেক আমল করার তৌফিক দিন-আমীন।

## সিজদার বিবরণ

কওমার দু'আ পড়া শেষ হলে আব্বাহর রসূল ﷺ ‘আব্বাহ আকবার’ বলে সিজদায় যেতেন। সিজদায় যাবার সময় প্রথমে তিনি দুই হাত, তারপর দুই হাঁটু মাটিতে রাখতেন— (আবু দাউদ)। আবু দাউদেরই অন্য এক হাদীসে প্রথমে দুই হাঁটু ও তারপরে দুই হাত রাখার কথা আছে। কিন্তু হাফিয় ইবনে হাজার আসকালানী বলেন, প্রথমে দুই হাত রাখা হাদীসটি বেশী সহীহ। কারণ ওর সমর্থনে ইবনে ‘উমর (রাঃ) বর্ণিত হাদীসটি পাওয়া যায়, যাকে ইবনে খুযায়মা সহীহ বলেছেন এবং ইমাম বুখারীও এটাকে মুআল্লাক ও মওকুফভাবে বর্ণনা করেছেন— (বুলুগুল মারাম ২২ পৃঃ)। হাত দু'টো কাঁধ বরাবর রাখতেন— (আবু দাউদ)। কান বরাবর রাখারও হাদীস আছে। তবে কাঁধ বরাবর হাদীসটি বেশী সহীহ, বেশী জোরদার এবং বেশী আমলকৃত— (হিদায়াতুন নাবী ৬৭ পৃষ্ঠা)।

হাত ও হাঁটুর পর তিনি নাক ও কপাল যমীনে ঠেকাতেন এবং দুই পায়ের গোড়ালি উপর দিকে তুলে পায়ের আঙ্গুলগুলো কিবলার দিকে মুখ করে রাখতেন। আঙ্গুলগুলোর মাঝখানে ফাঁক থাকতো না, বরং সবগুলো জুড়ে থাকতো- (হাকিম)। হাত দু'টো যমীন থেকে এত উঁচু করতেন যে, তাঁর বগলের সাদা অংশটা দেখা যেত- (বুখারী ও মুসলিম)। এবং একটা বকরীর বাচ্চা যদি তার ভেতর দিয়ে যেতে চাইত তাহলে সে যেতে পারত- (আবু দাউদ, মুসলিম)। বুক, পেট, ও উরু যমীন থেকে উঁচুতে রাখতেন। আর উরু দুটোর মাঝখানেও বেশ ফাঁক রাখতেন- (আবু দাউদ)। তিনি হাত দু'টোকে কুকুরের মত বিছিয়ে রাখতে এবং কাপড় ও চুল জড়োসড়ো করতে মানা করেছেন- (বুখারী, মুসলিম)। তিনি হাত দুটোকে পাজরা থেকে আলাদা রেখে কনুই দু'টো উঁচু রাখতেন- (আবু দাউদ, মিশকাত ৭৫, ৭৬, ৮৩, ৮৪ পৃঃ ও বুলুগল মারাম ২২ পৃঃ)।

আয়িশা (রাঃ) বলেন, একদা রসূলুল্লাহ ﷺ আমার সাথে বিছানায় ছিলেন। হঠাৎ আমি তাঁকে পেলাম না। অতঃপর তাকে পেলাম সিজদারত অবস্থায়। তখন তাঁর পায়ের গোড়ালি দু'টি জোড়া লাগা ছিল- (সহীহ ইবনে খুযায়মা ১ম খণ্ড ৩২৮ পৃষ্ঠা)। এবং তাঁর পায়ের আঙ্গুলের মাথাগুলো কিবলামুখী ছিল- (বায়হাকী ২য় খণ্ড ১১৬ পৃঃ)।

উক্ত হাদীসটি প্রমাণ করে যে, সিজদার সময় দু'টি গোড়ালি জুড়িয়ে রাখতে হবে। একটি বর্ণনায় আছে, আল্লাহ তা'আলা সেই বান্দার নামাযের প্রতি ক্রক্ষেপ করেন না যে ব্যক্তি নামাযে রুকু ও সিজদার সময় তার পিঠটা সোজা রাখে না- (ইবনে মাজাহ, আহমাদ, তাবারানী, কান্‌য ৭ম খণ্ড ৩২৩ পৃঃ)। তিনি (ﷺ) বলেন, যে ব্যক্তি তার নাক মাটিতে ঠেকায় না তার নামাযই হয় না- (হাকিম ১ম খণ্ড ২৭০ পৃঃ)।

### সিজদার গুরুত্ব

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, বান্দা আল্লাহর সবচেয়ে নিকটবর্তী তখনই হয় যখন সে সিজদারত অবস্থায় থাকে। সেজন্য তোমরা সিজদায় খুব বেশী করে দু'আ পড়। (মুসলিম, মিশকাত ৮৭ পৃঃ)

বান্দা যখন সিজদায় যায় তখন সে যেন তার মাথা আল্লাহর পায়ে লুটিয়ে দেয়। এখন যদি কেউ কারো পায়ে মাথা রগড়ে রগড়ে কাঁদাকাটি করে তাহলে

তার মন গলবে কিনা? সেইরূপ বান্দা যখন সিজদায় গিয়ে আল্লাহর দরবারে মাথা ঠুকতে থাকে এবং কাকুতি মিনতির সাথে দু'আর পর দু'আ পড়তে থাকে তখন তার দু'আ কবুল না হয়ে পারে কি? সেজন্য রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, তোমরা সিজদাতে দু'আ করার ব্যাপারে খুব সাধ্য সাধনা কর। কারণ সিজদাতে দু'আ কবুল হবার সম্ভাবনা খুব বেশী। (মুসলিম, মিশকাত ৮২ পৃঃ)

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আদম সন্তান যখন সিজদার আয়াত পড়ে সিজদায় যায় তখন শয়তান এক ধারে সরে যায় এবং কেঁদে কেঁদে বলে হায় আফসোস! আদম সন্তানকে সিজদার হুকুম দেয়া হয়। ফলে সে সিজদা করে জান্নাত পায়। আর আমাকে সিজদার হুকুম দেয়া হয়েছিল, কিন্তু আমি ঐ হুকুম না মানায় আমার জন্য জাহান্নামের আগুন নির্ধারিত হয়ে গেল— (মুসলিম, মিশকাত ৮৪ পৃঃ)। আল্লাহ তাআলা জাহান্নামের আগুনের উপর সিজদার জায়গাটা খাওয়া হারাম করে দিয়েছেন। তাই ঐ আগুন আদম সন্তানের সব অঙ্গ খাবে কেবলমাত্র সিজদার চিহ্ন ছাড়া— (বুখারী ১১১ পৃঃ)।

### সিজদা জান্নাতে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গ লাভের কারণ

রাবী'আহ ইবনে কা'ব বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে রাত কাটাতেম সেজন্য আমি তাঁর অযূর পানি ও অন্যান্য দরকারী জিনিস তাঁর খিদমতে এনে দিতাম। ফলে তিনি (একদিন খুশী হয়ে) আমাকে বললেন, চাও, তুমি যা ইচ্ছা চাও। তখন আমি বললাম, আমি জান্নাতে আপনার সাথী হতে চাই। তিনি বললেন এছাড়া অন্য কিছু? আমি বললাম, এটাই চাই, অন্য কিছু নয়। তিনি বললেন, তাহলে তুমি খুব বেশী সিজদা করে তোমার এ ব্যাপারে আমাকে সহায়তা কর।

(মুসলিম, মিশকাত ৮৪ পৃঃ)

উপরোল্লিখিত তিনটি হাদীস দ্বারা বোঝা যায় যে, সিজদা আল্লাহর নৈকট্য লাভের কারণ। সিজদা জান্নাত লাভের কারণ। সিজদা না করা শয়তানের জাহান্নামে যাবার কারণ। অধিক সিজদা জান্নাতে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গ লাভের কারণ এবং সিজদা দু'আ কবুল হওয়ার কারণ। একটি সিজদা জান্নাতে একটি মর্যাদা লাভের ও একটি গোনাহ মাক্ফের মাধ্যম। সেজন্য নাবী ﷺ সিজদাতে খুব বেশী করে দু'আ করতেন।

## সিজদার দু'আ

সিজদার দু'আ সম্পর্কে বিভিন্ন হাদীসগুলো একত্রিত করলে জানা যাবে যে, আল্লাহর রসূল সিজদাতে প্রায় ১৩ রকমের দু'আ পড়তেন। তন্মধ্যে কয়েকটি ছোট, প্রসিদ্ধ ও অধিক প্রচলিত দু'আ এ :

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى (সুবহা-না রব্বিয়াল আলা)

তরজমা : আমি আমার সর্বোচ্চ প্রভুর পবিত্রতা বর্ণনা করছি। (তিরমিযী, আবু দাউদ, দারিমী, মিশকাত ৮৩ পৃঃ)

ইমাম শাওকানী বলেন, সিজদার এ দু'আর শেষে আবু দাউদ, দারাকুতনী, আহমাদ ও তাবারানীতে “ওয়াবিহামদিহী” শব্দটি বাড়তি আছে। কিন্তু ঐ হাদীসগুলোই যয়ীফ। (নায়লুল আওতার ২য় খণ্ড ১৩৯ পৃঃ)

২নং দু'আ :

سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ

উচ্চারণ : সুব্বূহুন কুদ্দুসুন রব্বুল মালা-য়িকাতি ওয়ার-রুহ।

নোট : রুকু ও সিজদার এ দু'আটি ‘সুব্বূহুন কুদ্দুসুন’ শব্দের পরে কেউ কেউ ‘রব্বানা’ শব্দটি বাড়তি বলেন। ঐ বাড়তি শব্দটি আমি কোন হাদীসে কিংবা হাদীসের ব্যাখ্যা গ্রহণে পাইনি।

৩নং দু'আ :

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَنُحَمِّدُكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي

উচ্চারণ : সুবহা-নাকা আল্লাহুমা রব্বানা ওয়াবিহামদিহা আল্লাহুমাগ ফিরলী।

(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৮২ পৃঃ)

উক্ত ২নং ৩নং দু'আর আরবী উচ্চারণ ও তরজমা ১২৫ পৃষ্ঠায় দেয়া আছে।

সুতরাং সেখানে দেখে নিন।

৪ নং দু'আ :

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, নাবী ﷺ সিজদায় এ দু'আ পড়তেন,

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي كُلَّهُ وِدِقَّةً وَجِلَّةً وَأَوَّلَهُ وَآخِرَهُ وَعَلَانِيَتَهُ وَسِرَّهُ

উচ্চরণ : আল্লা-হুমাগফিরলী যাম্বী কুন্নাহ দিকাহ ওয়াজিদ্দাহ ওয়াআওওয়ালাহ ওয়াআ-খিরাহ ওয়াআলা- নিয়্যাভাহ ওয়াসিররাহ ।

তরজমা : হে আল্লাহ! তুমি আমার ছোট, বড়, আগের, পিছের, প্রকাশ্য ও গুপ্ত গোনাহ মাফ করে দাও । (মুসলিম, মিশকাত ৮৪ পৃঃ)

নোট : একটি হাদীসে আছে যে, সূরা “ইযা-জা-আ নাসরুন্না-হি ওয়ালফাত্হ” নামিলের পর এমন কোনও নামায নাবী ﷺ পড়েননি যাতে তিনি ৩ নং দু‘আটি পড়েননি । সহীহ মুসলিমে একটি বর্ণনা দ্বারা বোঝা যায় যে, নাবী ﷺ ঐ দু‘আটি নামাযের ভেতরে এবং বাইরে সদা সর্বদা পড়তেন— (নায়লুল আওতার ২য় খণ্ড ১৪০ পৃঃ) । সুতরাং এ দু‘আটি পড়াই অধিক সঙ্গত । উল্লেখিত দু‘আগুলোর মধ্যে যে কোন একটি দু‘আ সিজদাতে কমপক্ষে ৩ বার বেশী হলে ১০ বার পড়তে হবে । আল্লাহর রসূল ﷺ ১০ বার করে পড়তেন । সুতরাং ১০ বার পড়া সন্মত ।

## জলসা বা দুই সিজদার মাঝখানে বসা

সিজদার দু‘আ পড়ার পর আল্লাহর রসূল ﷺ ‘আল্লাহ আকবার’ বলে প্রথমে মাথা তুলে তারপরে দুই হাত যমীন থেকে উঠিয়ে কনুই দুটো উঁচু রেখে ডান হাত ডান হাঁটু এবং বাম হাত বাম হাঁটুর উপরে রাখতেন । সহীহ মুসলিমের রিওয়াযাতে ডান হাত ডান উরু এবং বাম হাত বাম উরুর উপরেও রাখার কথা আছে । সুতরাং দু‘রকমই চলে । তিনি ডান পায়ের গোড়ালি উঁচু করে আঙ্গুলগুলোকে কিবলামুখী মুড়ে রেখে বাম পা-টা বিছিয়ে দিয়ে তার উপরে বসতেন— (আবু দাউদ) । ডান হাত ডান হাঁটু বা উরুর ওপরে রাখার সময় কনিষ্ঠা ও অনামিকা আঙ্গুল দু’টো মুঠো করে এবং মধ্যমা ও বৃদ্ধ আঙ্গুল দু’টোর মাথা এক জায়গায় করে গোল মত করতঃ তর্জনী বা শাহাদাত আঙ্গুলটিকে ইশারা করা অবস্থায় রাখতেন এবং বাম হাতটিকে বাম হাঁটু বা উরুর উপরে বিছিয়ে রাখতেন । কিংবা বাম হাত দিয়ে বাম হাঁটুকে লোকমা ধরার মত করে ধরতেন (মুসলিম, মিশকাত ৭৬ ও ৮৫ পৃঃ)

দুই সিজদার মাঝখানে শাহাদাত আঙ্গুল তুলে ইশারা করার কথা মুসনাদে আহমাদ ৪র্থ খণ্ড, ২১০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত একটি হাদীসে আছে— (হিদায়াতুন নাবী ৭৫ পৃঃ) । এ বসাটাকে জলসা বলে ।

## জলসার দু'আ

জলসায় আল্লাহর নাবী এ দু'আ করতেন :

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَارْحَمْنِيْ وَاهْدِنِيْ وَعَافِنِيْ وَارْزُقْنِيْ.

উচ্চারণ : আল্লা-হুমাগফিরলী ওয়ারহামনী ওয়াহদিনী ওয়া'আ-ফিনী ওয়ারযুকনী ।

তরজমা : হে আল্লাহ! তুমি আমার গুনাহ মাফ কর, আমার উপরে রহম কর, আমাকে সুপথ দেখাও, আমাকে সুস্থ রাখ এবং আমাকে রুখী দাও- (তিরমিযী, আবু দাউদ, মিশকাত ৮৪ পৃঃ) । অন্য বর্ণনায়- ওয়াজুবুরুনী ওয়ারফানী (অর্থাৎ আমার ক্ষতি পূরণ করে দাও এবং আমাকে উন্নত করাও) শব্দ দু'টি বাড়তি আছে- (হাকিম ২৭০ পৃঃ, বায়হাকী ২য় খণ্ড ১২২ পৃঃ) ।

হযায়ফা (রাঃ) বলেন, নাবী ﷺ দুই সিজদার মাঝখানে বলতেন,

رَبِّ اغْفِرْ لِيْ - رَبِّ اغْفِرْ لِيْ (রব্বিগফিরলী - রব্বিগফিরলী)

অর্থাৎ আয় আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা কর । (নাসায়ী, দারিমী, মিশকাত ৮৪ পৃঃ)

নোট : ইবনে মাজাহর রিওয়ায়াতে “রব্বিগফিরলী” তিনবার বলার কথা আছে । সুতরাং প্রথম দু'আটি যার মুখস্থ নেই তিনি এ দু'আটি তিনবার পড়ে নেবেন ।

বিঃদ্রঃ জামা'আতে নামায পড়ার সময় জলসার দু'আ ইমাম বা মুক্তাদীদের উচ্চৈঃস্বরে পড়ার কোন প্রমাণ হাদীসে পাওয়া যায় না । সেজন্য ঐ দু'আটা চুপে চুপে পড়া উচিত । দুই বাংলার বাইরে দিল্লী, বোম্বাই, মাদ্রাজ, কাশ্মীর, বেনারস ও পাটনাসহ সারা ভারতের আহলে হাদীসরা জলসার দু'আ উচ্চৈঃস্বরে পড়ে না ।

## দুই সিজদার মাঝখানে বৈঠকের গুরুত্ব

ইমাম শাওকানী বলেন, কওমার ও দুই সিজদার মাঝখানের বৈঠকের দু'আগুলো এত বেশী প্রমাণিত যে, রুকু ও সিজদার দু'আর অত প্রমাণ নেই ।

(নায়লুল আওতার ২য় খণ্ড ১৫৬ পৃঃ)

কিন্তু সারা জাহানের লোক এ সুনাতটি ছেড়ে দিয়েছে । অনেক আহলে হাদীস ভাইয়েরাও কওমাতে এবং দুই সিজদার মাঝখানে মোটেই দেরী করে না । অথচ এ দু'টোর ব্যাপারে আল্লাহর রসূল ﷺ যত তাকিদ করেছেন অতটা তাকিদ

রফউল ইয়াদায়ন ও উচ্চৈঃশ্বরে আমীন বলার ব্যাপারে করেননি। কারণ কওমা ও দুই সিজদার মাঝখানের বৈঠকে কিছুক্ষণ বা একটু দেৱী করা ফরয, যা না করলে নামাযই হবে না। আর রফউল ইয়াদায়ন ও উচ্চৈঃশ্বরে আমীন বলা সুন্নাত যা না করলেও নামায হতে পারে। তবে সুন্নাতী নামায হবে না। যারা সত্যিকারের সুন্নতের পাবন্দ তাদের কাছে সুন্নাতী নামায কিছু দিন শিখে নেয়া উচিত।

ভারতীয় আহলে হাদীসদের জামা'আতী হিরো সৈয়দ নাযীর হুসায়ন দেহলভী (রহঃ)। যিনি ৬২ বছর ধরে বুখারীসহ সিহাহ সিত্তার হাদীস পড়িয়ে ৮০ লাখ লোককে আহলে হাদীস করেছিলেন। তিনি বহুবার তাঁর প্রিয় ছাত্র আল্লামা আব্দুল ওয়াহ্‌হাব মুলতানী সাদরী মরহুমকে বলেছিলেন, মাওলানা আব্দুল্লাহ গযনভী আমাকে নামায পড়া শিখিয়েছেন, আর আমি তাকে বুখারী পড়িয়েছি ও বুঝিয়েছি— (হিদায়াতুন নাবী ৭৬, ৭৭ ও ৭৯ পৃঃ)। আনাস (রাঃ) বলেন, দুই সিজদার মাঝখানে নাবী ﷺ এত দেৱী করতেন যে, আমরা বলতাম, মনে হয় তিনি (২য় সিজদা দেবার কথা) ভুলে গেছেন— (মুসলিম, মিশকাত ৮২ পৃঃ)।

একদা এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে নামায পড়েন। কিন্তু সে রুকু ও কওমা এবং সিজদা ও জলসায় তাড়াহুড়ো করায় তিনি (ﷺ) তাকে বলেন, তুমি ফিরে যাও, আবার নামায পড়, তুমি নামায পড়নি। সে ঐরূপ নামায ৩ বার কিংবা ৪ বার পড়ে। প্রত্যেক বারেই মহানবী ﷺ তাকে বলেন, তোমার নামায হয়নি। আবার পড়। পরিশেষে সে বলে, তাহলে আপনি আমাকে নামায শিখিয়ে দিন। তখন তিনি ﷺ তাকে অযু ও কিয়ামের কথা বলার পর বললেন, খুব এতমিনানের সাথে ধীর ও স্থিরভাবে রুকু কর। তারপর মাথা তুলে একেবারে সোজা হয়ে দাঁড়াও। অতঃপর খুব শান্ত হয়ে সিজদা কর। তারপর সিজদা থেকে মাথা তুলে খুব ধীর ও স্থিরভাবে বস। তারপর খুব শান্ত হয়ে সিজদা দাও এবং পুনরায় ধীর ও স্থির হয়ে বস, ঐরূপ প্রত্যেক রাক'আতে কর। (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৭৫ পৃঃ)

এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রুকু ও সিজদা যেমন ফরয, তেমন কওমা ও জলসায় তাড়াহুড়ো না করাও ফরয। অতএব ধীর ও স্থিরভাবে রুকু ও সিজদা করা এবং কওমা ও জলসার ব্যাপারে প্রত্যেক নামাযীরই বিশেষ খেয়াল রাখা উচিত।



## দ্বিতীয় সিজদা

অতি শাস্ত ও শিষ্ট হয়ে জলসায় দু'আ পড়ার পর আল্লাহর রসূল ﷺ 'আল্লাহ আকবার' বলে প্রথম সিজদার নিয়মানুযায়ী দ্বিতীয় সিজদায় যেতেন এবং খুবই ধীর ও স্থিরভাবে সিজদার দু'আ পড়ে মাথা তুলতেন। (বুখারী ও মুসলিম)

## জলসায়ে ইস্তিরাহাত বা আরামের বৈঠক

মালিক ইবনে হুওয়ায়রিস (রাঃ) নাবী ﷺ-কে নামায পড়তে দেখেছিলেন, যখন তিনি বেজোড় রাক'আতে (অর্থাৎ ১ম বা ২য় রাক'আতে) থাকতেন তখন (২য় বা ৪র্থ রাক'আতের জন্য) ততক্ষণ উঠতেন না যতক্ষণ সোজা হয়ে না বসতেন। (বুখারী, মিশকাত ৭৫ পৃঃ)

এই বসাটাকে জলসায়ে ইস্তিরাহাত বা আরামের বৈঠক বলে। শাফিয়ী, হাম্বলী এবং আহলে হাদীসদের মতে এ বৈঠক সুন্নাত। (মিরআত ২য় খণ্ড ২৯২ পৃঃ বেনারস ছাপা)

কিন্তু হানাফীরা মনে করেন এ বৈঠকে না বসাটা সুন্নাত। কারণ, তিরমিযী ইবনে আবী শায়বা, মুসান্নাফ আব্দুর রায্যাক, ইবনে আদী প্রভৃতিতে বর্ণিত কতিপয় হাদীস দ্বারা বোঝা যায় যে, জলসায়ে ইস্তিরাহাত না করে সটাং করে উঠে পড়া যাবে। কিন্তু ঐ সমস্ত হাদীসগুলো সম্পর্কে আল্লামা যায়লায়ী হানাফী বলেন যে, সবগুলো হাদীসই যয়ীফ। (নাসবুর রায়াহ ১ম খণ্ড ৩৮৯ পৃঃ)

এ যয়ীফগুলোর বিপরীত হলো উপরে বর্ণিত সহীহুল বুখারীর সহীহ হাদীস।

হাদীস বিশারদদের নীতি-বিচারে বুখারীর উক্ত সহীহ হাদীস অনুযায়ী সবারই জলসায়ে ইস্তিরাহাত করা উচিত। আল্লাহ আমাদেরকে যয়ীফ হাদীস ছেড়ে সহীহ হাদীস মানার সুমতি দিন-আমীন।

এ বসাটা কিন্তু দুই সিজদার মাঝখানে বসার মত দীর্ঘক্ষণ বসা হবে না। বরং নামমাত্র সোজা হয়ে বসেই উঠে পড়তে হবে। যেমন বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ ﷺ যখন দ্বিতীয় সিজদার পর মাথা তুলতেন তখন যমীনের উপর ভর দিতেন এবং তারপরেই দাঁড়াতেন— (বুখারী ১১৪ পৃঃ)। অন্য হাদীসে আছে, তিনি প্রথম রাক'আতের দুই সিজদা থেকে যখন মাথা তুলতেন তখন সোজা হয়ে বসতেন,

তারপর উঠতেন এবং যমীনের উপর ভর দিতেন— (ইবনে খুযায়মা ১ম খণ্ড ৩৪২ পৃঃ)। আলিমদের অনুমানে এ বসাটা একবার তসবীহ পড়ার মত সময় হবে— (ফিকহুস সুন্নাহ ১ম খণ্ড ১৩৮ পৃঃ)।

## বালিশের উপর সিজদা চলবে না

জাবির (রাঃ) বলেন, একদা নাবী ﷺ এক রোগীকে বালিশের উপর নামায পড়তে দেখে বালিশটা ছুঁড়ে ফেলে দিলেন এবং তাকে বললেন, যদি তুমি পার তাহলে যমীনের উপর নামায পড়। অন্যথায় ইশারায় নামায পড় এবং রুকূর চেয়ে সিজদায় একটু বেশী ঝুঁকে যেও। (বায়হাকী, বুলুগল মারাম ২৪ পৃঃ)

## দ্বিতীয় রাক'আত

জলসায়ে ইস্তিরাহাতের পর আল্লাহর রসূল ﷺ দুই হাত মাটিতে ভর দিয়ে উঠতেন— (বুখারী ১১৪ পৃঃ)। এবং রফউল ইয়াদায়ন না করে বুকে হাত বেঁধে দু'আয়ে ইস্তিফতাহ বা সানা ও আ'উযুবিল্লাহ না পড়ে কেবল বিসমিল্লাহর সাথে সূরা ফাতিহা পড়তেন। তারপর প্রথম রাক'আতের মত বাকি সব কিছু আদায় করতেন— (মুসলিম, মিশকাত ৭৮ পৃঃ, যাদুল মাআদ ৬১ পৃঃ)।

## আন্তাহিয়াতু বা তাশাহুদ

'আয়িশা (রাঃ) বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ প্রত্যেক দুই রাক'আতে বসে আন্তাহিয়াতু পড়তেন— (মুসলিম, মিশকাত ৭৫ পৃঃ)। আন্তাহিয়াতুর মধ্যে আল্লাহর উপাস্য হওয়ার এবং মুহাম্মাদ ﷺ-এর রসূল ও বান্দা হওয়ার শাহাদত বা সাক্ষ্য আছে বলে এ বসাটাকে তাশাহুদ বা সাক্ষী হওয়া বলে। এ বসাটাও ঐক্লপ হবে যেক্লপ বসা জলসায় হয়। প্রত্যেক রাক'আতের দুই সিজদার মাঝখানে বসাটাকে জলসা বলে এবং নামায ৪ রাক'আত হলে ২য় রাক'আতের দুই সিজদার পর বসাটাকে যথাক্রমে প্রথম তাশাহুদ ও শেষ তাশাহুদ বলে। জলসায় কিভাবে বসতে হয় সে বিবরণ আগে দেয়া হয়েছে।

আল্লাহর রসূল ﷺ ৩ বা ৪ রাক'আত নামায পড়লে ২য় রাক'আতের প্রথম তাশাহুহোদে ঐরূপ বসতেন যে রূপ তিনি জলসায় বসতেন। কিন্তু নামায কেবলমাত্র ২ রাক'আতওয়ালা হলে তখন তিনি প্রথম তাশাহুহদের মত না বসে শেষ তাশাহুহদের মত বসতেন। সে বিবরণ পরে আসছে।

জলসা ও ১ম তাশাহুহদের বসার সময় আল্লাহর রসূল ﷺ ডান হাতটা ডান হাঁটু বা ডান উরুর উপর রেখে কখনো ৫৩-র গিরা বাঁধতেন অর্থাৎ কনিষ্ঠ ও অনামিকা আঙ্গুল দু'টো মুড়ে দিয়ে মধ্যমা ও বৃদ্ধ আঙ্গুল দু'টোর মাথা এক সাথে মিলিয়ে গোল করতেন এবং শাহাদাত বা তর্জনী আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করতেন। আবার কখনো শাহাদাত আঙ্গুল ছাড়া ৪টি আঙ্গুলকেই মুড়ে নিতেন এবং শাহাদাত আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করতেন- (মুসলিম, বুলুগল মারাম ২২-২৩ পৃঃ)। এ সময় তাঁর নজর শাহাদাত আঙ্গুলের ইশারার উপর থাকতো- (আবু দাউদ, মিশকাত ৮৫ পৃঃ)।

বিশজন সাহাবী থেকে বিভিন্ন শব্দে আস্তাহিয়্যা তু বর্ণিত হয়েছে। তন্মধ্যে সর্বসম্মত বিশুদ্ধ আস্তাহিয়্যা তু ইবনে মাস'উদ থেকে বর্ণিত সেই দু'আটি যা নিম্নে বর্ণিত হল।

'আব্দুল্লাহ ইবনে মাস'উদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নাবী ﷺ বলেন, যখন তোমাদের কেউ নামাযে বসবে তখন এ দু'আ পড়বে।

اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلٰوَاتُ وَالطَّيِّبٰتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ  
اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ عِبَادِ اللّٰهِ الصّٰلِحِيْنَ . اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ  
اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ.

উচ্চারণ : আস্তাহিয়্যা তু লিল্লা-হি ওয়াসসালাওয়া-তু ওয়াত তাইয়্যিবা-তু আসসালা-মু 'আলায়কা আইউহান নাবীউয়্যু ওয়ারহমাতুল্লা-হি ওয়াবারাক-তুহু আসসালা-মু 'আলায়না অ'আলা- 'ইবা-দিল্লা-হিস স-লিহীন, আশ্হাদু আল্লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াআশ্হাদু আন্না মুহাম্মাদান 'আবদুহু ওয়ারসূলুহু।

তরজমা : সব রকম মৌখিক, শারীরিক ও আর্থিক 'ইবাদতসমূহ একমাত্র আল্লাহরই জন্য। হে নাবী! তোমার প্রতি আল্লাহর শান্তি, রহমত ও বরকত নাযিল হোক এবং আমাদের উপর ও আল্লাহর নেককার বান্দাদের উপরও শান্তি বর্ষিত

হোক। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া আর কেউ ইবাদাতের যোগ্য নয় এবং আমি এও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর দাস ও তাঁর দূত। (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৮৫ পৃঃ)

## আন্তাহিয়াতুর তত্ত্ব কথা

ইবনুল মালিক বলেন, বর্ণিত আছে যে, নাবী ﷺ যখন মি'রাজে যান তখন তিনি আন্তাহিয়াতুর শব্দগুলো দ্বারা মহান আল্লাহর গুণকীর্তন করেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আসসালা-মু 'আলায়কা আইয়্যাহান নাবিইয়্যু ওয়্যারহমাতুল্লাহি অবারাকা-তুহ'।" এরপর রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "আসসালা-মু 'আলায়না ওয়া'আলা- 'ইবা-দিল্লা-হিস স-লিহীন"। তারপর জিবরাঈল বলেন, আশহাদু আল্লা- ইলা-হা ইল্লাল্লাহ ওয়াআশহাদু আন্না মুহাম্মাদান 'আবদুহ ওয়্যারাসূলুহ।

এ বর্ণনায় হে নাবী! বলে সন্মোদন করার কারণ স্পষ্ট হয়ে উঠে এ যে, এটা নাবী ﷺ-এর মি'রাজেরই বর্ণনা। নামায যেহেতু মু'মিনদের মি'রাজ সেজন্য নামাযের শেষে মি'রাজের তুহফা আন্তাহিয়াতুর দ্বারা সেই কথা মনে করিয়ে দেয়া হয়। (মিশকাত ১ম খণ্ড ৫৫৬ পৃঃ)

তাই আজও নামাযে 'আইয়্যাহান নাবীইয়্যু বা হে নাবী সন্মোদন জাযিয়। কারণ এতে মি'রাজের বর্ণনা আছে। যেমন কুরআনে কোথাও কোথাও ইয়া ফির'আওনু, ইয়া-হা-মা-নু ইয়া মুসা অথবা হাদীসে ইয়া রসূলুল্লাহ প্রভৃতি সন্মোদন বর্ণনামূলকভাবে এসেছে। আইয়্যাহান নাবিইয়্যু বা হে নাবী বলার ফলে যদি কারো মনে (যেমন কবর পূজারীদের মনে) কোনরূপ কুধারণা সৃষ্টি হয় সেজন্যই 'আব্দুল্লাহ ইবনে মাস'উদ প্রমুখ সাহাবায়ে কিরাম থেকে 'আসসালা-মু 'আলায়কা আইয়্যাহান নাবিইয়্যু'র বদলে 'আসসালামু 'আলান নাবীয়্যি' পড়া ও প্রমাণিত আছে। (বুখারী ৯২৬ পৃঃ, সহীহ আবু আওয়া-না আবু নু'আইম, বায়হাকী, মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বা, মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক, ফাতহুল বারী ২য় খণ্ড ৩১৪ পৃঃ)

যদি কারো মনে কুধারণা সৃষ্টি না হয় তাহলে আইয়্যাহান নাবীইয়্যু পড়া অবশ্য কর্তব্য। কারণ, এতে আল্লাহর রাসূলের মুখ নিঃসৃত শব্দের ইত্তিবা ও অনুসরণ করা হয়। (হিদায়াতুন নাবী ৮২ পৃঃ)

আল্লামা আবু মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াহ্‌হাব মুলতানী সাদরী (রহঃ) কিছু শব্দ হেরফের করে মোট ৫ রকম আন্তাহিয়াতু বিভিন্ন হাদীস থেকে উদ্ধৃত করেছেন এবং পরিশেষে বলেছেন, ‘আব্দুল্লাহ ইবনে মাস’উদ হতে বর্ণিত তাশাহ্‌হুদ (যা এ বইয়ের ১৩৭ পৃষ্ঠায় আছে) বেশী সহীহ ও বেশী আমলকৃত। তারপর ইবনে ‘আব্বাসের রিওয়ায়াত, তারপর আবু মুসার, তারপর ওমরের, তারপর জাবিরের রেওয়ায়াতের স্থান— (হিদায়াতুন নাবী ৮৮ পৃঃ)।

### তাশাহ্‌হুদের গুরুত্ব

‘উমর (রাঃ) বলেন, তাশাহ্‌হুদ ছাড়া কোন নামাযই যথেষ্ট হয় না— (মুসান্নাফ আব্দুর রায্যাক ২য় খণ্ড ২০৬ পৃঃ, সুনানে সাঈদ ইবনে মানসুর, তারীখে বুখারী, আল আসয়িলাহ ১ম খণ্ড ১৬৬ পৃঃ)। তাই ইবনে ‘আব্বাস (রাঃ) ও জাবির (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে তাশাহ্‌হুদ ঐভাবে শেখাতেন যেমন কুরআনের কোন সূরা শেখাতেন— (মুসলিম, নাসায়ী, মিশকাত ৮৫ পৃঃ)।

ইবনে ‘উমর (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে নামাযের তাশাহ্‌হুদ ঐরূপ শেখাতেন যেমন কোন শিক্ষক ছোট ছেলেদের শেখান। ইবনে মাস’উদ বলেন, আমরা রসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে ইস্তিখারাহ এবং তাশাহ্‌হুদ ছাড়া আর কিছু লিখতাম না—(মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বা ১ম খণ্ড ২৯৪ পৃঃ)। আবু সাঈদ বলেন, আমরা কুরআন এবং তাশাহ্‌হুদ ছাড়া আর কিছু লিখতাম না— (ঐ ২৯৩ পৃঃ)। ইবনে ‘উমর (রাঃ) বলেন, আবু বাকর (রাঃ) তাদেরকে মেঝারে বসে তাশাহ্‌হুদ শেখাতেন, যেমন শিশুদেরকে মক্তবে শেখান হয়— (ঐ ২৯২ পৃঃ)।

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, তোমরা তাশাহ্‌হুদ শিখে নাও। কারণ, তাশাহ্‌হুদ ছাড়া নামাযই হয় না। (বায়হার, তাবারানী আওসাত, কানযুল উম্মাল ৭ম খণ্ড ৩৩৯ পৃঃ)

### শাহাদাত আঙ্গুল তোলার গুরুত্ব

তাশাহ্‌হুদে বসে আল্লাহর সামনে আল্লাহর রসূল ﷺ-এর দুই হাঁটু গেড়ে কালিমায়ে শাহাদাত পড়াটা আল্লাহর একত্ববাদের মৌখিক স্বীকৃতি ছিল এবং মৌখিক স্বীকৃতির সাথে সাথে শাহাদাত আঙ্গুল তোলাটা আল্লাহর একত্ববাদের

বাস্তব কাজেরই স্বীকৃতি। তাই এ আঙ্গুল তোলার গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য যে কত তা রসূলুল্লাহ ﷺ-এর মুখ থেকেই শুনুন, তিনি বলেন, শাহাদাত আঙ্গুলটি শয়তানের উপর লোহার (বল্লমের) চেয়েও বেশী কষ্টদায়ক- (মুসনাদে আহমাদ, মিশকাত ৮৫ পৃষ্ঠা)। নামাযে প্রত্যেক ইশারার বদলে দশটি অর্থাৎ প্রত্যেক আঙ্গুলের বদলে একটি করে নেকী লেখা হয়- (তারীখে হাকিম, কানযুল উম্মাল ৭ম খণ্ড ৩৪০ পৃষ্ঠা)।

## ইশারা কোন জায়গায় করতে হবে

ইমাম নববী বলেন, তাশাহুদে “ইল্লাল্লাহু” বলার সময় ইশারা করতে হবে। সুবলুস সালা-ম ওয়ালা বলেন, বায়হাকীর বর্ণনানুসারে ‘লা- ইলা-হা ইল্লাল্লাহু’ বলার সময় করতে হবে। আল্লামা তীবী ইবনে ‘উমর বর্ণিত একটি হাদীসের বরাতে দিয়ে বলেন, ‘ইল্লাল্লাহু-হু’ বলার সময় ইশারা করতে হবে, যাতে কথায় ও কাজে তাওহীদের সামঞ্জস্য হয়ে যায়। মোল্লা আলী কারী হানাফী বলেন, হানাফী মতে “লা- ইলা-হা” বলার সময় তুলতে হবে এবং ‘ইল্লাল্লাহু’ বলার সময় রেখে দিতে হবে। আল্লামা ‘আব্দুর রহমান মুবারকপুরী বলেন, ঐসব মতের কোনটারই প্রমাণে আমি কোন সহীহ হাদীস পাইনি- (তুহফাতুল আহওয়ায়ী ১ম খণ্ড ২৪২ পৃঃ)। তবে ‘ইল্লাল্লাহু’র ওপরে ইশারা করাটা বেশী সঙ্গত মনে হয়- (আফযালুস সলা-ত ২০৬-২০৭ পৃঃ)।

শাফিয়ীদের মতে ‘ইল্লাল্লাহু’ বলার সময় আঙ্গুল দিয়ে একবার মাত্র ইশারা করতে হবে। হানাফী মতে লা বলার সময় তর্জনি আঙ্গুল তুলতে হবে এবং ‘ইল্লাল্লাহু’ বলার সময় তা রেখে দিতে হবে। মালিকী মতে আত্তাহিয়্যাতুর গুরু থেকে সালাম পর্যন্ত আঙ্গুলটিকে ডানে ও বামে নাড়াতে হবে। হাম্বলীদের মতে যখন আল্লাহর নাম উচ্চারণ হবে তখন আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করবে, কিন্তু তা নাড়াবে না। (ফিকহুস সুন্নাহ ১ম খণ্ড ১৭০ পৃঃ)

ইবনে ‘উমর (রাঃ) বলেন, দ্বিতীয় রাক‘আতে একটু আরামের জন্যই কেবল তাশাহুদ রাখা হয়েছে। তাই ‘আয়িশা বলেন, নাবী ﷺ দ্বিতীয় রাক‘আতে শুধু আত্তাহিয়্যাৎ পড়তেন। (ইবনে আবী শায়বা ১ম খণ্ড ২৯৬ পৃঃ)

## তৃতীয় রাক'আত

রাসূলে কারীম ﷺ যখন ফজরের নামায পড়তেন কিংবা যে কোন নামায দুই রাক'আত পড়তেন তখন তাঁর বসার চং আলাদা হতো এবং তখন মাস্তাহিয়াতুর পর তিনি আরো কিছু দু'আ পড়তেন, সেগুলো ৪ রাক'আত নামাযের বৈবরণে আসছে।

কিন্তু যখন তিনি মাগরিবের ৩ রাক'আত অথবা যোহর, আসর এবং এশা প্রভৃতির ৪ রাক'আত নামায পড়তেন তখন তিনি দু'রাক'আতের শেষে ১ম মাস্তাহিয়াতু পড়ার পর 'আল্লাহ আকবার' বলে দুই হাত মাটিতে ভর করে উঠতেন— (সহীহ ইবনে খুযায়মা ১ম খণ্ড ৩৫০ পৃঃ)। এবং আবার দুই হাত কাঁধ বা কান পর্যন্ত তুলে বুকে হাত বাঁধতেন এবং এবারেও ২য় রাক'আতের মত দু'আয়ে ইস্তিতফাহ ও আ'উযুবিল্লাহ না পড়ে কেবল 'বিসমিল্লাহ'র সাথে সূরা ফাতিহা পড়তেন। তারপর বেশীর ভাগই অন্য কিরাআত না পড়ে (এবং কখনো কখনো অন্য কিরাআত পড়ে) ১ম ও ২য় রাক'আতের মত রুকু ও কওমা, সিজদা, জলসা ও জলসায়ে ইস্তিরাহাত প্রভৃতি কাজগুলো করতেন— (সিহাহ সিভাহ)।

## চতুর্থ রাক'আত

রসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামায যদি মাগরিবের মত তিন রাক'আত হতো তাহলে তিনি তৃতীয় রাক'আতের দুই সিজদার পরে শেষ তাশাহুদে বসতেন। অন্যথায় তাঁর নামায ৪ রাক'আতওয়ালা হলে তিনি তৃতীয় রাক'আতের জলসায়ে ইস্তিরাহাতের পর দুই হাত মাটিতে ভর দিয়ে উঠতেন— (সহীহ ইবনে খুযায়মা ১ম খণ্ড ৩৪২ পৃঃ)। এবং রফউল ইয়াদায়ন না করে বুকে হাত বেঁধে সানা ও আ'উযুবিল্লাহ না পড়ে কেবল 'বিসমিল্লাহ'র সাথে শুধু সূরায়ে ফাতিহা পড়তেন। তারপর বেশীর ভাগই অন্য কিরাআত না পড়ে (কখনো কখনো অন্য কিরাআতও পড়েও) আগের মত রুকু, কওমা, সিজদা ও জলসা প্রভৃতি কাজগুলো করে শেষ তাশাহুহুদে বসতেন— (সিহাহ সিভাহ)।

## ৩য় ও ৪র্থ রাক'আতে কিরাআত প্রসঙ্গে

আবু কাতাদাহ (রাঃ) বলেন, নাবী ﷺ যোহরের প্রথম দু'রাক'আতে সূরা ফাতিহা এবং দু'টি সূরা পড়তেন এবং শেষ দু'রাক'আতে শুধু সূরা ফাতিহা

পড়তেন। আসরেও তিনি এরূপ করতেন— (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৭৯ পৃঃ)। 'আয়িশা (রাঃ) দিনের নামাযে প্রথম দু'রাক'আতে শুধুমাত্র সূরা ফাতিহা পড়তেন— (মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বা ১ম খণ্ড ৩৭২ পৃঃ ও আব্দুর রায্যাক ২য় খণ্ড ১০১ পৃঃ)।

আবুদ দারদা (রাঃ) বলতেন, তোমরা যোহর ও আসরের প্রথম দু'রাক'আতে সূরা ফাতিহা এবং অন্য সূরা পড়। আর শেষ দু'রাক'আতে শুধু সূরা ফাতিহা পড়। এবং মাগরিবের শেষ রাক'আতে ও এশার শেষ দু'রাক'আতে কেবল সূরা ফাতিহা পড়— (মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বা ১ম খণ্ড ৩৭০ পৃঃ)। 'আলী (রাঃ) বলতেন, ইমাম এবং তার পেছনে মুক্তাদী যোহর ও আসরের প্রথম দু'রাক'আতে সূরা ফাতেহা এবং অন্য সূরা পড়বে আর শেষ দু'রাক'আতে কেবল সূরা ফাতেহা পড়বে— (ঐ, ৩৭১ পৃঃ)।

উক্ত হাদীসগুলোর ভিত্তিতে প্রমাণিত হয় যে, যোহর, আসর ও এশার শেষ দু'রাক'আতে এবং মাগরিবের শেষ রাক'আতে সূরা ফাতিহা ছাড়া অন্য সূরা পড়া সুন্নাত নয়। হানাফীদের মত তাই। (মিরকাত ১ম খণ্ড ৫২৪ পৃঃ)

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, আমরা যোহর ও আসরের প্রথম দু'রাক'আতে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর দাঁড়ানোটি অনুমান করতাম খ্রিষ্টটি আয়াতের মত এবং শেষ দু'রাক'আতের দাঁড়ানোটি অনুমান করতাম ওর অর্ধেক (অর্থাৎ পনেরটি আয়াতের মত)। আর আসরের প্রথম দু'রাক'আতের কিয়ামটি যোহরের প্রথম দু'রাক'আতের অর্ধেকের মত হতো— (মুসলিম, মিশকাত ৭৯ পৃঃ)। এ হাদীস প্রমাণ করে যে, তৃতীয় এবং চতুর্থ রাক'আতে সূরা ফাতিহার পর অন্য সূরাও পড়া সুন্নাত— (মিরকাত ১ম খণ্ড ৫২৪ পৃঃ)।

অন্য বর্ণনায় পরিষ্কার আছে যে, যে ব্যক্তি ফরয এবং অন্যান্য নামাযের প্রত্যেক রাক'আতে আলহামদু এবং অন্য সূরা পড়ে না তার নামাযই হয় না— (ইবনে মাজাহ ৬১ পৃঃ)। এ হাদীসটি যব্বীক। কিন্তু এটি উপরে বর্ণিত সহীহ মুসলিমের রিওয়ায়াতটির সমর্থক এবং ব্যাখ্যা প্রকাশক। এ হাদীসটি প্রমাণ করে যে, ফরয এবং সুন্নাত ও নফল প্রভৃতি সব রকম নামাযের প্রত্যেক রাক'আতে সূরা ফাতিহা এবং অন্য সূরা বা কিছু আয়াত পড়া উচিত।



এ ব্যাপারে ইমাম নববী বলেন, তৃতীয় এবং চতুর্থ রাক'আতে সূরা ফাতিহার পর অন্য সূরা পড়া এবং না পড়া সম্পর্কে দু'রকমই হাদীস পাওয়া যায় বলে আলিমদের মধ্যে মতভেদ হয়েছে। ইমাম মালিকের মতে অন্য সূরা মাকরুহ। ইমাম শাফি'র মতে পছন্দনীয়। অন্যদের মতে পড়তে পারে এবং নাও পারে। তবে নফল নামাযে সূরা পড়া মুস্তাহাব। (নববী শারহে মুসলিম ১ম খণ্ড ১৭১ পৃঃ)

আহলে হাদীসদের মতে কখনো পড়া এবং কখনো না পড়া উচিত। যাতে দু'রকম হাদীসের উপরে আমল হয়ে যায়।

### শেষ তাশাহুদে বসার বিশেষ নিয়ম

আবু হুমায়দ আসসাযিদী (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ যে সিজদার পরে সালাম ফিরাতে (চায় তা দুই রাক'আত নামায হোক, কিংবা ৩ রাক'আত বা ৪ রাক'আত) তখন বসতেন এভাবে- বাম পা-টা ডান পায়ের রলার নিচে দিয়ে বের করে দিতেন এবং বাম পাছার ভরে যমীনে বসতেন- (আবু দাউদ, দারিমী, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, মিশকাত ৭৬ পৃঃ)। এবং ডান পাটা খাড়া করে রাখতেন- (বুখারী, মিশকাত ৭৫ পৃঃ)। কখনো তিনি দু'টো পা-কেই ডান দিকে বের করে দিয়ে পাছার ভরে বসতেন- (আবু দাউদ, মিশকাত ৭৬ পৃঃ)। আবার কখনো তিনি বাম পা-টাকে ডান উরু ও রলার মাঝখানে রাখতেন এবং ডান পাটা বিছিয়ে রেখে পাছার উপর বসতেন- (মুসলিম)। এ রকম বসাকে 'তাওয়াযরু' বলে।

শেষ তাশাহুদে এ তিনটির যে রকম ইচ্ছা বসতে পারেন। সবই জায়েয। কিন্তু প্রথম রকমটা বেশী সহীহ, বেশী জোরদার ও বেশী আমলকৃত। জলসা ও প্রথম তাশাহুদে মত এ বসাতেও তিনি ﷺ হাত দু'টো হাঁটু বা উরুর উপরে রাখতেন এবং শাহাদাত আঙ্গুলটি আন্তাহিয়াত পড়ার শুরু থেকেই উঠিয়ে রাখতেন আর 'ইল্লাল্লাহ' বলার সময় আঙ্গুলটি নাড়িয়ে ইশারা করতেন। (বায়হাকী, হেদা-য়াতুন নাবী, ৮৯ পৃঃ)

আন্তাহিয়াতুর পর দরুদ পড়তে হবে। তাই দরুদের বিবরণ নীচে দেয়া হল।

### সুন্নাতী দরুদ

ফুযালাহ ইবনে 'উবায়দ (রাঃ) বলেন, একদা এক ব্যক্তি এসে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে নামায পড়ে এ দু'আ করল, হে আল্লাহ! তুমি আমার গুনাহ মাফ

কর এবং আমার উপর রহম কর। তখন আব্বাহর রাসূল ﷺ তাকে বলল, ও মুসল্লী! তুমি খুব জলদি করছ। শোন, যখন তুমি নামায পড়বে তখন প্রথমে আব্বাহর যথাযোগ্য তারিফ করবে, তারপর আমার উপরে দরুদ পাঠ করবে এবং (পরিশেষে নিজের জন্য) দু'আ করবে। (তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসায়ী, মিশকাত ৮৬ পৃঃ)

এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আস্তাহিয়াতুর পর দরুদ পড়তে হবে। সুতরাং পূর্বোল্লিখিত নিয়মে শেষ তাশাহুদে বসে প্রথম তাশাহুদের মত আস্তাহিয়াতু পড়তে হবে এবং শাহাদাত আব্বালের ইশারাও যথারীতি করতে হবে। তারপর নিম্নলিখিত দরুদ পড়তে হবে।

১নং দরুদ : কা'ব ইবনে উজ্জাহ (রাঃ) বলেন, একদা রসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করা হল আপনার উপর আমরা কিভাবে দরুদ পড়ব, হে আব্বাহর রসূল! তিনি বললেন, বল :

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ اِبْرٰهِيْمَ  
وَعَلَىٰ اٰلِ اِبْرٰهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ. اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ اٰلِ  
مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَىٰ اِبْرٰهِيْمَ وَعَلَىٰ اٰلِ اِبْرٰهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ.

বাংলা উচ্চারণ : আব্বা-হুযা সল্লি 'আলা- মুহাম্মাদিন ওয়া'আলা- আ-লি মুহাম্মাদ \* কামা-সল্লায়তা 'আলা- ইব্বা-হীমা ওয়া'আলা- আ-লি ইব্বা-হীম ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ \* আব্বা-হুযা বা-রিক 'আলা মুহাম্মাদিন ওয়া'আলা- আ-লি মুহাম্মাদ \* কামা- বা-রাকতা 'আলা- ইব্বাহীমা ওয়া'আলা- আ-লি ইব্বা-হীম ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ \*

তরজমা : হে আব্বাহ! তুমি মুহাম্মাদ ﷺ এবং তাঁর বংশধরদের উপর ঐরূপ রহমত নাযিল কর যেমনটি করেছিলে ইব্বাহীম ও তাঁর বংশধরদের উপর। নিশ্চয় তুমি প্রশংসনীয় (এবং) সম্মানীয়। হে আব্বাহ! তুমি মুহাম্মাদ ﷺ এবং তাঁর বংশধরদের উপর বরকত নাযিল কর যেমন বরকত নাযিল করেছিলে ইব্বাহীম ও তাঁর বংশধরদের উপরে। নিশ্চয়ই তুমি প্রশংসনীয়, সম্মানীয়। (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৮৬ পৃঃ)

রাসূলে আকরাম ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি আমার উপরে মাত্র একবার দরুদ পাঠ করে আল্লাহ তার উপরে দশবার রহমত নাযিল করেন, তার দশটা গুনাহ মিটিয়ে দেন এবং তার মর্যাদা দশগুণ বাড়িয়ে দেয়া হয়— (নাসায়ী)। তিনি বলেন, সেই ব্যক্তির নাক মাটিতে ঘেঁষড়ে যাক, যার কাছে আমার নাম উচ্চারিত হয় অথচ সে আমার উপর দরুদ পড়ে না— (তিরমিযী)। তিনি বলেন, কেয়ামতের দিন সেই ব্যক্তি আমার সবচেয়ে নিকটবর্তী হবে যে ব্যক্তি আমার উপর সবচেয়ে বেশী দরুদ পড়ে— (তিরমিযী)। ‘উমর ফারুক (রাঃ) বলেন, দু’আ ততক্ষণ পর্যন্ত আসমান ও যমীনের মাঝখানে লটকে থাকে, উপরে উঠে না যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি তোমার নাবী ﷺ এর উপর দরুদ না পড়— (তিরমিযী, মিশকাত ৮৬-৮৭ পৃঃ)।

## আরো কয়েকটি সুন্নাতী দরুদ

উল্লেখিত দরুদ ছাড়াও বিভিন্ন হাদীসে আরো ৪ রকম দরুদ পাওয়া যায়। তন্মধ্যে এ বইয়ের ১৪৩ পৃষ্ঠায় দরুদদের শব্দের সাথে সাথে দু’চারটি শব্দ কমবেশী করে দু’টি দরুদ আছে। যেমন ২ নম্বরে দরুদ-বুখারী ও মুসলিমে আবু হুমায়দ বর্ণিত রিওয়াযাতে “আ-লি মুহাম্মাদ”-এর জায়গায় “ওয়াআযুওয়া-জিহী ওয়াযুররিয়া-তিহী” শব্দ আছে এবং ‘আ-লি ইবরাহীম’ শব্দ দু’জায়গাতেই নেই।

(মিশকাত ৮৬ পৃঃ)

৩নং দরুদ : বুখারীতে আবু সাঈদ খুদরী বর্ণিত দরুদে ‘আল্লা-হুয়া সল্লি ‘আ’লা মুহাম্মাদিন’-এর পরে ‘আবদিকা ও রাসূলিকা’ শব্দ বাড়তি আছে। কিন্তু তারপর ‘ওয়াআলা- আ-লি মুহাম্মাদ’ এক জায়গায় এবং ওয়াআলা- আ-লি ইবরাহীম ও ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ দু’জায়গাতেই নেই।

৪নং দরুদ : আল্লা-হুয়া সল্লি ‘আলা- মুহাম্মাদিন নাবিয়্যিল উম্মিইয়ি ওয়াআযুওয়া-জিহী ওয়াযুররিয়া-তিহী ওয়াআহ্লি বাইতিহী কামা- সল্লায়তা ‘আলা- ইবরাহীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ। (আবু দাউদ, মিশকাত ৮৭ পৃঃ)

৫ নং দরুদ : আল্লা-হুয়া সল্লি ‘আলা- মুহাম্মাদিন ওয়াআনযিলহল মাক্-আদাল মুকাররাবা ইনদাকা ইয়াওমাল কিন্না-মাহ। (আহমাদ, মিশকাত ৮৭ পৃঃ)

উল্লেখিত পাঁচটি দরুদদের শব্দগুলো রসূলুল্লাহ ﷺ-এর পাক যবান থেকে বেরিয়েছে বলে সুন্নাতী দরুদ নামে অভিহিত হয়েছে। সহীহ ইবনে খুযায়মার ১ম

খণ্ডের ৩৫২ পৃষ্ঠায় একটি রিওয়াজাতে রয়েছে যে, জনৈক সাহাবী যখন আব্বাহর রসূল ﷺ কে জিজ্ঞেস করলেন, নামাযে আমরা কিভাবে আপনার উপর দরুদ পড়ব? তিনি তখন ১নং দরুদটি সবাইকে শিখিয়ে দেন- (বুলুগল মারাম ২৩ পৃঃ)। সুতরাং যদি কেউ উল্লেখিত সুন্নাতী দরুদগুলো পড়েন তাহলে তিনি পূর্বোক্ত দরুদে ফযীলতের হকদার হবেন। অন্যথায় বিদআতী দরুদ পড়লে তিনি বিদআতীদের মধ্যে গণ্য হবেন।



## কতিপয় বিদআতী ও মুশরিকী দরুদ

কিছু বিদআতী ও মুশরিকী আকীদার লোকেরা কতিপয় বিদআতী ও মুশরিকী দরুদ তৈরী করেছেন। যেমন দরুদে তাজ, দরুদে হাযারী, দরুদে লাখী, দু'আয়ে গানজুল আর্শ, মি'রাজ নামা, নূর নামা, দালায়িলুল খায়রাতি প্রভৃতি। এগুলো সব বানোয়াট, নকল এবং জাল দরুদ ও দু'আ। এর মধ্যে বহু শিরকী শব্দ রয়েছে, যা পড়লে পড়নেওয়াল বিদআতী মুশরিকে পরিণত হয়ে যায়।


(হিদা-রাত্ন নাবী ৯৩ ও ৯৬ পৃঃ)



উদাহরণ স্বরূপ দরুদে তাজ ধরুন। এ দরুদে আব্বাহর রসূলকে 'দা-ফিউল বালা-য়ি ওয়াল ওয়াবা-য়ি ওয়ালকাহাতি ওয়ালমারায়ি ওয়াল আলাম' অর্থাৎ বালা মুসিবত, মহামারী, দুর্ভিক্ষ, রোগ ও দুঃখ-কষ্ট দূরকারী বলা হয়েছে- (নিয়ামুল কুরআন ২৮ পৃঃ)। যা একেবারে শিরকী কথা। যদি কেউ এ কথা বিশ্বাস করে যে, রসূলুল্লাহ ﷺ সব রকম বিপদ আপদ দূরকারী তাহলে সে নিঃসন্দেহে মুশরিক। সুতরাং বিদআতী দরুদ থেকে আমাদের বাঁচতে হবে। আব্বাহ বিদআতীদের হিদায়াত দিন আর আমাদেরকে বাঁচান, রাসূলের সুন্নাত মোতাবেক চলার তওফীক দিন- আমীন।

অনেক বিদআতী দরুদ পড়নেওয়াল বলে যে, আহলে হাদীসরা দরুদ পড়ে না। এ কথা ঠিক যে, আহলে হাদীসরা বানোয়াট ও বিদআতী দরুদ পড়ে না এবং রসূল ﷺ -এর নাম শুনে চোখে মুখে আব্বাহ ঠেকিয়ে চুমু খায় না কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এরা এসব বিদআতীদের চেয়েও অনেক বেশী দরুদ পড়ে। কারণ, তারা যখনই আব্বাহর রাসূলের নাম শুনে তারা 'ﷺ' বলে। এ শব্দটিই হলো সংক্ষিপ্ত দরুদ, যা সমস্ত মুহাদ্দিসীনে কিরাম ও উলামায়ে রব্বানী রসূল ﷺ -এর

নাম শুনে বলে থাকেন এবং রাসূলের নামের পর কখনো পুরোপুরি  আবার কখনো সংক্ষিপ্ত দরুদ যথা (সঃ) অথবা (দঃ) লিখে থাকেন। আহলে হাদীসরা যে বেশী দরুদ পড়ে এ কথার সাক্ষ্যরূপ মোস্তা আলী কারী হানাকী তদীয় শারহে মিশকাতে লিখেছেন : ইবন হিব্বান তদীয় সহীহতে এ হাদীসটি যে, কিয়ামতের দিন আল্লাহর নাবীর সবচেয়ে নিকটবর্তী হবে তারা যারা বেশী করে নাবীর উপর দরুদ পড়ে, বর্ণনা করে বলেছেন যে, কিয়ামতের দিন রসূলুল্লাহ -এর সবচেয়ে নিকটবর্তী হবে আহলে হাদীসরা। কারণ, এ উম্মাতের মধ্যে ওদের চেয়ে বেশী দরুদ পাঠকারী আর কেউ নেই এবং অন্যরা বলেন যে, এরাই কথায় ও কাজে রাসূলের উপরে বেশী দরুদ পড়েন। (মিশকাত ২য় খণ্ড ৫ পৃঃ)

## দু'আয়ে মাসূরা

নামাযে আত্তা-হিয়্যাতু ও দরুদ পাঠের পর এবং সালাম ফেরার আগে আল্লাহর রসূল  কতিপয় দু'আ পড়তেন। ঐ দু'আগুলোকে দু'আয়ে মাসূরা বলে। বিভিন্ন হাদীসে দু'আয়ে মাসূরা সম্পর্কে প্রায় ১২ রকম দু'আ পাওয়া যায়। তন্মধ্যে ছোট, অতি এসিদ্ধ ও অধিক প্রচলিত কয়েকটি দু'আ হল।

এ বইয়ে ১৪৩ পৃষ্ঠায় তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসায়ী বর্ণিত একটি হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে যাতে আল্লাহর রসূল  একজন মুসল্লীকে দরুদ পাঠের পর তার নিজের জন্য দু'আ করতে বলেছিলেন। তাই একদিন আবু বাক্র সিদ্দীক (রাঃ) আল্লাহর রসূল  কে বললেন, ইয়া রসূলুল্লাহ! আমাকে কোন দু'আ শিখিয়ে দিন, যা আমি নামাযে পড়ব। তখন তিনি বললেন, বল :

اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ  
فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ.

উচ্চারণ : আল্লা-হুমা ইন্নী যলামতু নাকসী যুলমান কাসীরাও ওয়ালা ইয়াগফিরুষ যুনুবা ইন্না-আনতা ০ ফাগফিরলী মাগফিরাতাম মিন ইনদিকা ওয়ারহামনী ০ ইন্নাকা আন্তাল গাফুরুর রাহীম \*

তরজমা : হে আল্লাহ! আমি আমার নিজের উপর বহু যুল্ম করেছি অথচ তুমি ছাড়া ঐ শুনাইগুলো মাক করার আর কেউ নেই। সুতরাং তুমি নিজের তরফ

থেকে আমাকে মাফ কর এবং আমার উপরে রহম কর। কারণ তুমি তো ক্ষমাশীল ও দয়াশীল। (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৮৭ পৃঃ)

ইবনে 'আব্বাস (রাঃ) বলেন, আব্বাহর নাবী ﷺ সাহাবীদেরকে নিম্নের দু'আটা ঐভাবে শিক্ষা দিতেন যেভাবে কুরআনের কোন সূরা শিখাতেন— (মুসলিম)। মা 'আয়িশা (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ নিজেও এ দু'আ পড়তেন— (বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত ৮৭ পৃঃ)

দু'আটি এই :

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ  
وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَالِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَفِتْنَةِ  
الْمَمَاتِ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْمَآْثِمِ وَالْمَغْرَمِ.

উচ্চারণ : আল্লা-হুয়া ইন্নী আ'উযুবিকা মিন 'আযাবি জাহান্নাম। ওয়া আ'উযুবিকা মিন 'আযা-বিল কাবরি \* ওয়াআ'উযুবিকা মিন ফিতনাতিল মাসীহিদ দাজ্জাল\* ওয়াআ'উযুবিকা মিন ফিতনাতিল মাহুইয়া- ওয়াফিতনাতিল মামা-ত \* আল্লা-হুয়া ইন্নী আ'উযুবিকা মিনাল মা'সামি ওয়াল মাগ্গরামি।

নোট : উক্ত দু'আর প্রথম বাক্যটি কেবল সহীহ মুসলিমে আছে— (মিশকাত ৮৭ পৃঃ)। সহীছুল বুখারীতে নেই।

তরজমা : হে আল্লাহ! আমি জাহান্নামের 'আযাব থেকে, কবরের 'আযাব থেকে, কানা দাজ্জালের ফিতনা-ফাসাদ থেকে, জীবন ধারণের ও মরণের বিপদাপদ থেকে রক্ষা পাবার জন্য আশ্রয় চাচ্ছি। আর হে আল্লাহ! আমি গুনাহ ও দেনা থেকেও মুক্তি পাবার জন্য তোমার কাছে পানাহ চাচ্ছি।

একজন সাহাবী তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি দেনা থেকে মুক্তির জন্য এত বেশী আশ্রয় চান কেন? তিনি ﷺ বললেন, মানুষ যখন দেনাদার হয় তখন কথা বলার সময় মিথ্যা বলে এবং যখন সে ওয়াদা করে খেলাফ করে— (এ পৃঃ ঐ)। অন্য হাদীসে আছে যে, মিথ্যা বলা এবং ওয়াদা খেলাফ করা মুনাফিকের নিশানা— (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ১৭ পৃঃ)।

## সালাম ফিরানোর বিবরণ

‘আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, আব্দুল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, নামাযে কতিপয় জিনিসকে (যেমন কথাবার্তা বলা, এদিক-ওদিক চাওয়া প্রভৃতিকে) হারাম করে দেয় তাকবীরে তাহরীমা এবং ঐ হারাম জিনিসগুলোকে আবার হালাল করে দেয় সালামে। (আবু দাউদ, তিরমিযী, দারিমী, ইবনে মাজাহ, মিশকাত ৪০ পৃঃ)

সেজন্য ‘আব্দুল্লাহ ইবনে মাস’উদ (রাঃ) বলেন, আব্দুল্লাহর রসূল ﷺ দরুদ ও দু’আয়ি মা-সূরাহ পড়ার পর ডান দিকে ও বাম দিকে সালাম ফিরাতেন এ বলে।

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ.

উচ্চারণ : আস্‌সালামু ‘আলায়কুম ওয়ারহমাতুল্লাহ, আস্‌সালামু ‘আলায়কুম ওয়ারহমাতুল্লাহ।

তরজমা : হে মুক্তাদী ও ফেরেশতাগণ! তোমাদের উপর আব্দুল্লাহর শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক।

একটি হাদীসে আছে যে, মু’মিনের সাথে একশো ষাটটি ফেরেশতা নির্দিষ্ট করা আছে। যারা তার থেকে এসব জিনিস দূরে সরিয়ে রাখে যার সামর্থ্য সে রাখে না। (তাবারানী, নাসবুর রায়াহ ১ম খণ্ড ৪৩৪ পৃঃ)

ডানে ও বামে মুখ ফেরাবার সময় নাবী ﷺ-এর ডান ও বাম গালের সাদা অংশটি দেখা যেত। (আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ, মিশকাত ৮৮ পৃঃ)

ওয়ালিল ইবনে হজ্র থেকে বর্ণিত আছে যে, আব্দুল্লাহর রসূল সালাম ফেরার সময় ‘ওয়ারহমাতুল্লাহর পরে (কখনো) وَبَرَكَاتُهُ অবারাকাতুহ শব্দটিও বলেছেন।

(আবু দাউদ, বুল্‌গল মারাম ২৩ পৃঃ)

কিছু হানাফী ফিক্‌হ গ্রন্থ ‘মুহীত’ বলে যে, এ সালামে ‘ওয়ারাকাতুহ’ শব্দটি বলা যাবে না- (মুনয়্যাতুল মুসান্নী, কাবীরী ৩৫৬ পৃষ্ঠা, জওহা-রাতুন নাইয়িরাহ ৫২ পৃষ্ঠা ১১ নং টীকা)। অন্য হানাফী ফিক্‌হ ‘আস্‌সিরাজুল ওয়াহ্‌জি’ আছে, ওয়ারাকাতুহ-তুহ বলা মাকরুহ- (বাহরে রায়িক ১ম খণ্ড ৩৩২ পৃঃ)। হানাফীদের এ ফাতওয়াগুলো উপরে বর্ণিত সহীহ ও স্পষ্ট হাদীসের খেলাফ।

জাবির ইবনে সামুরাহ বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ ওধু “আসসালা-মু ‘আলায়কুম” বলে সালাম ফিরাভেন- (নাসায়ী ৪৮ পৃষ্ঠা)। মোট কথা তিন রকমই বলা রসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত হয়েছে। এখন আপনারা যেটা ইচ্ছা সেটা বলতে পারেন। তবে যত বেশী শব্দ বলবেন তত বেশী নেকী পাবেন।

### একদিকে সালাম ফেরানো প্রসঙ্গে

তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, ইবনে হিব্বান, ইবনে আবী শায়বা, হাকিম, দারাকুতনী ও তাবারানী প্রভৃতি হাদীস গ্রন্থসমূহে চারটি রিওয়াযাতে এমন রয়েছে যদ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহর রসূল ﷺ একদিকে সালাম ফিরিয়ে নামায শেষ করেছেন। সেজন্য কিছু আলেমের ফাতওয়া হল এ যে, একদিকে সালাম ফিরালেও কাজ চলে যাবে, দু’দিকে ফিরতে হবে না। এ ব্যাপারে তথ্যান্বেষী মনীযী হাকিম ইবনুল কাইয়িম জাওয়াযী বলেন, ঐ সমস্ত রিওয়াযাতের মধ্যে একটি হাদীসও সহীহ নয়, বরং সবগুলো হাদীস কোন না কোন দোষে দুষ্ট। যেমন ‘আয়িশা (রাঃ)-এর রিওয়াযাতে যুহায়র ইবনে মুহাম্মাদ নামক রাবী রয়েছেন, যিনি সবারই নিকটে যয়ীফ। সুতরাং ঐ হাদীসটি যয়ীফ। তাছাড়া ঐ হাদীসটিতে রাতের নামাযের কথা আছে। ফরয, সুন্নাত বা নফলের কথা নেই। আনাসের রিওয়াযাতে আইয়ূব সাখতিয়ানী নামক একজন রাবী আছেন, যিনি জীবনে আনাস থেকে কোন হাদীসই শোনেনি। এরূপ আরো রিওয়াযাতের অবস্থাও এরূপ।

পক্ষান্তরে যারা দু’দিকে সালাম ফেরার কথা বলেন তাদের কাছে এমন ৫ জন সাহাবী রয়েছেন যারা আল্লাহর নাবীকে ফরয ও নফল নামাযে স্বচক্ষে দু’দিকে সালাম ফিরতে দেখেছেন। এ ব্যাপারে বহু হাদীস রয়েছে। যার মধ্যে অধিকাংশ হাদীস সহীহ এবং বাকিগুলো হাসান। যয়ীফ একটাও নেই। (যাদুল মাআদ ১ম খণ্ড ৬৬-৬৭ পৃঃ)

এ প্রসঙ্গে এটাও উল্লেখযোগ্য যে, আহলে বায়ত ও মালিকীরা ডানে, বামে ও সামনে মোট তিন সালামের কথা বলেন। কিন্তু তাদের এ কথার প্রমাণে কোন হাদীস তো দূরের কথা, যয়ীফ হাদীসও নেই। এটা তাদের মনগড়া কল্পনা। সুতরাং ওর ওপর আমল করা চলবে না।



ইমাম বুখারী মালিকীদের এ মতের প্রতিবাদ করেছেন, যেমন ইবনে হাজার আসকালানী মন্তব্য করেছেন। (ফাতহুল বারী ২য় খণ্ড ৩২৪ পৃঃ)

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, সালাম সংক্ষেপে বলা সুন্নাত। এর ব্যাখ্যায় ইবনে মুবারক বলেন, খুব বেশী টান দিয়ে বলবে না। আরো বিশদভাবে ইব্রাহীম নাখরী বলেছেন, তাকবীরে আকবার শব্দের শেষ হরফ “রা” এবং ওয়ারহমাতুল্লাহ শব্দের শেষ বর্ণ “হ”-তে জযম হবে- (তিরমিযী ১ম খণ্ড ৩৯ পৃঃ)। অর্থাৎ ঐ দুই বর্ণে পেশ ও যের কোন হরকতই হবে না, বরং সাকিন হবে। তাই মাথা দুলিয়ে খুব টান দিয়ে “আসসালা-মু ‘আলাইকুম ওয়ারহমাতুল্লাহ-হ” না বলে একটু জলদি বলতে হবে- (তালখীসুল হাবীর ৮৪ পৃঃ)।

কেউ কেউ প্রথম সালামে রহমাতুল্লাহি অর্থাৎ ‘হি’ বর্ণে যের দিয়ে বলে দম না ছেড়েই দ্বিতীয় বারে ‘হি’ সাকিন করে রহমাতুল্লাহ-হ বলে। এটাও তাদের ভুল।

## নামাযের পর আত্মাহর যিকর

১। আত্মাহর রসূল ﷺ ফরয নামাযের সালাম ফিরেই আত্মাহ আকবার জোরে বলতেন। ইবনে ‘আব্বাস (রাঃ) বলেন, আমি ঐ তাকবীর শুনে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামায শেষ হওয়া বুঝতে পারতাম। (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৮৮ পৃঃ)

২। তারপর তিনবার বলতেন, اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ আস্তাগফিরুল্লাহ। অর্থাৎ নামাযে যে ভুলচুক হয়েছে আমি আত্মাহর কাছে তার ক্ষমা চাচ্ছি। তারপর এ দু’আ তিনি একবার পড়তেন

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ

উচ্চারণ : আত্মাহ-হুয়া আস্তাস সালাম ওয়ামিনকাস সালাম তাবারাকতা ইয়া-যাল জালা-লি ওয়ালইকরাম।

তরজমা : হে আত্মাহ! তুমি শান্তিময় এবং তোমা হতেই শান্তি উৎসারিত হয়। তুমি বরকতময়! হে মাহাত্ম্য ও সম্মানের অধিকারী! (মুসলিম, মিশকাত ৮৮ পৃঃ)

‘আয়িশা (রাঃ) বলেন, আত্মাহর রসূল ﷺ আত্মাহ-হুয়া আন্তাস সালাম হতে ওয়ালইকরাম পড়া পর্যন্ত বসে থাকতেন- (মুসলিম, মিশকাত ৮৮ পৃঃ)। অর্থাৎ

তিনি (ﷺ) উল্লেখিত তিনটি দু'আ কিবলামুখী হয়ে পড়তেন তারপর ডান বা বাম পশ হয়ে মুক্তাদীদের দিকে মুখ ঘুরিয়ে বসতেন— (মিরআতুল মাফা-তীহ ১ম খণ্ড ৭৭১ পৃঃ)।

মোল্লা আলী কারী হানাফী বলেন, শায়খ জাযারী তাসহীহুল মাসাবীহতে বলেছেন, উক্ত দু'আতে 'ওয়ামিনকাস সালামের পর ওয়া ইলায়কা ইয়ারজিউস সালাম ওয়াহাইয়িনা রব্বানা বিস সালাম, ওয়াআদখিলনা দারাকা দা-রাস সালাম-শব্দগুলো ভিত্তিহীন। বরং এগুলো কাহিনীকারদের তৈরীকৃত জাল শব্দ। (মিশকাত ২য় খণ্ড ১৮ পৃঃ, মারাকিল ফালাহ ১৭০ পৃঃ)

৪। মু'আয ইবনে জাবাল (রাঃ) বলেন, একদা আব্বাহর রসূল (ﷺ) আমার হাত ধরে বললেন, আমি তোমায় ভালবাসি। তখন আমি বললাম, আমি আপনাকে ভালবাসি। অতঃপর তিনি বললেন, তাহলে বন্ধু! এ দু'আটা নামাযের পর পড়তে কখনো ছেড়ে দিও না।

رَبِّ اَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ.

উচ্চারণ : রব্বি আ'ইনী 'আলা যিকরিকা ওয়াশুকরিকা ওয়াহুসনি ইবা-দাতিকা।

তরজমা : হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে তোমার যিকর করার, তোমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার ও তোমার উৎকৃষ্ট ইবাদত করার কাজে মদদ কর। (আহমাদ, নাসায়ী, আবু দাউদ, মিশকাত ৮৮ পৃঃ)

কোন কোন রিওয়ায়াতে “রব্বের” জায়গায় ‘আল্লা-হুয়া’ শব্দ আছে।

৫। মুগীরা ইবনে শু'বা (রাঃ) বলেন, নাবী (ﷺ) প্রত্যেক ফরয নামাযের পর এ দু'আ পড়তেন :

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ  
عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ \* اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا  
مَنْعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ \*

উচ্চারণ : লা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহুদাহ্ লা- শারীকা লাহ্ লাহল্ মুলকু ওয়ালাহল্ হাম্দু ওয়াহুওয়া 'আলা- কুল্লি শাইয়িন কাদীর ০ আল্লা-হুয়া লা-মা-নি'আ

লিমা- আ'তাইতা ওয়ালা- মু'তিয়া লিমা-মানা'তা ওয়ালা-ইয়ানফা'উ যাল জাদি মিনকাল জাদু।

তরজমা : একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কেউই ইবাদতের যোগ্য নয়। তাঁর কোন শরীক নেই। সব রকম মালিকানা তাঁরই এবং যাবতীয় প্রশংসা তাঁরই। আর তিনি সমস্ত জিনিসের উপরে ক্ষমতাবান। হে আল্লাহ! তুমি যা দান কর তা কেউ রোধ করতে পারে না এবং তুমি যা না দাও তা কেউ দিতে পারে না। আর কোন মর্যাদাবানের মর্যাদা তাকে তোমার নিকট থেকে কোন উপকারে পাইয়ে দিতে পারে না। (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৮৮ পৃঃ)

৬। সা'দ (রাঃ) তাঁর সন্তানদেরকে এ শব্দগুলো শিক্ষা দিতেন এবং বলতেন যে, রসূলুল্লাহ ﷺ এগুলো দিয়ে প্রত্যেক নামাযের পরে আল্লাহর কাছে পানাহ চাইতেন :

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَرْزَلِ الْعُمُرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْقَبْرِ.

বাংলা উচ্চারণ : আল্লা-হুয়া ইন্নী আ'উযুবিকা মিনাল জুব্বনি ওয়াআ'উযুবিকা মিনাল বুখলি ওয়াআ'উযুবিকা মিন আরযালিল 'উমুরি ওয়াআ'উযুবিকা মিন ফিতনাতিদুদনয়া ওয়া'আযা-বিল কাব্রি।

তরজমা : হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে কাপুরুষতা, কপণতা, বার্ধক্যের লাঞ্ছনা-গঞ্জনা এবং দুনিয়ার ফিতনা ফাসাদ ও কুবরের আযাব থেকে মুক্তি পাবার আশ্রয় ভিক্ষা করছি। (বুখারী, মিশকাত ৮৮ পৃষ্ঠা)

নোট : সহীহুল বুখারীর অন্য বর্ণনায় “আরযালিল ‘উমুর” শব্দের আগে ‘আন আরুদ্দা ইলা’ শব্দগুলো বাড়তি আছে। (বুলুগুল মারাম ২৩ পৃঃ)

৭। আবু উমামাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরয নামাযের পর আয়া-তুল কুরসী পড়বে তাকে মওত ছাড়া আর কোন জিনিসই জান্নাত থেকে বাধা দিতে পারবে না- (নাসায়ী, ইবনে হিব্বান)। তাবারানীতে আয়াতুল কুরসীর সাথে সূরা ইখলাসের কথাও আছে- (বুলুগুল মারাম ২৪ পৃঃ)। বায়হাকীর রিওয়াযাতে এ কথাগুলো বাড়তি আছে- যে ব্যক্তি শোবার সময় আয়াতুল কুরসী পাঠ করবে আল্লাহ তা'আলা তার ঘরকে, তার পড়শীর

ঘরকে এবং পড়শীর ঘরের আশেপাশের ঘরগুলোকে বিপদাপদ থেকে নিরাপদ রাখবেন। কিন্তু ইমাম বায়হাকী বলেন, এ হাদীসটির সনদ যরীফ- (মিশকাত ৮৮ পৃঃ)। আয়াতুল কুরসী এই :

اَللّٰهُ لَا اِلَهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ لَا تَاْخُذُ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ لَّهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِى يَشْفَعُ عِنْدَهٗ اِلَّا بِاِذْنِهٖ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُوْنَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖ اِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهٗ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَلَا يَـُٔودُهٗ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِىُّ الْعَظِيْمُ ﴿

উচ্চারণ : আল্লা-হু লা- ইলা-হা ইল্লা হুওয়াল হাইয়ুল ক্বাইয়ুম \* লা- তা'খুযুহু সিনাতু'ও ওয়ালা- নাওম \* লাহু- মা ফিস্সামা-ওয়া-তি ওয়ামা-ফিল আরযি \* মান্যাল্লাযী ইয়াশফা'উ 'ইনদাহু ইল্লা বিইয়নিহী \* ইয়া'লামু মা- বায়না আইদীহিম ওয়ামা- খালফাহুম \* ওয়ালা ইউহীতুনা বিশাইয়িম মিন 'ইলমিহী ইল্লা- বিমা শা-আ \* ওয়াসি'আ কুরসিইয়ুহুস সামা-ওয়া-তি ওয়াল আরয \* ওয়ালা ইয়াউদুহু হিফযুহুমা \* ওয়াহুওয়াল 'আলিইয়ুল 'আযীম\*

তরজমা : আল্লাহ ছাড়া 'ইবাদতের যোগ্য আর কেউ নাই, যিনি চিরজীবী-চিরস্থায়ী। তাঁকে তন্দ্রা এবং নিদ্রা ছুঁতেই পারে না। আসমানসমূহে ও যমীনে যা কিছু আছে সবই তাঁরই অধীনে। কে এমন আছে যে, তাঁর বিনা অনুমতিতে তাঁর কাছে (কারো জন্য) সুপারিশ করতে পারে? তিনি মানুষের সামনের ও পিছনের সব ব্যাপারেই জানেন। কিন্তু মানুষ তাঁর জ্ঞানের বিন্দু বিসর্গ জিনিসকেও আয়ত্ত্ব করতে পারে না। তাঁর সিংহাসন সমগ্র আসমানসমূহ ও যমীনে ব্যপ্ত আছে। আসমান ও যমীনের দেখাশোনা তাঁকে ক্লান্ত করতে পারে না। কারণ, তিনি হলেন, (এসব দোষ হতে) বহু উন্নত ও মহান।

৮। 'উকবা ইবনে 'আমির (রাঃ) বলেন, আমাকে আল্লাহর রসূল ﷺ প্রত্যেক নামাযের পরে মুআওবিযাত (সূরা না-স ও সূরা ফালাক) পড়ার হুকুম দিয়েছেন। (আহমাদ, আবু দাউদ, নাসায়ী, বায়হাকী, মিশকাত ৮৮ পৃঃ)

৯। আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি প্রত্যেক নামাযের পরে 'সুবহা-নাল্লাহ' ৩৩ বার, 'আলহামদুলিল্লাহ' ৩৩ বার এবং

‘আল্লাহ আকবার’ ৩৪ বার পড়ে অথবা উক্ত তিনটি তাসবীহ ৩৩ বার পড়ার পর ‘লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহুদাহ- লা- শারীকা লাহ ০ লাহল মুলকু ওয়ালাহল হামদু ওয়াহুয়া ‘আলা কুল্লি শাইয়িন কাদীর’ ১ বার পড়ে ১০০ বার পূর্ণ করবে তার সমস্ত গুনাহ মাফ হয়ে যাবে, যদিও তা সমুদ্রের ফেনার মত হয়। (মুসলিম, বুলুগল মারাম ২৪ পৃঃ, মিশকাত ৮৯ পৃঃ)

আল্লাহর রসূল ﷺ উপরোল্লিখিত দু‘আগুলো নামাযের জায়গায় বসে বসে হাত না তুলেই পড়তেন। এ হাদীসগুলো থেকে রসূলুল্লাহর কথা ও কাজের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, পাঁচ ওয়াক্তের ফরয নামাযের পর উল্লেখিত দু‘আগুলো পড়া সুন্নাত। সাহাবায়ে কিরাম তাঁকে এরূপ আমল করতে দেখেছেন এবং পড়তে শুনেছেন। সেজন্য তাঁরাও এরূপ আমল করতেন। অতএব যারা এ দু‘আগুলো ফরয নামাযের পর না পড়ে সুন্নাত ও নফলের পর পড়েন এবং যারা কেবল ফজর ও আসর নামাযের পর পড়েন অথচ যোহর মাগরিব ও এশার নামাযের পর এ দু‘আগুলো পড়েন না তারা ভুল করেন এবং সুন্নতের খেলাফ কাজ করেন— (হিদায়াতুন নাবী ১৪১ পৃঃ)। এ দু‘আগুলো যদি কোন মুক্তাদী নামাযের জায়গায় বসে বসে পড়ে তা খুবই উত্তম। আর যদি কেউ সালাম ফেরার পর উঠে গিয়ে রাস্তায় কিংবা ঘরে গিয়ে পড়ে তাও জাযিয়— (ঐ ১৫৪ পৃঃ)।

প্রকাশ থাকে যে, রসূলুল্লাহ ﷺ এবং সাহাবায়ে কিরাম সুন্নাত ও নফল নামাযগুলো প্রায়ই মাসজিদে না পড়ে ঘরে গিয়ে পড়তেন। যেমন ‘আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ বলেন, একদা আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলাম, আমার কোন নামাযটা উত্তম? আমার ঘরের নামায না মাসজিদের নামায? তিনি (ﷺ) বললেন, তুমি কি দেখনি যে, আমার ঘর মাসজিদের কত কাছে? তথাপি আমি আমার ঘরে নামায পড়াকে আমার মাসজিদে নামায পড়ার চেয়ে বেশী পছন্দ করি। তবে হাঁ, ফরয নামায নয়। (আহমাদ, ইবনে মাজাহ, ইবনে খুযায়মা ২য় খণ্ড ২১০ পৃঃ)

## নামাযের পর মাথায় হাত রেখে দু‘আ পড়া

আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নাবীয়ে কারীম ﷺ যখন নামাযের শেষে সালাম ফিরাতেন তখন ডান হাতটি নিজের মাথায় ফিরিয়ে এ দু‘আ পড়তেন :

بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ اللَّهُمَّ أَذْهِبْ عَنِّي أَلَمَ  
وَالْحُزْنَ.

উচ্চারণ : বিসমিল্লাহিদ্দাযী লা- ইলা-হা ইল্লা হওয়ার রহমানুর রাহীম ০  
আল্লাহ্মা আযহিব 'আল্লিল হায্মা ওয়ালহুযনা ০

তরজমা : সেই আল্লাহর নামে (মাথায় হাত রাখছি) যিনি ছাড়া ইবাদতের  
যোগ্য আর কেউ নেই। যিনি পরম করুণাময়, অসীম দয়াময়। অতএব আল্লাহ  
গো! তুমি আমার চিন্তাভাবনা ও দুঃখ বেদনা দূর কর— (তাবারানী, নায়লুল আওতার  
২য় খণ্ড ২০৫ পৃঃ, মুসনাদে বাযযার, মাজ মাউযযাওয়ায়িদ ১০ম খণ্ড ১১০ পৃঃ)।  
ইবনে সুন্নীর আমালুল ইয়াওমি ওয়াল্লাইলার ৩১ পৃষ্ঠায় দু'আটি এরূপ আছে :

বাংলা উচ্চারণ : আশ্হাদু আল্লা- ইলা-হা ইল্লা- হওয়ার রহমানুর রাহীম,  
আলহামদু লিল্লাহিদ্দাযী আযহাবা 'আল্লিল হায্মা ওয়ালহুযনা ০

উক্ত হাদীসটির তাবারানী আওসাতের সনদ ও খাতীবের সূত্রকে আল্লামা  
আলবানী অতি যয়ীফ বলেছেন এবং ইবনে সুন্নী ও আবু নু'আইমের রিওয়াযাতকে  
জাল বলেছেন। কিন্তু তিনি এও বলেছেন যে, এ হাদীসটি আল্লামা সুমুতী  
আলজা-মি-তি খাতীব থেকে বর্ণনা করেছেন। অথচ ওর ব্যাখ্যা লেখক ঐ  
হাদীসের বিরুদ্ধে কিছুই বলেননি— (সিলসিলাতুল আহাদীসিয় যায়ীফাহ ২য় খণ্ড  
১১৪ পৃঃ)। এ হাদীসের একটি সূত্র আপত্তিকর নয়। সুতরাং মনগড়া দু'আ  
'ইয়া-কাবিইয়ু' পড়ার চেয়ে উক্ত দু'আটিও পড়া চলে। আল্লামা আব্দুল অহহাব  
সাদকী বলেন, কিছু মৌলভী সালাম ফেরানোর পর মাথায় হাত রাখাকে বিদআত  
বলে, তা ঠিক নয়। এটা তাদের কম বিদ্যার ও কম বুদ্ধির পরিচায়ক। আল্লাহ  
তাদের হিফাযত করুন। অনেক লোক অবশ্য মাথায় হাত ফেরায়, কিন্তু তারা এ  
সুন্নাতী দু'আ না পড়ে নিজেদের বানোয়াট দু'আ যেমন 'ইয়া কাবিইয়ু' ইত্যাদি  
পড়ে। তা সম্পূর্ণ বিদআত— (হিদায়াতুন নাবী ১৫৭-১৫৯ পৃঃ)।

## আঙ্গুলে তাসবীহ গোনা সুন্নাত

এক মুহাজির নারী ইউসাইরাহ (রাঃ) বলেন, একদা আল্লাহর রসূল ﷺ  
আমাদেরকে বলেন, তোমরা আঙ্গুল দিয়ে গুনে গুনে তাসবীহ ও তাহলীল পাঠ

করবে এবং (আল্লাহর প্রতি) গাফিল থাকবে না। অন্যথায় আল্লাহর রহমত তোমাদেরকে ভুলে যাবে। কারণ ঐ আঙ্গুলগুলোকে (কিয়ামাতের মাঠে) প্রশ্ন করা হবে, তখন তারা বলতে থাকবে অর্থাৎ ঐ তাসবীহ গোনার সাক্ষ্য দেবে— (তিরমিযী, আবু দাউদ, মিশকাত ২০২ পৃঃ)। ইবনে উমর বলেন, আমি আল্লাহর রসূল ﷺ-কে আঙ্গুল দিয়ে তাসবীহ গুনতে দেখেছি— (আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী ও হাকিম)। আবু দাউদের অন্য রিওয়ায়াতে আছে যে, তিনি (ﷺ) ডান হাতে গুনতেন— (আবু দাউদ ১ম খণ্ড ১০ পৃঃ, নায়লুল আওতার ২য় খণ্ড ২১১ পৃঃ)।

উল্লেখিত দু'টি রিওয়ায়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আঙ্গুলে তাসবীহ গোনা রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সূনাত এবং তাসবীহ দানা ও জপমালা প্রভৃতির দানাগুলো কিয়ামতের মাঠে সাক্ষ্য দেবে কিনা এর কোন প্রমাণ হাদীসে আমি পাইনি। পক্ষান্তরে আঙ্গুলগুলো যে সাক্ষ্য দেবে তার প্রমাণ সহীহ হাদীসে রয়েছে। তাছাড়া তাসবীহ দানাতে অনেক সময় রিয়া বা লোক দেখানো ভাবও আসতে পারে। সুতরাং আঙ্গুলে তাসবীহ গোনা উত্তম। ইউসাইরাহ (রাঃ) বর্ণিত হাদীস দ্বারা বোঝা যায় যে, দুই হাতেরই আঙ্গুল দ্বারা তাসবীহ গোনা যেতে পারে। আল্লাহর রসূল ﷺ বাম হাতে গুনেছেন কিনা তার প্রমাণ আমি পাইনি। কিন্তু কেবল ডান হাতে গোনা অতি উত্তম প্রকৃত সূনাত সম্মত।

আল্লাহর রসূলের সামনে কোন কোন সাহাবী খেজুরের দানা, তাসবীহ দানা ও কাঁকর প্রভৃতি দ্বারাও তাসবীহ গুনেছেন। কিন্তু তিনি (ﷺ) তাতে কোনরূপ আপত্তি করেননি— (আবু দাউদ, তিরমিযী, নায়লুল আওতার ২য় খণ্ড ২১১ পৃঃ)। সেজন্য তাসবীহ দানা প্রভৃতি দ্বারা তাসবীহ গুনতে মানা নেই। তবে রসূলুল্লাহ ﷺ নিজে আঙ্গুল ছাড়া অন্য কিছু দ্বারা তাসবীহ গোনেননি বলে আঙ্গুল দ্বারা তাসবীহ গোনা উত্তম।

বাংলাদেশের মাওলানা আব্দুল্লাহ ইবনে ফযল মরহুম লিখেছেন, কেউ কেউ তাসবীহ পাঠের জন্য স্বতন্ত্র মালা বা তাসবীহ ছড়া ব্যবহার করে থাকেন। এটা সূনাতের অনুকূল নয়— (সহীহ নামায ও দু'আ শিক্ষা ২য় খণ্ড ১০১ পৃঃ)। কথাটা ঠিক নয়। কারণ উপরোল্লিখিত হাদীসে আঙ্গুল ছাড়া অন্যান্য জিনিস দিয়েও তাসবীহ গোনার প্রমাণ রয়েছে। আবু হুরায়রার কাছে একটা সুতো ছিল, যাতে ২ হাজার গিরা ছিল। তিনি যতক্ষণ ঐ গিরাগুলো দ্বারা তাসবীহ না পড়তেন ততক্ষণ গুনতেন

না- (যাওয়ারিদুয যুহুদ, মুসনাদে আহমাদ)। তাছাড়া সালাফ ও খালাফ (পূর্ববর্তী ও পরবর্তী) উলামায়ে কিরামের কেউই স্বতন্ত্র তসবীহ মালা দ্বারা তাসবীহ গুনাতে আপত্তি করেননি- (নায়লুল আওতার ২য় খণ্ড ২১২ পৃঃ)।

## সংক্ষেপে রসূলুল্লাহ ﷺ এর নামাযের পূর্ণ বিবরণ

নামাযের সময় হলে রসূলুল্লাহ ﷺ অথু কিংবা গোসল অথবা তায়াম্মুম দ্বারা শরীর পাক করে নিয়ে পাক কাপড় পরে মাসজিদে গিয়ে কিংবা কোন পাক জায়গায় কিবলামুখী দাঁড়িয়ে দুই কাঁধের মাঝখানে যতটা দূরত্ব ততটা ফাঁক দুই পায়ের মাঝখানে রেখে নিয়ত নামক কোন রকম বানোয়াট বিদআতী শব্দ মুখে না নিয়ে এবং নামাযের পাটি বিছিয়ে কোন দু'আ না পড়ে, দুই হাত দু'টো কাঁধ বা কান পর্যন্ত তুলে, হাতের তালু দু'টো কিবলামুখী করে ও আঙ্গুলগুলো খোলা রেখে, আল্লাহ আকবার বলে সিনার ওপরে প্রথমে বাম হাত তারপরে বাম গজহাতের উপরে ডান গজ হাত রাখতেন এবং সিজদার জায়গার উপরে নযর রাখতেন। অতঃপর তিনি সানা, আ'উযুবিল্লাহ, বিসমিল্লাহ পড়ে সূরায়ে ফাতিহা পড়ার পর আমিন বলে একটু দম নিয়ে আবার বিসমিল্লাহ পড়ে অন্য সূরা কিংবা কুরআনের কোন আয়াত পড়ে পুনরায় একটু দম নিয়ে দুই হাত কাঁধ বা কান পর্যন্ত তুলে 'আল্লাহ আকবার' বলে রুকুতে যেতেন।

রুকুতে গিয়ে তিনি দুই হাত দিয়ে হাঁটু দু'টোকে মযবুত করে ধরতেন, হাতের আঙ্গুলগুলোর মাঝখানে ফাঁক রাখতেন, হাত দু'টো তীরের দড়ির মত সোজা রাখতেন এবং পাজরা থেকে তা দূরে রাখতেন আর কোমর ও মাথা এমনভাবে একেবারে সোজা রাখতেন যে, যদি তাঁর পিঠের উপরে পানি ভর্তি একটি পাত্র রাখা হতো তাহলে তা গড়িয়ে পড়তো না। এ সময়ও তাঁর নযর সিজদার জায়গায় থাকতো। অতঃপর তিনি পূর্বে বর্ণিত রুকুর দু'আ ১০ বার পড়ে "সামি'আল্লা-হ্ লিমান হামিদাহ" বলে রুকু থেকে মাথা তুলে আবার দুই হাত কাঁধ বা কান পর্যন্ত তুলে হাত দু'টো পাশে নামিয়ে রেখে কিংবা আবার বুকে হাত বেঁধে সোজা দাঁড়িয়ে ধীরস্থিরভাবে কওমার দুআ এত বেশী করে পড়তেন যতটা দেবী করতেন রুকুর দুআ পড়তে।

তারপর 'আল্লাহ আকবার' বলে প্রথমে দুই হাত ও পরে দুই হাঁটু যমীনে রেখে উচু করতঃ নাক ও কপাল যমীনে ঠেকিয়ে সিজদা দিতেন। তখন তাঁর



পায়ের আঙ্গুলগুলোর মাঝখানে ফাঁক থাকতো না। তাঁর হাত দু'টো যমীন, পাঞ্জরা ও উরু থেকে এতটা দূরে থাকতো যে, তাঁর বগলের ভেতর দিয়ে একটা বকরীর বাক্সা চলে যেতে পারতো এবং তিনি দুই উরুর মাঝখানে বেশ ফাঁক রেখে উরু দু'টোকে পায়ের ররা উঁচুতে রাখতে এবং হাত দু'টো কাঁধ বরাবর রাখতেন। তার হাত দু'টো কাঁধ বরাবর রাখতেন। অতঃপর সিজদার দু'আ ১০ বার পড়তেন, তারপর 'আল্লাহ্ আকবার' বলে মাথা তুলে দুই হাত উরুর ওপরে রাখতেন এবং ডান পা-র আঙ্গুলগুলো কিবলামুখী মুড়ে গোড়ালি খাড়া রেখে বাম পাটা বিছিয়ে দিয়ে তার উপরে পাছা রেখে বসতেন।

তারপর সোজা হয়ে বসে শান্তশিষ্টভাবে জলসার দু'আ অতক্ষণ ধরে পড়তেন যতক্ষণ ধরে সিজদার দু'আ পড়তেন। এ দুই সিজদার মাঝখানে বসার সময় তাঁর ডান হাতের শাহাদাত আঙ্গুলটি ইশারা করা অবস্থায় থাকতো। তারপর 'আল্লাহ্ আকবার' বলে প্রথম সিজদার নিয়মে তিনি দ্বিতীয় সিজদায় যেতেন এবং ১০ বার সিজদার দু'আ পড়ে 'আল্লাহ্ আকবার' বলে মাথা তুলতেন। অতঃপর সোজা হয়ে বসে দুই হাত যমীনে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াতেন এবং দুই হাত না তুলে প্রথমে রাক'আতের মত সীনার উপরে হাত বেঁধে সানা ও আ'উযুবিল্লাহ না পড়ে কেবল বিসমিল্লাহ ও সূরা ফাতিহা পড়ে, আমীন বলার পর একটু দম নিয়ে আবার বিসমিল্লাহ পড়ে কুরআনের কিছু অংশ পড়ার পড় একটু দম নিয়ে, দুই হাত কাঁধ পর্যন্ত তুলে 'আল্লাহ্ আকবার' বলে রুকুতে যেতেন।

অতঃপর প্রথম রাক'আতের মত রুকু ও সিজদার কাজ সেয়ে বসে বসে আন্তাহিয়াতু পড়ার পর দরুদ ও দু'আয়ে মাসূরা না পড়ে 'আল্লাহ্ আকবার' বলে দুই হাত যমীনে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াতেন এবং দুই হাত আবার কাঁধ পর্যন্ত তুলে সীনার উপরে হাত বাঁধতেন। অতঃপর সানা, আ'উযুবিল্লাহ না পড়ে কেবল বিসমিল্লাহ ও সূরায়ে ফাতিহা পড়ে আমীন বলে 'আল্লাহ্ আকবার' বলে দুই হাত কাঁধ পর্যন্ত তুলে রুকুতে যেতেন। তারপর প্রথম ও দ্বিতীয় রাক'আতের নিয়মে রুকু ও সিজদার কাজ সেয়ে দুই হাত যমীনে ভর দিয়ে ৪র্থ রাক'আতের জন্য উঠে দাঁড়াতেন। অতঃপর দুই হাত না তুলে সীনার উপর হাত বেঁধে ও আ'উযুবিল্লাহ না পড়ে কেবল বিসমিল্লাহ ও সূরায়ে ফাতিহা পড়ে আমীন বলার পর 'আল্লাহ্ আকবার' বলে দুই হাত কাঁধ বা কান পর্যন্ত তুলে রুকুতে যেতেন।

অতঃপর রুকু ও সিজদার কাজ সেরে ডান পায়ের আঙ্গুলগুলো কিবলামুখী মুড়ে গোড়ালি উঁচু করে বাম পা-টা ডান পায়ের রলার মাঝখান দিয়ে বের করে দিয়ে পাছার ভরে বসতেন এবং বাম হাতটা বাম উরু বা হাঁটুর উপর বিছিয়ে রেখে ও ডান হাতের কনিষ্ঠা ও অনামিকা আঙ্গুল দু'টো মুড়ে দিয়ে মধ্যমা ও বৃদ্ধা আঙ্গুল দু'টোর মাথা এক সাথে মিলিয়ে গোল করতঃ ডান উরু বা হাঁটুর ওপরে রাখতেন এবং শাহাদাত আঙ্গুলটি ইশারা করা অবস্থায় রেখে চোখের দৃষ্টি ঐ ইশারার ওপরে রেখে আস্তাহিয়াত, দরুদ ও দু'আয়ে মাসূরা পড়ার পর “আসসালা-মু আলায়কুম ওয়ারহমাতুল্লাহ” বলে প্রথমে ডানে ও পরে বামে মুখ ঘুরিয়ে সালাম ফিরাতেন

অতঃপর উক্টেঃস্বরে ‘আল্লাহ আকবার’ এবং তিনবার ‘আস্তাগফিরুল্লাহ’ বলে তারপর অন্যান্য দু'আ পড়তেন এবং তারপরে উঠে ঘরে চলে যেতেন। (সিহাহ সিভা, মুসনাদে আহমাদ, বায়হাকী, সহীহ ইবনে খুযায়মা, মুসান্নাফ আবদুর রায্যাক, ইবনে আবী শায়বা প্রভৃতি)

## সালামের পর ইমামের ফিরে বসা এবং পরক্ষণে উঠে যাওয়া সুন্নাত

সামুরাহ ইবনে জুনদুব বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ যখন (জামা'আতে) নামায শেষ করতেন তখন (সালাম ফেরার পর) আমাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বসতেন—(বুখারী ১১৭ পৃঃ)। আনাস বলেন, নাবী ﷺ সালামের পর ডান দিকে ফিরে বসতেন—(মুসলিম)। ‘আব্দুল্লাহ ইবনে মাস'উদ বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বহুবার সালামের পর বাম দিকে ফিরে বসতে দেখেছি—(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৮৭ পৃঃ)।

উল্লেখিত ৩টি হাদীস প্রমাণ করে যে, প্রত্যেক জামা'আতের নামাযে সালাম ফেরার পর ইমামের উচিত হল মুক্তাদীদের দিকে মুখ করে বসা। কখনো ডানদিকে ও কখনো বাম দিকে মুখ ফিরে বসা রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাত। আমাদের কিছু ইমাম কেবল ফজর ও আসরের জামা'আত বাদ মুক্তাদীদের দিকে ঘুরে বসেন। কিন্তু যোহর, মাগরিব ও এশার জামা'আতের পর মুক্তাদীদের দিকে মুখ ফিরিয়ে কিংবা ডানদিকে অথবা বামদিকে তাঁরা ঘুরে বসেন না-এটা তাদের মনগড়া কাজ। আল্লাহ আমাদের মনগড়া কাজ ত্যাগ করার এবং নাবীর সত্যিকার সুন্নাত মোতাবেক আমল করার তাওফীক দিন-আমীন।

এখানে একটা কথা জেনে রাখা উচিত যে, সালাম ফিরার পর রসূলুল্লাহ ﷺ ডানে কিংবা বামে অথবা মুক্তাদীদের দিকে মুখ করে বসার পর ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ উপমহাদেশের অধিকাংশ ইমামের মত মুক্তাদীদের সঙ্গে নিয়ে জামা'আত সহকারে হাত তুলে দু'আ করতেন না। বরং সামান্যক্ষণ বসে উঠে যেতেন। যেমন নাবী ﷺ-এর বিবি উম্মে সালামা (রাঃ) বলেন, নাবী ﷺ যখন সালাম ফিরাতেন তখন ঐ জায়গাতে একটু বসতেন। অন্য বর্ণনায় আছে, তাঁর ফিরে যাবার আগে মেয়েরা ফিরে গিয়ে তাদের ঘরে ঢুকে পড়ত। অর্থাৎ মেয়েদের ফিরে যাওয়া পর্যন্ত তিনি সামান্যক্ষণ বসে থাকতেন। তারপর উঠে যেতেন।

(বুখারী ১ম খণ্ড ১১৭ পৃঃ)

আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) বলেন, আমি নাবী ﷺ এর পেছনে নামায পড়েছি। তিনি সালাম ফিরিয়ে পর মুহূর্তে উঠে দাঁড়াতেন। তারপর আমি আবু বাকরের পেছনে নামায পড়েছি। তিনি যখন সালাম ফিরাতেন তখন লাফ দিয়ে উঠে পড়তেন। মনে হতো যে, তিনি যেন গরম পাথরের উপর থেকে উঠে পড়তেন। (মুসান্নাফ আবদুর রায্বাক ২য় খণ্ড ২৪৬ পৃঃ)

আবু রাযীন বলেন, আমি 'আলী (রাঃ)-এর পেছনে নামায পড়েছি। তিনি ডানে ও বামে সালাম ফিরালেন, তারপর লাফ দিয়ে উঠে পড়লেন। অন্য বর্ণনায় আছে, তাই 'উমর (রাঃ) বলেন, সালাম ফেরার পরও ইমামের (দীর্ঘক্ষণ) বসে থাকা বিদআত। (মুসান্নাফ ইবনে আবু শায়বা ১ম খণ্ড ৩০২ পৃঃ)

হাফিয ইবনুল কাইয়িম বলেন, সালাম ফেরার পর কিবলার দিকে কিংবা মুক্তাদীদের দিকে মুখ করে দু'আ করা নাবী ﷺ-এর সুন্নাত ছিল না। এ বিষয়টি তাঁর থেকে সহীহ (বিশুদ্ধ) কিংবা হাসান সনদেও বর্ণিত হয়নি। থাকল ফজর ও আসরের সাথে নির্দিষ্ট করা, এটাও তিনি করেননি এবং কোন খলীফাও করেননি এবং তিনি তাঁর উম্মাতকে এ কাজের নির্দেশও দেননি। (যাদুল মাআদ ১ম খণ্ড ৬৬ পৃঃ)

## নামাযের পর হাত তুলে দু'আ করা

আবু উমামাহ (রাঃ) বলেন, একদা নাবী ﷺ-কে জিজ্ঞেস করা হল, হে আল্লাহর রসূল! কোন্ দু'আ খুব বেশী কবুল হয়? তিনি বললেন, শেষ রাতের এবং ফরয নামাযগুলোর পরের দু'আ- (তিরমিযী, মিশকাত ৮৯ পৃঃ)। এ হাদীস দ্বারা

প্রমাণিত হয় যে, ফরয নামাযের পর দু'আ খুব বেশী কবুল হয়। সেজন্য ফরয নামাযের পর দু'আ করা উচিত। তবে একা একা দু'আ করা উচিত, জামা'আত সহকারে নয়।

সালমান (রাঃ) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, তোমাদের প্রভু খুবই লজ্জাশীল ও মহান। কারণ, যখন কোন বান্দা তাঁর কাছে দু'টো হাত উঠায় তখন তিনি সেই হাত দু'টোকে খালি ফেরত দিতে লজ্জাবোধ করেন- (তিরমিযী, আবু দাউদ, বায়হাকীর দা'ওয়া-তুল কাবীর, মিশকাত ১৯৫ পৃঃ)। এ হাদীস থেকে জানা যায় যে, হাত তুলে দু'আ করলে তা বৃথা যায় না।

ইবনে 'আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, যখন তোমরা আল্লাহর কাছে চাইবে তখন হাতের তালু দু'টো মুখের দিকে করে চাইবে এবং হাতের তালুটা উল্টো করে পিঠ দিয়ে চেয়ো না। আর যখন দু'আ শেষ করবে তখন হাত দু'টোকে মুখে বুলিয়ে নেবে। (আবু দাউদ, মিশকাত ১৯৫ পৃঃ)

সাহল ইবনে সাদ (রাঃ) বলেন, নাবী ﷺ দু'আ করবার সময় হাতের আঙ্গুলগুলোকে কাঁধ বরাবর উঠাতেন- (বায়হাকী, মিশকাত, ১৯৭ পৃঃ)। এ দু'টি হাদীস দ্বারা দু'আ করার নিয়ম জানা হয়।

উল্লেখিত ৪টি হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়, প্রত্যেক ফরয নামাযের পর কাঁধ বরাবর হাত তুলে দু'আ করা যেতে পারে। তবে হ্যাঁ, আল্লাহর রাসূল ﷺ মুখে এ কথাগুলো বললেও তিনি নিজে প্রত্যেক ফরয নামাযের পর হাত তুলে দু'আ করতেন না। মাত্র একবার নাকি করেছিলেন। যেমন আসওয়াদ আমিরী (রাঃ) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, আল্লাহর রসূল ﷺ ফজরের নামাযে সালাম ফেরার পর হাত তুলে দু'আ করেছেন- (মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বা)। এ হাদীস দ্বারা এ কথা প্রমাণিত হয় না যে, রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে ঐ দু'আতে সাহাবায়ি কিরাম-মুজাদীগণও শরীক হয়েছিলেন এবং আমীন আমীন বলেছিলেন। তাছাড়া এ হাদীসটি যযীফ। কারণ, এর সূত্র ছিন্ন, বিধায় পরিত্যাজ্য।

ইবনে সুনীর একটি মরফু রিওয়ায়াতে আছে, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি প্রত্যেক নামাযের পর হাত তুলে দু'আ করবে তার দু'আ কবুল হবে, রদ হবে না- (কিতাবু আমালিল ইয়াওমি ওয়াল লাইলাহ ৪৮ পৃঃ)। এ হাদীসটিও নিঃসন্দেহে যযীফ।

উক্ত দু'টি হাদীস সম্পর্কে আল্লামা উবায়দুল্লাহ রহমানী সাহেব বলেন, দু'টোরই সনদে দোষ আছে। সুতরাং ঐ হাদীস দু'টি দলীলের অযোগ্য। তাই আমার কাছে উত্তম ও সুন্নাহের নিকটবর্তী পথ এ যে, ইমাম সালাম ফিরে মুক্তাদীদের দিকে ঘুরে বসবে এবং হাত না তুলে দু'আয়ে মাসূরা বা অন্য দু'আ মনে মনে পড়বেন। তখন মুক্তাদীরা একা একা কিংবা সবাই মিলে মনে মনে দু'আয়ে মাসূরা বা অন্য সূরা পড়তে পারে। পাঁচ ওয়াক্তের নামাযে এক সাথে জামা'আত করে দু'আ ফরয নয়। সালাম ফেরার পর ইমাম সাহেবের উচ্চৈঃস্বরে দু'আ পড়া এবং মুক্তাদীদের উচ্চৈঃস্বরে আমীন বলা এবং এভাবে দু'আ করাকে অবশ্য করণীয় কাজ মনে করা সুন্নাহ হতে বহু দূরবর্তী পথ। যেসব উলামা ইমামের দু'আর সাথে মুক্তাদীদের চিহ্নে আমীন বলার পক্ষপাতী তাদের প্রমাণের ভিত্তি নিছক বিবেক ও কিয়াস (কোরাস থেকে প্রকাশিত মাসিক মুহাদ্দিস জুন ১৯৮২ সংখ্যা)।

তিনি আরো বলেন, 'ফাতওয়া সানায়িয়াহতে' ইবনে কাসীর বর্ণিত ইবনে আবী হাতিমের যে হাদীসটি পেশ করা হয়েছে তাতে দু'হাত তোলার কথা নেই এবং ফাতওয়া নাখিরিয়ায় তিন জায়গায় ইবনে আবী শায়বার বরাতে দিয়ে আসওয়াদ আমিরীর যে হাদীসটি পেশ করা হয়েছে তার সনদ ভুল। অতএব ঐ ফতওয়া ঠিক নয়। এরূপ তুহফাতুল আহওয়ায়ীওলাও বলেছেন যে, আমি ইবনে আবী শায়বা (রাঃ)-এর সনদ জানতে পারিনি- (মুহাদ্দিস, ঐ সংখ্যা)। তাই ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ (রহঃ) বলেন, সালাম ফেরার পর ইমামের কতিপয় দু'আয়ে মাসূরা পড়া সুন্নাহ এবং তা না পড়ে কিংবা তা পড়ার পরও প্রতি ওয়াক্তে জামা'আত সহকারে দু'আ করা বিদআত। তবে হ্যাঁ, কখনো কখনো বিশেষ কোন কারণে যদি নামাযের পর ইমাম ও মুক্তাদী মিলে দু'আ করেন তাহলে তাতে আপত্তি নেই- (ফাতওয়া ইবনে তাইমিয়াহ ২২খণ্ড ৫১৯ পৃঃ)।

হাফিয ইবনুল কাইয়িম (রহঃ) বলেন, কোন মুসল্লী যখন নামায থেকে ফারোগ হবে এবং নামাযের পরে 'লা- ইলা-হা ইল্লাল্লাহ', 'সুবহা-নাল্লাহ', 'আলহামদু লিল্লাহ', 'আল্লাহু আকবার' প্রভৃতি সুন্নাহী যিকরগুলো করবে তখন তার উচিত নাবী ﷺ-এর উপর দরুদ পড়া এবং যা ইচ্ছা দু'আ করা। তাহলে যিকরগুলোর পর ঐ দু'আটা দ্বিতীয় ইবাদাত হবে। তবে ঐ দু'আ যেন সালাম ফেরার পরই না হয়- (যা-দুল মাজাদ ১ম খণ্ড ৬৬ পৃঃ)। যেমন আমাদের কিছু ভাইয়েরা করে থাকে।

অর্থাৎ সালাম ফেরার পর একা একা যে যার ইচ্ছা মত যত পারেন দু'আ করা জাযিয়। কেউ যদি একা একা দু'আ করেন তাহলে নীচের দু'আগুলো পড়তে পারেন

## মুনাজাতের কতিপয় অর্থপূর্ণ দু'আ

মুনাজাতের অর্থ হল কানে কানে চুপে চুপে কথা বলা। বান্দা যখন দুই হাত তুলে আল্লাহর কাছে মুনাজাত করে তখন সে যেন আল্লাহর কাছে নিজের অভাব অভিযোগ পেশ করতঃ তার প্রতিকার কামনা করে। মুনাজাতের নিয়ম সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ ﷺ এক সাহাবীকে বলেন, প্রথমে আল্লাহর যথাযোগ্য তারীফ কর, অতঃপর আমার ওপর দরুদ পড়, তারপর নিজের জন্য দোয়া কর— (তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসায়ী)। 'আব্দুল্লাহ ইবনে মাস'উদ (রাঃ) বলেন, একদা আমি নামায পড়লাম। তখন নাবী ﷺ এবং তাঁর সাথে আবু বাক্র ও 'উমর (রাঃ) সেখানে উপস্থিত ছিলেন। অতঃপর আমি বসে গেলাম এবং আল্লাহর তারীফ শুরু করলাম। এরপর নাবী ﷺ বললেন, চাও, তোমাকে তা দেয়া হবে— (তিরমিযী, মিশকাত, ৮৬-৮৭ পৃঃ)। উল্লিখিত দু'টি হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, দু'আ করতে গেলে প্রথমে আল্লাহর তারীফ, অতঃপর রসূল ﷺ-এর ওপর দরুদ এবং সর্বশেষে নিজের জন্য দু'আ করতে হবে।

## আল্লাহর হাম্দ বা প্রশংসা

আল্লাহর তারীফ রাসুলুল্লাহ ﷺ বিভিন্নভাবে করতেন। তবে এর জন্য তাঁর ধরাবাঁধা কোন খাস হামদনামা ছিল না। দু'আতে আল্লাহর তারীফ করার সময় সূরা ফাতিহার শুরু থেকে নাস্তাঈন পর্যন্ত পড়া যথেষ্ট। তবে আল্লাহর প্রশংসায় ২৫ পারার শেষ এ আয়াতটি পড়লে মনে হয় বেশ ভাল হয় :

فَلِلّٰهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَهُ الْكِبَرُ  
فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ \*

উচ্চারণ : ফালিহ্লা-হিল হাম্দু রব্বিস সামা-ওয়াতি ওয়ারব্বিল আরযি রব্বিল 'আলামীন \* ওয়ালাহুল কিবরিয়া-উ ফিস্সামা-ওয়াতি ওয়াল আরযি ওয়াহুওয়াল  
'আযীযুল হাকীম।

তরজমা : আসমানসমূহ এবং যমীন তথা সর্বজগতের প্রভু আল্লাহরই জন্য সব রকম প্রশংসা এবং আসমানসমূহ ও যমীনে তাঁরই জন্য রয়েছে সব রকম মাহাত্ম্য ও মহিমা। আর তিনি হচ্ছেন সবার উপর কর্তৃত্বশালী ও তত্ত্বজ্ঞানী।

যদি কেউ দু'আতে আল্লাহর তারীফস্বরূপ এ আয়াতটি পড়েন তাহলে যোহর, আসর ও এশাতে পড়বেন এবং ফজর ও মাগরিবের সময় নিম্নের আয়াতটি পড়া ভাল :

فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ، وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ \*

উচ্চারণ : ফাসুবহা-নাল্লাহি হীনা তুমসূনা অহীনা তুসবিহুন \* ওয়ালাহল হাম্দু ফিস্সামা-ওয়াতি ওয়াল আরযি ওয়া'আশিয়্যাও ওয়াহীনা তুযহিরুন \*

তরজমা : আমরা আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছি যখন তোমরা সন্ধ্যা ও সকাল কর এবং বিকাল ও যোহর (দুপুর) কর। কারণ তাঁরই জন্য সব রকম প্রশংসা আসমানসমূহ ও যমীনে রয়েছে। (সূরা রুম ১৭-১৮ আয়াত)

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি প্রতিদিন সকাল ও সন্ধ্যায় (ফজর ও মাগরিবের সময়) উপরিউক্ত দু'টি এবং সেই সঙ্গে তারপরের আয়াতটি পড়ে তার যেসব নেকী দিনভর ছাড় যায় সেগুলো পেয়ে যায়। (আবু দাউদ, মিশকাত ২১০ পৃঃ)

এই হাম্দ পড়াতে উলামায়ে কিরামের তৈরীকৃত দু'আও পড়া যেতে পারে। তবে আমার মতে আল্লাহর প্রশংসা আল্লাহরই শেখান শব্দ দ্বারা করলে বেশী ভাল এবং এর দ্বারা কুরআন তিলাওয়াতের নেকীও পাওয়া যাবে।

## নাবীর উপরে দরুদ

আল্লাহর তারীফের পর রসূল ﷺ-এর উপরে যে দরুদ পড়তে হবে তা তাঁরই শেখানো দরুদ হলে খুব ভাল হয়। ঐ সুন্নাতী দরুদ এ বইয়ের ১৪৫ পৃষ্ঠায় দেখে নিন।

## কাকুতি মিনতির দু'আ

হাম্দ ও দরুদের পর নিজের জন্য কিছু চাওয়ার আগে আল্লাহর দরবারে একটু কাকুতি ও মিনতি করা যুক্তিসঙ্গত মনে হয়। সেজন্য পৃথিবীর সর্বপ্রথম ভুলকারী

আদম ('আঃ) অনুন্নয় বিনয় স্বরূপ যে শব্দগুলো আল্লাহর দরবারে পেশ করে আল্লাহর মন গলিয়েছিলেন সে শব্দগুলো বললে ভাল হয়। দু'আটি এ :

رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ \*

উচ্চারণ : রব্বানা য়ালামনা আনফুসানা আইললাম তাগফির লানা অতারহামনা লানাকুনান্না মিনাল খা-সিরীন।

তরজমা : হে আমাদের প্রভু! আমরা (স্বামী-স্ত্রী- দু'জনে) নিজেদের জানের উপর যুল্ম করে ফেলেছি। এমতাবস্থায় তুমি যদি আমাদেরকে মাফ না কর এবং আমাদের উপর দয়া না কর তাহলে আমরা নিশ্চয়ই ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে হয়ে যাব।

(সূরা আ'রাফ ২৩ আয়াত)

## নিজের জন্য দু'আ

এরপর নিজের জন্য চাইতে হলে আল্লাহর রসূল ﷺ-এর শেখানো এ দু'আটি সবচেয়ে উত্তম এবং দুনিয়া ও আখিরাতের সমস্ত কল্যাণে পরিপূর্ণ ও ব্যাপক অর্থপূর্ণ :

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ \*

উচ্চারণ : রব্বানা আ-তিনা ফিদ্দুনয়্যা হাসানাতাও ওয়াফিল আ-খিরাতি হাসানাতাও ওয়াকিনা 'আযাবান্না না-র।

তরজমা : হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে দুনিয়াতেও কল্যাণ দাও এবং আখিরাতেও মঙ্গল দিও আর জাহান্নামের আগুন থেকে আমাদের বাঁচাও।

(সূরা বাকারা ২০১ আয়াত)

বিখ্যাত সাহাবী আনাস (রাঃ) বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ উপরে বর্ণিত দু'আটি খুব বেশী করে পড়তেন— (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ২১৮ পৃঃ)। আনাস (রাঃ) বলেন, একদা রসূল ﷺ এক সাহাবীকে দেখতে যান। লোকটি পাখীর বাক্সের মত রোগা ও দুর্বল হয়ে গিয়েছিল। ফলে তিনি (ﷺ) তাকে শুধরালেন, তুমি আল্লাহর কাছে কোন দু'আ কর কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ এ দু'আ করতাম : হে আল্লাহ! তুমি আখিরাতে আমাকে যে 'আযাব দিতে চাও তা এ দুনিয়াতে জলদি দিয়ে দাও। তখন মহানবী ﷺ বললেন, সুবহানাল্লাহ! তুমি তো আশ্চর্য দু'আ করেছ! ঐ আযাব সহ্য করার শক্তি তোমার কোথায়? আরে ভাই! তুমি এ (অর্থাৎ



উপরের) দু'আটি করনি কেন? অতঃপর লোকটি ঐ দু'আ করল এবং আল্লাহ তা'আলাও তাকে ভাল করে দিলেন— (মুসলিম, মিশকাত ২২০ পৃঃ)।

## মা-বাপের জন্য দু'আ

কুরআন ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের পর সবচেয়ে শ্রদ্ধার পাত্র মা ও বাপ। সেজন্য “চাচা আপন জান বাঁচা” অনুযায়ী নিজের জন্য দু'আ করার পর মা বাবার জন্য দু'আ করা একান্ত অপরিহার্য। তাদের জন্য আল্লাহর শেখানো এ দু'আটি সবচেয়ে উত্তম :

رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا \*

উচ্চারণ : রব্বিরহামহুমা- কামা- রব্বাইয়ানী সগীরা।

তরজমা : হে আমার প্রভু! তাদের দু'জনের (অর্থাৎ মা ও বাপের) উপরে তুমি সেরূপ দয়া কর যেমন তারা দু'জনে আমাকে কচি বেলায় লালন পালন করেছিলেন। (সূরা বানী ইসরাঈল ২৪ আয়াত)

একটি হাদীসে রসূল ﷺ বলেন, যদি কোন বান্দার মা বাপ কিংবা একজন মারা যায় এবং সে যদি ওদের দু'জনের অবাধ্য সন্তান হয়, তাহলে সে ওদের জন্য দু'আ এবং ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকবে। ফলে আল্লাহ তাকে বাধ্য সন্তানের খাতায় অন্তর্ভুক্ত করবেন। (বায়হাকী, শু'আবুল ইমান, মিশকাত ৪২১ পৃঃ)

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আল্লাহ তা'আলা জান্নাতে নেক বান্দার মর্যাদা অবশ্যই বাড়াতে থাকেন। তখন সে বলে কী, হে প্রভু! এটা কি করে হল? আল্লাহ বলবেন, এটা তোমার সন্তানের ক্ষমা প্রার্থনার কারণে হয়েছে— (আহমাদ, মিশকাত ২০৬ পৃঃ) মা বাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনার উত্তম দু'আ এ :

رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ \*

উচ্চারণ : রব্বানাগফিরলী ওয়ালিওয়া-লিদাইয়া।

অর্থঃ প্রভু গো! আমাদেরকে এবং আমার মা বাপকে ক্ষমা কর।

(সূরা ইব্রাহীম ৪১ আয়াত)

## স্ত্রী ও সন্তানদের জন্য দু'আ

মা-বাপের পর মানুষের প্রিয়পাত্র হলো স্ত্রী ও ছেলে-মেয়ে। সেজন্য মা-বাপের কর্তব্য পালনের পর স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের হক আদায় করার নিমিত্ত আল্লাহর শেখানো এ দু'আ পড়া উচিত—

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ۝

উচ্চারণ : রব্বানা- হাবলানা- মিন আযওয়া-জিনা ওয়াযুররিইয়াতিনা কুররাতা আ'যুনি'ও ওয়াজ্'আলনা- লিলমুত্বাকীনা ইমামা।

তরজমা : হে আমাদের প্রভু! আমাদের স্ত্রী ও আমাদের ছেলে-মেয়েদের মধ্যে আমাদের জন্য চোখ জুড়ানো জিনিস দান কর এবং আমাদেরকে আল্লাহতীর্থ লোকদের ইমাম ও আদর্শ ব্যক্তি বানিয়ে দাও। (সূরা ফুরকান ৭৪ আয়াত)

অতএব নিজের জন্য এবং নিজের মা-বাপ ও ছেলে-মেয়েদের জন্য কল্যাণ কামনার পর প্রত্যেক মুসল্লীর অবশ্য কর্তব্য হল তার অন্যান্য মুসলিম ভাইয়ের জন্যও কল্যাণ কামনা করা। বিশ্ব মুসলিমের শুভ কামনার জন্য আল্লাহর শেখানো এ দু'আটি খুবই সুন্দর—

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَنَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ ۝

উচ্চারণ : রব্বানাগ ফিরলানা ওয়ালিইখওয়ানিনাল্লাযীনা সাবাকূনা- বিল ইমানি ওয়াল্লা- তাজ্'আল ফী কুলূবিনা গিল্লালিল্লাযীনা আ-মানূ রব্বানা ইল্লাকা রউফুর রহীম।

তরজমা : হে আমাদের প্রভু! আমাদের ক্ষমা কর এবং আমাদের সেই সব ভাইদেরও ক্ষমা কর যারা ঈমানের সাথে গত হয়ে গেছেন এবং আমাদের অন্তরে সেই সব জীবিত লোকদের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষভাব এনে দিওনা যারা ঈমান এনেছে। হে আমাদের রব! নিঃসন্দেহে তুমি দয়াময় করুণাময়।

(সূরায়ে হাশর ১০ আয়াত)

## সর্বদা আল্লাহর দয়া চাওয়ার দু‘আ

মানুষ আল্লাহর রহমত ও দয়া ছাড়া এক মুহূর্তও বাঁচতে পারে না। তাই আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, কোন ব্যক্তির আমল তাকে জান্নাতে নিয়ে যেতে পারবে না এবং জাহান্নাম থেকে নাযাত দিতেও পারবে না। এমনকি আমাকেও না, একমাত্র আল্লাহর রহমত ছাড়া— (মুসলিম, মিশকাত ২০৭ পৃঃ) সেজন্য প্রতি পলে পলে আল্লাহর রহমত কামনার জন্য নাবী ﷺ এ দু‘আ পড়তেন :

اَللّٰهُمَّ رَحْمَتَكَ اَرْجُوْهُ فَلَا تَكِلْنِيْ اِلٰى نَفْسِيْ طَرْفَةَ عَيْنٍ وَّاصْلِحْ لِيْ شَانِي كُلَّهُ لَا اِلَهَ اِلَّا اَنْتَ.

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা রহমাতাকা আরজু ফালা তাকিলনী ইলা নাক্সী তরফাতা আয়নিন ওয়াআসলিহ লী শা‘নী কুল্লাহ্ লা- ইলা-হা ইল্লা আনতা।

তরজমা : হে আল্লাহ! আমি (সর্বদা) তোমার রহমত কামনা করছি। অতএব তুমি চোখের পলকের মত এক মুহূর্তও আমাকে নিজের কাছে সোপর্দ কর না। আর তুমি আমার সব রকম অবস্থা ঠিকঠাক করে দিও। তুমি ছাড়া ইবাদতের যোগ্য আর কেউ নেই। (আবু দাউদ, মিশকাত ২১৫ পৃঃ)

## মুসলমান হয়ে মরার জন্য দু‘আ

আল্লাহ তা‘আলা বলেন, তোমরা মুসলমান না হয়ে মরিও না— (সূরাত আল ইমরান ১০২ আয়াত)। সুতরাং আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী মুসলমান হয়ে মরার জন্য কামনা করা প্রত্যেক মুসলমানের একান্ত কর্তব্য। এ কামনার জন্য আল্লাহর শেখানো ও ইউসুফ (‘আঃ)-এর মুখ দিয়ে বলানো নিম্নের দু‘আটি খুবই উৎকৃষ্ট।

فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ اَنْتَ وَلِيٌّ فِى الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِيْ مُسْلِمًا وَّالْحَقِّنِيْ بِالصَّلٰحِيْنَ.

উচ্চারণ : ফা-তিরাস্ সামা-ওয়ালি ওয়াল আরযি আনতা ওয়ালিল্লী ফিন্দুইয়া ওয়াল আখিরাহ তাঅফফানী মুসলিমাওঁ ওয়ালহিকনী বিস্-লিহীন।

তরজমা : হে আসমান ও যমীনের স্রষ্টা। তুমি ইহকালে এবং পরকালে আমার অভিভাবক। অতএব আমাকে মুসলমান করে মৃত্যু দিও এবং সৎলোকদের মধ্যে আমাকে शामिल করিও। (সূরা ইউসুফ ১০১ আয়াত)

## দেনা থেকে মুক্তির দু'আ

আজকের যুগে প্রায়ই লোক দেনায় জর্জরিত এবং সেজন্য দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। নাবী ﷺ দেনা থেকে মুক্তির জন্য আল্লাহর কাছে খুব বেশী করে পানাহ চাইতেন। ফলে এক সাহাবী তাঁকে দেনা থেকে এত বেশী মুক্তি চাওয়ার ব্যাপারে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, দেনাদার ব্যক্তি যখন কথা বলে মিথ্যা বলে এবং যখন ওয়াদা করে খেলাফ করে— (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৮৭ পৃঃ)। সহীহায়নের অন্য রিওয়াযাতে আছে যে, মিথ্যা বলা ও ওয়াদা খেলাফ করা মুনাফিকের চিহ্ন— (মিশকাত ১৭ পৃঃ)। সেজন্য এ দেনা ও চিন্তাভাবনা থেকে মুক্তির জন্য আল্লাহর রসূল ﷺ নিম্নোক্ত দু'আ শিখিয়েছেন—

اللَّهُمَّ اكْفِنِي بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ.

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মাক্ফিনী বিহালা-লিকা আন হারা-মিকা ওয়াআগ্ফিনী বিফাযলিকা 'আম্মান সিওয়াক।

তরজমা : হে আল্লাহ! তুমি তোমার হালাল দিয়ে আমাকে তোমার হারাম থেকে উদ্ধার কর এবং তোমার দান দিয়ে আমাকে তোমায় ছাড়া অন্য থেকে বেপরওয়া করে দাও। (তিরমিযী, বায়হাকী, মিশকাত ২১৬ পৃঃ)

## পাওনা গণ্ডা পুরোপুরি বুঝে নেয়ার দু'আ

যে কোন লোক কাজ করার পর তার পাওনা পুরোপুরি বুঝে নিতে চায়। সেজন্য মানুষের এ মানসিকতার দিকে লক্ষ্য রেখে তাদের পূর্ণ সন্তুষ্টির জন্য আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, যে পুরুষ ও নারী প্রত্যেক নামাযের পরে এ আয়াতগুলো ৩ বার পড়ে সে নিঃসন্দেহে পুরোপুরি মেপে সাওয়াব ও নেকী নিয়ে নেয়। (মুসনাদে আবু ইয়লা, তাবারানী, হিদায়েতুন নাবী ১৫৬ পৃঃ)

আয়াতগুলো এই—

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ  
لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

উচ্চারণ : সুবহানা রাব্বিকা রব্বিল 'ইযযাতি 'আম্মা- ইয়াসিফুন।  
ওয়াসালা-মুন 'আলাল মুরসালীন। ওয়ালহামদু লিল্লা-হি রব্বিল 'আ-লামীন।

তরজমা : তোমার প্রভু তথা সম্মানের প্রভু তাদের (অর্থাৎ কাফির ও মুশরিকদের) অপবাদসমূহ থেকে পবিত্র (আমি তা ঘোষণা করছি) এবং সমস্ত পয়গম্বরদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। আর সব রকম প্রশংসার একমাত্র মালিক সেই আল্লাহ যিনি সমস্ত জগতের প্রতিপালক। (সূরায়ে সফফাতের শেষ ৩টি আয়াত)

আমার মতে এ আয়াত দিয়ে মুনাজাত শেষ করলে ভাল হয়। কারণ মুনাজাত যেমন হামদ ও দরুদ দিয়ে শুরু হয়েছিল তেমনি এ আয়াতগুলো শেষ করলে সব নাবীরই উপরে সালাম ও দরুদ হয়ে যায় এবং সবশেষে আল্লাহর গুণও গাওয়া হয়।

অনেকে দু'আর শেষে 'লা- ইলাহা' কালিমা পড়ে থাকে তাহলে তিনি এভাবে বললে মানানসই হবে : আল্লাহুজ্জাজ 'আল- আ-খিরা কালামিনা লা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ'।

তরজমা : হে আল্লাহ! আমার জীবনের শেষ বাক্য কালিমা 'লা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ' করিও। কারণ, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, যে ব্যক্তির জীবনের শেষ বাক্য "লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ" হবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

(আবু দাউদ, মিশকাত ১৪১ পৃঃ)

## নামাযে কী করা চলবে ও কী চলবে না

নবীয়ে কারীম ﷺ বলেন, নামায পড়ার সময় সিজদার জায়গায় নজর রাখ-  
(বায়হাকী)। এদিক ওদিক চেয়ো না। কারণ এটা ধ্বংসের কারণ। যদি কোন কারণে একান্ত চাইতেই হয় তাহলে ফরয নামাযে নয়, নফল নামাযে চাইতে পার-  
(তিরমিযী)। তিনি বলেন, বান্দা যখন এক ধ্যানে নামায পড়ে তখন আল্লাহও তাঁর  
দিকে এক ধ্যানে চেয়ে থাকেন। কিন্তু যখন সে এদিক ওদিক চায় তখন আল্লাহও  
তাঁর নজর ফিরিয়ে নেন— (আবু দাউদ, নাসায়ী, দারিমী, মিশকাত ৯১)।

যারা নামাযে আসমানের দিকে চায় আল্লাহ তাদের দৃষ্টিশক্তি কেড়ে নিতে পারেন- (মুসলিম, মিশকাত ৯০ পৃঃ)। আল্লাহর রসূল ﷺ নামাযে কখনো কখনো ডানে ও বামে আড়চোখে দেখতেন, কিন্তু ঘাড় ঘোরাতে না- (তিরমিযী, নাসায়ী, মিশকাত ৯১ পৃঃ)।

তিনি (ﷺ) নামাযে কথা বলতে মানা করেছেন- (বুখারী ও মুসলিম, বুলুগুল মারাম ১৬ পৃঃ)। যদি কারো নামায পড়া অবস্থায় তাকে ডাকার বা তার কাছে কিছু চাওয়ার কারণে কথা বলার প্রয়োজন হয় তাহলে পুরুষ নামাযী 'সুবহা-নাল্লাহ' বলবে এবং মেয়ে নামাযী 'হাত তালি' দিবে। (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৯১ পৃঃ)

তিনি (ﷺ) বলেন, কেউ যদি সিজদার জায়গা থেকে ধুলো ঝাড়তে চায় তাহলে সে যেন মাত্র একবার ঝাড়ে (বার বার নয়)- (বুখারী, মুসলিম)। তোমাদের কেউ নামাযে দাঁড়িয়ে যেন সামনের কাঁকর না সরায় কারণ আল্লাহর রহমত তার সামনে থাকে- (আহমাদ, তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ, মিশকাত ৯০-৯১ পৃঃ)।

রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, নামাযে হাই ওঠা শয়তানী কাজ। যদি তোমাদের কারো নামাযে হাই ওঠে তাহলে সে যেন সাধ্যমত সেটাকে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করে এবং মুখে যেন হাত রাখে- (তিরমিযী)। কারণ শয়তান তার মুখে ঢুকে যায়- (মুসলিম)। আর সে যেন গাল হা করে "হাঃ হাঃ" না করে। কারণ, এটা শয়তানী কাজ। তাকে এরূপ করতে দেখে শয়তান হাসতে থাকে- (বুখারী, মিশকাত ৯০-৯১ পৃঃ)।

নবী (ﷺ) বলেন, যখন তোমাদের কেউ নামাযে থাকে তখন সে তার প্রভুর কানে কানে কথা বলে। সেজন্য সে যেন নিজের সামনে থুথু না ফেলে এবং ডান দিকেও না ফেলে বরং বাম দিকে পায়ের নীচে ফেলে- (বুখারী, মুসলিম, বুলুগুল মারাম ১৮ পৃঃ)। এবং সালাম ফেরার পর তা মুছে দেবে।

যদি কারো নামাযে অযু ভেঙ্গে যায় তাহলে সে যেন নাকে হাত রাখে, তারপর অযু করতে চলে যায়- (আবু দাউদ, মিশকাত ৯২ পৃঃ)। নাবী ﷺ-কে যখন সাহাবীরা নামাযের অবস্থায় সালাম করতেন তখন তিনি হাত দিয়ে ইশারা করতেন- (তিরমিযী, নাসায়ী ও মিশকাত ৯১ পৃঃ)। এ হাদীস প্রমাণ করে যে, অযু করা ও

ভাত খাওয়া অবস্থায় সালাম দেয়া এবং তার জওয়াব দেয়া নাজায়িয় নয়। যারা নাজায়িয় বলে তা তাদের মনগড়া ফাতওয়া।

রসূল ﷺ যখন নামায পড়তেন তখন কখনো কখনো তাঁর নাতনী উমামাহ বিনত যায়নাব তাঁর ঘাড়ে চড়ে থাকতো। ফলে তিনি রুকু ও সিজদার সময় তাকে নামিয়ে রাখতেন এবং দাঁড়াবার সময় আবার ঘাড়ে তুলে নিতেন— (বুখারী, মুসলিম, বুলুগুল মারাম ১৭ পৃঃ)। নামায পড়া অবস্থায় হাঁচি এলে ‘আলহাম্দু লিল্লাহ’ বলা চলবে— (আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী)। কিন্তু এর জবাবে ইয়ারহামুকাল্লাহ প্রভৃতি বলা চলবে না— (মুসলিম)। আল্লাহর রসূল ﷺ নামায পড়তে পড়তে আল্লাহর ভয়ে কাঁদতেন। তখন তাঁর ভেতর থেকে ঐরূপ আওয়াজ বের হোত যেমন হাঁড়িতে পানি ফুটলে আওয়াজ হয় অথবা যাঁতা ঘুরালে আওয়াজ হয়— (আহমাদ, নাসায়ী, আবু দাউদ, মিশকাত ৯০-৯১ পৃঃ)।

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, তোমাদের নামাযের মধ্যে সাপ ও বিছে মেরে ফেলো— (আহমাদ, তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসায়ী, মিশকাত ৯২ পৃঃ)। সিজদার জায়গা গরম হলে সেখানে কাঁকর রাখা যেতে পারে— (আবু দাউদ)। এবং জুতো পায়ে দিয়ে নামায পড়তে পারে— (আবু দাউদ, বুলুগুল মারাম ১৬ পৃঃ)। আল্লাহর রসূল ﷺ মুখ ঢেকে এবং দুই কাঁধের চাদরের কোণ বুলিয়ে নামায পড়তে মানা করেছেন— (আবু দাউদ, তিরমিযী, মিশকাত ৭৩ পৃঃ)। নামাযের সময় যে ব্যক্তি পায়ের গাঁটের নীচে পরনের কাপড় বুলিয়ে রাখে তার নামায কবুল হয় না— (আবু দাউদ, মিশকাত ৭৩ পৃঃ)। আল্লাহর রসূল নামাযে আঙ্গুল মটকাতোও নিষেধ করেছেন— (ইবনে মাজাহ ৬৯ পৃঃ)।

## কতিপয় মাহাত্ম্যপূর্ণ যিক্র ও অযীফা

আরবী যিক্র শব্দের শাব্দিক অর্থ স্মরণ করা। পরিভাষায় যিক্র বলা হয় বিশেষ দু'আর মাধ্যমে আল্লাহকে স্মরণ করা। এ যিক্র এর গুরুত্ব সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, আমার যিক্র যে ব্যক্তিকে আমার কাছে চাওয়া থেকে বিরত রাখে আমি তাকে এমন দান করি যা প্রার্থীদেরকে আমার দান করার চেয়ে উত্তম হয়।

(তাবারানী, আলওয়াবিলুস সাইয়িব ১৯১ পৃঃ)

আজকের যুগের মানুষ খুবই ব্যস্ত। তথাপি ঐ ব্যস্ততার মধ্যে তারা যদি প্রতিদিন ১৫/২০ মিনিট সময় বের করে নিম্নের অযীফাগুলো আমল করতে পারে তাহলে তারা ইহ-পরকালে খুবই লাভবান ও ভাগ্যবান হতে পারে।

## দিন ও রাতে নিরাপদ থাকার অযীফা

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যে বান্দা সকাল ও সন্ধ্যায় তিনবার করে নীচের দু'আটি পড়বে সে দিন ও রাতে নিরাপদে থাকবে- (তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, আবু দাউদ)। আবু দাউদের অন্য বর্ণনায় আছে যে, সেদিন ও রাতে হঠাৎ কোন বিপদে পড়বে না।-(মিশকাত ২০৯ পৃঃ)। দু'আটি এই :

بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ  
وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.

উচ্চারণ : বিসমিল্লাহিল্লাযী লা- ইয়াযুরুরু মা'আসমিহী শাইয়ুন ফিল আরযি ওয়াল্লা- ফিস্সামায়ি ওয়াহুওয়াস্ সামী'উল 'আলীম।

তরজমা : সেই আল্লাহর নাম নিষ্টি যার নামের গুণে আসমানে ও যমীনে কোন জিনিসই কষ্ট দিতে পারে না। আর তিনি (এই দু'আ) শ্রবণকারী জ্ঞানী।

## বিছার দংশন থেকে নিষ্কৃতির দু'আ

একদা এক ব্যক্তি নাবী (ﷺ)-এর কাছে এসে বলল, হে আল্লাহর রসূল! গত রাতে বিছার দংশনে আমি খুবই কষ্ট পেয়েছি। তখন তিনি (ﷺ) বললেন, তুমি যদি সন্ধ্যাবেলায় এ দু'আটি পড়তে তাহলে সে তোমাকে কষ্ট দিতে পারতো না। (মুসলিম, মিশকাত ২১৩ পৃঃ)

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ.

উচ্চারণ : আ'উযু বিকালিমাতিল্লা-হিত্ তা-ম্মাতি মিন্ শাররি মা- খালাক্।

তরজমা : আল্লাহর পূর্ণাঙ্গ বাক্য দ্বারা আমি তাঁর সৃষ্টির অনিষ্ট থেকে আশ্রয় কামনা করছি।

অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, ব্যক্তি সন্ধ্যা বেলায় ঐ দু'আটি তিনবার পড়বে তাকে কোন রকম বিষ ক্ষতি করতে পারবে না। ঐ হাদীসটির এক বর্ণনাকারী



সুহায়ল বলেন, আমাদের পরিবারের সবাই ঐ দু'আটি জ্ঞানত এবং প্রতি সন্ধ্যায় তারা ওটা পড়ত। অতঃপর ওদের মধ্যে একটি বাচ্চা মেয়েকে কোন বিষধর প্রাণী দংশন করে। কিন্তু সে ওর জন্য কোন বেদনাই পায়নি। (আহমাদ ইবনে হিব্বান, ইত্তিখাবুত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ৪র্থ খণ্ড)

## ইস্তিগফার বা ক্ষমা প্রার্থনার মাহাত্ম্য

মানুষ দুনিয়াদারী করতে গিয়ে কোন না ভুল করতে বাধ্য হয়। তখন তার অন্তরে একটি পর্দা পড়ে যায়। ঐ পর্দা সরানোর একমাত্র হাতিয়ার ইস্তিগফার। যেমন নাবী ﷺ বলেন, নিশ্চয় আমার হৃদয়েও পর্দা পড়ে। তখন আমি দিনে একশো বার আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি— (মুসলিম, মিশকাত ২০৩)। তাহলে আমাদের কতবার ক্ষমা প্রার্থনা করা দরকার!

ইস্তিগফারের জন্য অনেক রকম শব্দ হাদীসে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে নিম্নের শব্দগুলোকে সহীহ হাদীসে 'সাইয়িদুল ইস্তিগফার' বা ক্ষমা প্রার্থনার সরদার বলা হয়েছে :

اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ  
وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ  
وَأَبُوءُ بِذُنُوبِي فَاعْفُرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ.

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা আন্তা রব্বী লা- ইলা-হা ইল্লা- আন্তা খালাকতানী।  
ওয়াআনা- 'আবদুকা ওয়াআনা 'আলা- আহদিকা ওয়া ওয়া'দিকা মাসতাতাতু।  
আ'উযুবিকা মিন শাররি মা- সানা'তু। আবুউলাকা বিনি'মাতিকা 'আলাইয়্যা।  
ওয়াআবুউ বিয়ামবী ফাগফিরলী। ফাইন্নাহ লা- ইয়গফিরুন্ যুনুবা ইল্লা- আন্তা।

তরজমা : হে আল্লাহ! তুমি আমার প্রভু! তুমি ছাড়া কোন উপাস্য নেই। তুমি আমাকে পয়দা করেছ। আর আমি তোমার দাস এবং আমি তোমার দায়িত্বে ও প্রতিশ্রুতিতে আছি যতটা আমি পারি। আমি যা করেছি আমি তার অনিষ্ট থেকে আশ্রয় ভিক্ষা করছি। আমার উপরে তোমার অনুগ্রহের দরুন আমি তোমার কাছে রুজু করছি এবং আমি আমার গুনাহ নিয়ে ফিরে এসেছি। অতএব আমাকে ক্ষমা কর। কারণ, তুমি ছাড়া আর কেউই ক্ষমা করতে পারে না।

(বুখারী, মিশকাত ২০৪ পৃঃ)

উক্ত ইস্তিগফারের মাহাত্ম্য সম্পর্কে নবী ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি ওর উপর দৃঢ় বিশ্বাস রেখে সকাল ও সাঁঝে ঐ দু'আটি পড়বে সে ঐ দিন ও রাতে মারা গেলে জান্নাতবাসীদের অন্তর্ভুক্ত হবে- (বুখারী, মিশকাত ২০৪ পৃঃ)। বুয়ায়দার বর্ণনায় আছে, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, সে শহীদ হয়ে মরবে- (ইবনে সুন্নীর আমালুল ইয়াওমি ওয়াল্লাইলি ১২ পৃঃ)।

তিনি (ﷺ) বলেন, কেউ যদি তার আমলনামা দেখে খুশী হতে চায় তাহলে সে যেন ইস্তিগফার খুব বেশী করে- (তাবারানী আওসাত, হিসনে হাসীন ৪৩১ পৃঃ)। রসূল ﷺ কোন মজলিসে বসলে নীচের দু'আটি একশো বার পড়তেন- (তিরমিযী, আহমাদ, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, মিশকাত ২০৫ পৃঃ)। দু'আটি :

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَتُبْ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الْغَفُورُ

উচ্চারণ : রব্বিগফিরলী ওয়াতুব 'আলাইয়্যা ইন্নাকা আন্তাত তাউয়া-বুল গাফূর।

তরজমা : প্রভু গো! আমাকে ক্ষমা কর এবং আমার দু'আ কবুল কর। কারণ, নিশ্চয়ই তুমি তাওবা কবুলকারী ক্ষমাশীল।

নবী ﷺ বলেন, মৃত ব্যক্তি কবরে ডুবন্ত ব্যক্তির ন্যায়। সে তার বাপ কিংবা মা, অথবা ভাই বা বন্ধুর দু'আর অপেক্ষায় থাকে। তাই ঐ দু'আ যখন তার কাছে পৌছায় তখন দুনিয়া এবং দুনিয়াতে যা কিছু আছে তার চেয়েও বেশী প্রিয়, তাই কাছে ঐ দু'আটি মনে হয়। কারণ, যমীনবাসীদের দু'আকে আত্মাহুত তা'আলা পাহাড়গুলোর মত করে কবরবাসীদের কাছে পৌছে দেন। আর মৃত ব্যক্তিদের জন্য জীবিতদের উপহারই হল ইস্তিগফার ও ক্ষমা প্রার্থনা করা। (বায়হাকীর শু'আবুল ইমান, মিশকাত ২০৬ পৃঃ)

মা-বাবা, আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু সবারই ইস্তিগফারের জন্য ছোট দু'আ এইঃ

رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ \*

বাংলা উচ্চারণ : রব্বানাগফিরী ওয়ালিওয়ালিদাইয়্যা ওয়ালিল মু'মিনীনা ইয়াওমা ইয়াকুমুল হিসাব। (সূরা ইসরা ৪১ আয়াত)

তরজমা : হে আমাদের প্রভু! আমাকে এবং আমার মা-বাবাকে ও সমস্ত মু'মিনদেরকে ক্ষমা কর।

যদি কেউ কারো পেছনে নিন্দা করে ফেলে তাহলে সে তার খেসারত স্বরূপ এ ইস্তিগফার করবে। আল্লা-হুমাগফির লানা অলাহু অর্থাৎ আল্লাহ গো! তুমি আমাদেরকে এবং তাকে ক্ষমা কর। (বায়হাকী ফিদদা'ওয়াত, আলওয়াবিলুস সাইয়িব ২৯২ পৃঃ)

## ইস্তিগফারের ফল ইহকাল ও পরকালে

এই ক্ষমা প্রার্থনার কারণে মৃতদের যেমন লাভ হয় তেমনি ক্ষমা প্রার্থনাকারীও কম লাভবান হয় না। যেমন রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীদের জন্য ইস্তিগফার করে তার জন্য আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক মুমিন পুরুষ ও মু'মিন নারীর বদলে একটি করে নেকী লিখে দেন। (হিসনে হাসীন ৩৪২ পৃঃ)

ইস্তিগফারের ফল কেবল পরকালে নয়, ইহকালেও পাওয়া যায়। যেমন নাবী ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি খুব বেশী ইস্তিগফার করে আল্লাহ তা'আলা তার প্রত্যেক সন্ন্যাস থেকে তাকে মুক্তির পথ তৈরী করে দেন এবং তাকে এমনভাবে রক্ষা দেন যে, সে কল্পনাও করতে পারে না- (ইবনে সুন্নীর আমালুল ইয়াওমি অল লাইলি ৯৮ পৃঃ)। ইস্তিগফারের জন্য অনেকে এ দু'আটি পড়েন : আস্তাগফিরুল্লা-হা রব্বী মিন কুল্লী যামবী ওয়াআতুবু ইলাইহি। এ দু'আটি কোন হাদীসে আমি পাইনি এবং কতিপয় মুহাম্মাদীর মুখে শুনেছি যে, এ শব্দগুলো নাকি কোন হাদীসেই পাওয়া যায় না। তাই পাঠক ভাইদের জানাচ্ছি যে, কোন আলিমের কাছে ঐ শব্দগুলো যদি হাদীসের বরাত দিয়ে পান তাহলে ঐ দু'আটি পড়বেন। অন্যথায় মৌলভীদের তৈরীকৃত দু'আ না পড়ে পূর্বে বর্ণিত আল্লাহ এবং রাসূলের দু'আগুলো পড়বেন।

## শোবার সময় বিশেষ ইস্তিগফার

নাবী ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি তার বিছানায় শোবার সময় নিম্নের দু'আটি তিনবার পড়বে তার গুনাহসমূহ মাফ হয়ে যাবে। যদিও তা সমুদ্রের ফেনার মত হয়। যদিও তা গাছের পাতার মত হয়। যদিও তা বালুকণার মত হয়। যদিও তা দুনিয়ার দিনগুলোর মত হয়- (তিরমিযী ২য় খণ্ড ১৭৬ পৃঃ)। দু'আটি এই :

أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ \*

উচ্চারণ : আস্তাগফিরুল্লা-হান্নাযী লা- ইলা-হা ইল্লা-হুওয়াল হাইয়ুল কাইয়ুম ওয়াআতুবু ইলায়হি।

তরজমা : আমি সেই আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি যিনি ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই। যিনি চিরজীব। আর আমি তাঁর কাছে তাওবা করছি।

বারা ইবনে 'আযিব-এর বর্ণনায় আছে, যে ব্যক্তি দু'আটি প্রত্যেক নামাযের পর তিনবার পড়বে আল্লাহ তা'আলা তার গুনাহসমূহ মাফ করে দেবেন। যদিও সে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে থাকে। (ইবনে সুন্নীর আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লাইলি ৩৮ পৃঃ)

## তসবীহ ও তাহমীদেৰ মাহাত্ম্য

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি সকাল ও সন্ধ্যায় একশো বার “সুবহানাল্লাহি ওয়াবিহামদিহী” পড়ে কিয়ামতের দিন তার চেয়ে উত্তম আমল আর কেউ আনতে পারবে না। কেবল ঐ ব্যক্তি ছাড়া যে তার মত ঐরূপ পড়বে কিংবা তার চেয়ে বেশীবার পড়বে। (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ২০০ পৃঃ)

আবু তালহার বর্ণনায় আছে যে, ঐ দু'আ একশো বার পড়লে আলাহ তাআলা তার জন্য এক লক্ষ চব্বিশ হাজার নেকী লিখে থাকেন। সাহাবীরা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! তাহলে তো আমাদের মধ্যে কেউ ধ্বংস হবে না? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তোমাদের কেউ এত নেকী নিয়ে আসবে যে, যদি তা পাহাড়ের উপর রাখা হয় তাহলে তাকেও ভারী করে দেবে। তারপর আল্লাহর সম্পদসমূহ আসবে। অতঃপর [প্রতিদানে] ওরা ঐ নেকী নিয়ে চলে যাবে। তারপর বিশ্ব প্রভু তাঁর দয়াকে প্রশস্ত করতে থাকবেন [ফলে বান্দারা পরিত্রাণ পাবে]। (মুসতাদারকে হাকিম, তাবারানী, ইত্তিখাবে তারগীব ওয়াত্-তারহীব ৪র্থ খণ্ড ৫৮ পৃঃ)

## অন্ধ, কুষ্ঠ ও পক্ষাঘাত না হবার তসবীহ

নবী ﷺ বলেন, যখন তুমি সকালের নামায পড়ে নেবে তখন— সুবহা-নাল্লা-হিল 'আযীম ওয়াবিহামদিহী।

سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ

তিনবার পড়লে তোমাকে অন্ধত্ব ও কুষ্ঠ এবং পক্ষাঘাত থেকে নিরাপদে রাখা হবে। (আহামাদ, কিতাবুদ দু'আ লিইবনি আবিদ দুনয়্যা, তাবারানী, কাবীর, ইত্তিখাবুত তারগীব ওয়াত্-তারহীব ৪র্থ খণ্ড, ১০৯ পৃঃ)

## নিরানব্বইটি রোগের ওষুধ

রসূল ﷺ বলেন : لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ (লা- হাওলা ওয়ালা কুওওয়াতা ইল্লা- বিল্লা-হ) নিরানব্বইটি রোগের ওষুধ। তন্মধ্যে সহজতম রোগ দূষিত্তা। (বায়হাকীর দাওয়াতুল কাবীর, মিশকাত ২০২ পৃঃ)

## জান্নাত এবং জাহান্নামের দু'আ

নাবী ﷺ বলেন : যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে তিনবার জান্নাত চায় তার জন্য জান্নাত বলে, হে আল্লাহ! তুমি একে জান্নাতে প্রবেশ করাও। আর যে ব্যক্তি জাহান্নাম থেকে মুক্তির জন্য তিনবার কামনা করে তার জন্য জাহান্নাম বলে, হে আল্লাহ! তুমি একে জাহান্নাম থেকে বাঁচাও। (তিরমিযী, নাসায়ী, মিশকাত ২১৮ পৃঃ)

নাবী ﷺ তার এক সাহাবী মুসলিম তামীমীকে বলেন, যখন তুমি মাগরিব এবং ফজরের নামাযে সালাম ফিরাবে তখন কারো সাথে কথা বলার আগে সাতবার বলবে :

اللَّهُمَّ أَجِرْنِي مِنَ النَّارِ [আল্লা-হুম্মা আজিরনী মিনান্না-র]

অতঃপর ঐ দিন ও রাতে যদি তুমি মরে যাও তাহলে তোমার জন্য জাহান্নাম থেকে মুক্তির সনদ লিখে দেয়া হবে। (আবু দাউদ, মিশকাত ২১০ পৃঃ)

জান্নাত চাওয়ার দু'আ এই : আল্লা-হুম্মা ইন্নী আসআলুকাল জান্নাহ।

## আয়াতুল কুরসীর বিশেষ ফযীলত

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরয নামাযের পরে আয়াতুল কুরসী পড়ে সে ঐ ব্যক্তির মর্যাদা পায় যে নাবীদের তরফ হতে জিহাদ করতে করতে শহীদ হয়ে যায়। (ইবনে সুন্নী ৩৪ পৃঃ)

অন্য বর্ণনায় আছে, কেউ যদি এ আয়াতটি শোবার সময় বিছানায় পড়ে তাহলে আল্লাহর তরফ থেকে একজন চৌকিদার তাকে পাহারা দেবে এবং সকাল পর্যন্ত তার কাছে শয়তান ঘেঁষতে পারবে না- (বুখারী, মিশকাত ১৮৫ পৃঃ)। এবং কেউ যদি এটাকে সকালে পড়ে তাহলে সন্ধ্যা পর্যন্ত তারও চৌকিদারী করা হবে- (তিরমিযী, মিশকাত ১৮৭ পৃঃ)। এ বইয়ের পৃষ্ঠায় আয়াতুল কুরসী দেয়া আছে সেখানে দেখে নিন।

## অল্প সময়ে কুরআন খতমের নেকী

নাবী (ﷺ) বলেন, যে ব্যক্তি সূরা ইয়াসীন পড়বে আল্লাহ তা'আলা তাকে ঐ পড়ার বদলে দশবার কুরআন খতমের পুন্যদান করবেন। (তিরমিযী, দারিমী, মিশকাত ১৮৭ পৃঃ)

তিনি (ﷺ) বলেন, সূরা 'ইয়া যুলযিলাত' অর্ধেক কুরআন ও সূরা 'কুল হু আল্লাহু আহাদ' কুরআনের তিনভাগের একভাগ এবং 'কুল ইয়া আউযুহাল কা-ফিরুন' কুরআনের চারভাগের একভাগের সমান- (তিরমিযী, মিশকাত ১৮৮ পৃঃ)। এ হাদীস প্রমাণ করে যে, সূরা যিলযাল দু'বার, সূরা ইখলাস তিনবার এবং সূরা কাফিরুন চারবার পড়লে এক খতম কুরআনের সাওয়াব পাওয়া যেতে পারে।

অন্য বর্ণনায় আছে, তিনি (ﷺ) বলেন, সূরা 'আলহা-কুমুত্ তাকা-সুর' পড়া এক হাজার আয়াত পড়ার সমান- (বায়হাকী শু'আবুল ইমান, মিশকাত ১৯০ পৃঃ)। এ হাদীস দ্বারা বোঝা যায় যে, তাকা-সুর সাতবার পড়লে এক খতমের নেকী পওয়া যায়।

## বিত্র নামাযের বিবরণ

বিত্র শব্দের অর্থ বেজোড়। আল্লাহর রাসূল রাতের প্রত্যেক অংশে বিত্র পড়তেন। কখনো তিনি প্রথম রাতে, কখনো মাঝরাতে, আবার কখনো শেষ রাতে পড়তেন। তার বিত্রের শেষ সময় ছিল সেহরী খাবার সময় পর্যন্ত- (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ১১১ পৃঃ)। এ বিত্র নামাযের গুরুত্ব কত সে সম্পর্কে নাবী (ﷺ) বলেন, বিত্র সত্য। যে বিত্র পড়ে না সে আমার দলের লোক নয়- (আবু দাউদ, হাকিম, বুলুগুল মারাম ২৭ পৃঃ)। আল্লাহর রসূল (ﷺ) ঘরে ও সফরে কোথাও বিত্র ছাড়েননি- (যাদুল মাআদ ১মখণ্ড, ১৩১ পৃঃ)।

আবু আইয়ুব আনসারী থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেন, প্রত্যেক মুসলমানের উপর বিত্র নামায ওয়াজিব (অপরিহার্য)। অতএব যার ইচ্ছা ৫ রাক'আত পড়ুক, যার ইচ্ছা সে ৩ রাক'আত পড়ুক এবং যার ইচ্ছা সে ১ রাক'আত পড়ুক। (আবু দাউদ, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ, মিশকাত ১১২ পৃঃ, আহমাদ, ইবনে হিব্বান, হাকিম, নাসবুর রায়াহ ২য় খণ্ড ১১২ পৃঃ)

মা 'আয়িশা (রাঃ) বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ ৯ রাক'আত বিত্ৰ পড়তেন। তখন মাঝখানে আতাহিয়াতু না পড়ে একটানা ৮ রাক'আত নামায পড়ার পর বসে আতাহিয়াতু পড়েন। তারপর সালাম না ফিরিয়ে আবার ওঠে ১ রাক'আত পড়ে পুনরায় আতাহিয়াতু ও অন্যান্য দু'আসমূহ পড়ে সালাম ফিরান। পরিশেষে নাবী ﷺ-এর বয়স যখন বেশী হয়ে যায় এবং তিনি একটু মোটা হয়ে যান তখন ৭ রাক'আত নামায পড়েন এবং ৬ রাক'আতের মাথায় আতাহিয়াতু পড়ে, দাঁড়িয়ে ৭ম রাক'আত পড়ে আবার আতাহিয়াতু ও অন্যান্য দু'আগুলো পড়ার পর সালাম ফেরান। (মুসলিম, মিশকাত ১১১ পৃঃ)

উল্লিখিত হাদীসগুলো দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, বিত্ৰ নামায ১,৩,৫,৭,৯ রাক'আত পর্যন্ত পড়া যেতে পারে। এর মধ্যে ৭ ও ৯ রাক'আত পড়ার নিয়ম আগে বর্ণনা করা হয়েছে। এবার শুনুন ৫ রাক'আত কিভাবে পড়তে হবে?

মা 'আয়িশা বলেন, নাবী ﷺ রাতে ১৩ রাক'আত নামায পড়তেন। তন্মধ্যে বিত্ৰ নামায থাকত ৫ রাক'আত। এ পাঁচ রাক'আতের মধ্যবর্তী কোন রাক'আতে তিনি [আতাহিয়াতুর জন্য] না বসে একেবারে শেষ রাক'আতে বসতেন। (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ১১১ পৃঃ)

## বিত্ৰ নামাযে বিশেষ সূরা

উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বিত্ৰ নামাযে [প্রথম রাক'আতে] সূরা সাব্বিহিস্মা রব্বিকাল আ'লা ও [২য় রাক'আতে] সূরা কাফিরুন এবং [৩য় রাক'আতে] সূরা ইখলাস পড়তেন। তারপর সালাম ফিরাতেন। (নাসায়ী ১ম খণ্ড ১৯৪ পৃঃ)

তিরমিযী ও আবু দাউদে বর্ণিত 'আয়িশার রিওয়ায়াতে আছে যে, নাবী ﷺ ১ম ও ২য় রাক'আতে উল্লিখিত সূরা দু'টি পড়তেন। (মিশকাত ১১২ পৃঃ, বুলুগল মারাম ২৭-২৮ পৃঃ, বাহরে রায়িক ২য় খণ্ড ৩৯ পৃঃ)

হাফিয ইবনে হাজার আসকালানী "নাতা-য়িজুল আফকা-র ফী তাখরীজি আহাদীসিল আযকার" গ্রন্থে বলেন, রসূল ﷺ কখনো বিত্ৰের প্রথম রাক'আতে সূরা আলহা-কুমুত তাকা-সুর, ইন্না- আনযালনা-হু ফী লাইলাতিল কাদর ও ইযায়ুলযিলাতিল আরযু পড়তেন এবং দ্বিতীয় রাক'আতে 'ওয়াল্ 'আসরি', 'ইযা

-জাআ নাসরুল্লাহি ও ইন্না আ'তায়না কাল কাওসার' পড়তেন এবং তৃতীয় রাক'আতে 'কুল ইয়া আযুহাল কাফিরুন', 'তাক্বাত ইয়াদা' ও 'কুলহু আল্লাহু আহাদ' পড়তেন- (মুসনাদে আহমাদ, উমদাতুর রিআয়াহ শারহে বিকারার ১৭০ পৃঃ, ১১ নং টীকা ও তালখীসুল হাবীর ১১৮ পৃঃ)। এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহর রসূল ﷺ কখনো তিন রাক'আত বিতর পড়তেন এবং তাতে উপরোক্ত বিশেষ সূরাগুলো পড়তেন। কিন্তু এ তিন রাক'আত তিনি কিভাবে পড়তেন তা মা 'আয়িশার মুখ থেকে শুনুন। তিনি বলেন, নাবী ﷺ তিন রাক'আত বিতর পড়তেন এবং কেবলমাত্র শেষ রাক'আতে তাশাহুদে বসতেন- [হাকিম ১ম খণ্ড ২০১ পৃঃ]। ইমাম নওয়াব সিদ্দীক হাসান খান বলেন, তিন রাক'আত বিতরের হাদীস যযীফ। কিন্তু বর্ণনাটির সূত্র অবিচ্ছিন্ন ও মুত্তাসিল- (বায়লুল মানকাআহ ৩২ পৃঃ)।

### এক তাশাহুদে তিন রাক'আত বিতর

আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত নাবী ﷺ বলেন, তোমরা তিন রাক'আত বিতর নামায মাগরিবের নামাযের মত পড় না। (দারাকুতনী ১ম খণ্ড ১৭৩ পৃঃ, নাসবুর রায়াহ ২য় খণ্ড ১১৬ পৃঃ, নায়লুল আওতার ২য় খণ্ড ১৮০ পৃঃ)

অর্থাৎ মাগরিবের নামাযের মত তিন রাক'আত বিতরের ২য় রাক'আতে আত্তাহিয়াতু পড়া যাবে না। বরং একটানা তিন রাক'আত পড়ার পর আত্তাহিয়াতু, দরুদ ও দু'আয়ে মাসূরা পড়ে সালাম ফিরাতে হবে।

একটি যযীফ হাদীসে আছে নাবী ﷺ বলেন, রাতের তিন রাক'আত, যেমন দিনের বিতর মাগরিবের নামায- (দারা-কুতনী ১৭৩ পৃঃ)। ইমাম বায়হাকী বলেন, এ হাদীসটি এক সাহাবী ইবনে মাস'উদের মওকুফ হাদীস, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মরফু' হাদীস নয়। ইবনুল জাওযী "ইলালি মুতানাহিয়াহ" গ্রন্থে বলেন, হাদীসটি সহীহ নয়- (নাসবুর রায়াহ ২য় খণ্ড ১১৯-১২০ পৃঃ)।

এ হাদীসটির ব্যাখ্যায় বিখ্যাত সাহাবী ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, বিতর মাগরিবের মত, কিন্তু তৃতীয় রাক'আত ছাড়া তাশাহুদে বসা যাবে না- (আল-মুহাল্লা ৩য় খণ্ড ৪৬ পৃঃ)। এটাকে আর একটু ভেঙ্গে ইমাম ইবনে হাযম বলেন, কেউ যদি বিতরকে মাগরিবের মত মনে করে তাহলে তাকে বিতরের প্রথম দুই রাক'আতে মাগরিবের মত উচ্চৈঃস্বরে এবং তৃতীয় রাক'আতে নীরবে কিরাআত পড়তে হয় এবং বিতরের শেষ রাক'আতে দু'আয়ে কুনুত পড়তে হয় না যেমন মাগরিবে কুনুত পড়া হয় না- (ঐ- ৪৮ পৃঃ)।



আল্লামা 'আবদুল ওয়াহ্‌হাব সাদরী (রাঃ) বলেন, একমাত্র আবদুল্লাহ ইবনে মাস'উদ ছাড়া আর কোন সাহাবী থেকে তিন রাক'আত বিতরের ২য় রাক'আতে আতাহিয়াত পড়ার প্রমাণ পাওয়া যায় না। কিন্তু ইবনে মাস'উদের এ আমলটি যেহেতু রসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীসের খেলাফ সেজন্য গ্রহণযোগ্য ও প্রামাণ্য হবে না। যেমন তাঁর অনেক কথা নাবীর হাদীসের খেলাফ হওয়ায় রদ করে দেয়া হয়। যেমন সহীহ বুখারী ও ইবনে কাসীরে বর্ণিত আছে যে, ইবনে মাস'উদ সূরা ফালাক ও নাসকে কুরআনের মধ্যে গণ্য করতেন না। শুধু তাই নয় বরং যেখানেই তিনি এ সূরা দু'টোকে কুরআনের মধ্যে লেখা দেখতেন মিটিয়ে দিতেন। কিন্তু তাঁর এ মতটি রাসূলের হাদীসের খেলাফ হওয়ায় রদ করে দেয়া হয়, গ্রহণ করা হয় না। কারণ সহীহ হাদীসে ঐ সূরা দু'টোকে কুরআনের মধ্যে গণ্য করা হয়েছে—(হিদায়াতুন নাবী ২১৯ পৃঃ)।

সহীহ হাদীসের বিপরীত ইবনে মাস'উদ (রাঃ)-এর এ আমলের উপর ভিত্তি করে হানাফীগণ মাগরিবের মত তিন রাক'আত বিতর পড়েন এবং ১ রাক'আত বিতরের বিরোধিতা করেন। অথচ মা 'আয়িশা থেকে বর্ণিত সহীহ হাদীসে রয়েছে যে, আল্লাহর নাবী এক রাক'আত বিতর পড়তেন—(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ১০৫ পৃঃ)। আল্লাহ আমাদের সবাইকে সহীহ হাদীস মোতাবেক আমল করার তওফীক দিন— আমীন।

বিতর নামায সম্পর্কে আল্লামা আবদুল ওয়াহ্‌হাব সাদরী (রাঃ) বলেন, তিন, পাঁচ, সাত ও নয় রাক'আত বিতর আল্লাহর রসূল তাহাজ্জুদের সাথে পড়তেন। প্রকৃতপক্ষে বিতর এক রাক'আত। রসূলুল্লাহ ﷺ বেশীর ভাগই এক রাক'আত বিতর পড়তেন। (হিদায়াতুন নাবী ২২২-২২৩ পৃঃ)

ইমাম মুহাম্মদ ইবনে নাসর মাআযী বলেন, ইরাকের (হানাফী) ফকীহগণ এক রাক'আত বিতর এজন্য স্বীকার করেননি যে, হাদীসে তাঁদের দৃষ্টি কম ছিল এবং হাদীস বিশারদদের সঙ্গও তাঁরা কম পেয়েছিলেন। (কিয়ামুল লায়ল ২৩ পৃঃ, মুলতান ছাপা)

সাহাবীদের মধ্যে চার খলীফা আবু বকর (রাঃ), 'উমর (রাঃ), 'উসমান (রাঃ), 'আলী ও সা'দ ইবনে আবী আক্কাস, মু'আয ইবনে জাবাল, উবাই ইবনে কাব, আবু মুসা আশ'আরী, আবুদ দারদা (রাঃ), হুযায়ফা (রাঃ), ইবনে মাস'উদ

(রাঃ), ইবনে 'উমর (রাঃ), ইবনে 'আব্বাস (রাঃ), 'আমীর মু'আবিয়া (রাঃ), তামীদ্দারী (রাঃ), আবু আইউব আনসারী (রাঃ), আবু হুরায়রা (রাঃ), ফুযালাহ ও ইবনে যুবার (রাঃ) প্রমুখ এবং তাবিয়ীদের মধ্যে ইমাম যুহরী, হাসান বাসরী, মুহাম্মদ ইবনে সীরীন, সা'ঈদ ইবনে জুবার ও আরো অনেকে এবং প্রচলিত চার মাযহাবের তিন ইমাম, ইমাম মালিক, শাফিয়ী ও ইবনে হাম্বল প্রমুখও এক রাক'আত বিতর পড়ার পক্ষপাতী ছিলেন। (নায়লুল আওতার ২য় খণ্ড ২২৭-২২৮ পৃঃ)

## দু'আয়ে কুনূত

রসূলুল্লাহ ﷺ-এর নাতি হাসান (রাঃ) বলেন, বিতরে কুনূতে পড়ার জন্য আমাকে আল্লাহর রসূল ﷺ কতগুলো কথা শিখিয়ে দেন। তা হল এ :

اَللّٰهُمَّ اهْدِنِيْ فِىْمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِيْ فِىْمَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلَّنِيْ فِىْمَنْ تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ لِيْ فِىْمَا اَعْطَيْتَ وَقِنِيْ شَرَّ مَا قَضَيْتَ فَاِنَّكَ تَقْضِىْ وَلَا يُقْضٰى عَلَيْكَ اِنَّهٗ لَا يَذِلُّ مَنْ وَّالَيْتَ وَلَا يَعْزُّ مَنْ عَادَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلَى النَّبِيِّ.

উচ্চারণ : আল্লা-ম্বাহ্দিনী ফীমান হাদায়তা ০ ওয়া'আ-ফিনী ফীমান 'আফায়তা ০ ওয়াতাহওয়াল্লানী ফীমান তাওয়াল্লায়তা ০ ওয়াবারিক লী ফীমা আ'তায়তা ০ ওয়াক্বিনী শাররামা- কাযায়তা ০ ফাইন্নাকা তাক্বী ওয়ালা ইউকযা 'আলায়কা ০ ইন্নাহ লা- ইয়াযিল্লু মাওঁ ওয়ালায়তা ০ ওয়ালা ইয়া'ইযু মান্ 'আ-দায়তা ০ তাবারাক্তা রাব্বানা ওয়াতা'আ-লায়তা ০ ওয়ানাসতাগফিরুকা ওয়ানাতুবু ইলায়কা ০ ওয়াসাল্লাল্লা-হু 'আলান্ নাবী।

তরজমা : হে আল্লাহ! তুমি যাদেরকে সুপথ দেখিয়ে আমাকেও তাদের মত সুপথ দেখাও। যাদেরকে তুমি মাফ করেছ আমাকেও তাদের দলে ঢুকিয়ে দাও। তুমি যাদের অভিভাবক হয়েছ তাদের মত আমারও অভিভাবক হয়ে যাও এবং তুমি আমাকে যা দিয়েছ তাতে বরকত দাও। তুমি যে ফায়সালা করে রেখেছ তার অনিষ্ট থেকে আমাকে বাঁচাও। কারণ তুমিই তো ভাগ্য নির্ধারণ করে থাক, অথচ তোমার বিরুদ্ধে কেউ কোন সিদ্ধান্তই নিতে পারে না। তুমি যার সাথে বন্ধুত্ব রাখ সে

কোনদিন অপমানিত হয় না। আর তুমি যার সাথে দূশমনী কর সে কোনদিনই সম্মানিত হতে পারে না। হে আমাদের পরওয়ারদিগার! তুমি প্রাচুর্যময় ও সর্বোচ্চ। আমরা তোমার কাছে মাফ চাচ্ছি ও তোমারই কাছে তওবা করছি। (সবশেষে বলছি) আল্লাহ তা'আলা নাবী ﷺ-এর উপর রহমত নাযিল করুন। (তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসায়ী, ইবনু মাজাহ, দারিমী, মিশকাত ১১২ পৃঃ)

নোট : তাবারানী ও বায়হাকীতে “ওয়ালা- ইয়া’ইযু মান ‘আ-দায়তা” এবং নাসায়ীর বর্ণনায় “ওয়াসাল্লাল্লাহু ‘আলান্ নাবীয়া” শব্দগুলো বাড়তি আছে— (বুলুগল মারাম ২২ পৃঃ, নাসায়ী ১ম খণ্ড ১৯৫ পৃঃ, বায়হাকী ২য় খণ্ড ২০৯ পৃঃ)। এছাড়া ইবনে হিব্বানের রিওয়ায়াতে “নাস্তাগফিরুকা ওয়ানাতুবি ইলায়কা” বাড়তি আছে— (মিরআতুল মাফাতীহ ২য় খণ্ড ২১২ পৃঃ)। এ দু’আ কুনূত ছাড়াও বিভিন্ন হাদীসে আরো দু’ রকমের দু’আয়ে কুনূত পাওয়া যায়। ঐ তিন রকম দু’আ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে ইমাম তিরমিযী বলেন, হাসান বর্ণিত এ দু’আয় কুনূতের চেয়ে ভাল আর কোন দু’আ নাবী ﷺ থেকে বর্ণিত হয়েছে বলে আমি জানি না— (তিরমিযী, ১ম খণ্ড ৬১ পৃঃ)।

মিশকাতের ব্যাখ্যাকারী আল্লামা ‘উবায়দুল্লাহ রহমানী বলেন, আমার মতে বিতরের এ দু’আটি পড়া উচিত। কারণ, এ রিওয়ায়াতটি সহীহ অথবা হাসান মরফু মুত্তাসিল। তবে কেউ যদি হানাফীদের দু’আ পড়ে তাও চলবে— (মিরআতুল মাফা-তীহ ২য় খণ্ড ২১৩ পৃঃ)। সহীহ ইবনে হিব্বানে আছে যে, নাবী ﷺ কখনো কখনো হাসান (রাঃ)-কে শেখানো উক্ত দু’আটি [কুনূত] পড়তেন— (হিদায়াতুন নাবী ২১৩ পৃঃ)।

## বিতরে দু’আ কুনূত রুকূর আগে, না পরে?

বিখ্যাত হানাফী মুহাদ্দিস আল্লামা বাদরুদ্দীন আইনী (রাঃ) বলেন, ইমাম নাসায়ী ও ইমাম ইবনে মাজাহ উবাই ইবনে কা’ব (রাঃ) থেকে বর্ণিত এবং ইবনে আবু শাইবাহ ও দারাকুতনী ইবনে মাস’উদ (রাঃ) থেকে আর মুহাম্মাদ ইবনে নাসর মারওয়াযী ‘আব্দুর রহমান ইবনে আবযা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নাবী ﷺ বিতরের নামাযে রুকূর আগে দু’আ কুনূত পড়তেন। (উমদাতুল কারী ৭ম খণ্ড)

আরো দু’জন হানাফী মুহাদ্দিস আল্লামা মোল্লা আলী কারী ও আল্লামা ইব্রাহীম হালাবী বলেন : ইমাম তাবারানী তদীয় মু’জামি আওসাতে ইবনে ‘উমার (রাঃ)

থেকে এবং আবু নু'আইম তাঁর হিল্‌ইয়াতুল আউলিয়াতে ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে আর খাতীব বাগদাদী তাঁর কিতাবুল কুনূতে ইবনে মাস'উদ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নাবী ﷺ বিত্রে কুনূত পড়েন রুক্কুর আগে— (শারহুন নিকায়্যাহ ১ম খণ্ড ৯৮ পৃঃ, কাবীরী ৩৯৬ পৃঃ, মিরআতুল মাফাতীহ ২য় খণ্ড ২২০ পৃঃ)। এসব কারণে আহলে হাদীসরা রুক্কুর পরে দু'আ কুনূত পড়ে। উক্ত হাদীসগুলো প্রমাণ করে যে, বিত্ৰ নামাযে দু'আ কুনূত রুক্কুর আগে পড়া উচিত। কিন্তু বিখ্যাত হানাফী মুহাদ্দিস আল্লামা যায়লায়ী (রহঃ)-এর মতে উক্ত হাদীসগুলোর সূত্র কোন না কোন দোষে দুষ্ট— (নাসবুর রায়াহ ২য় খণ্ড ১২৩-১২৪ পৃষ্ঠা)। অতএব ওগুলোর উপরে আমল অনাস্থাযোগ্য। সুনানে নাসায়ী ও ইবনে মাজায় বর্ণিত উবাই ইবনে কাব (রাঃ)-এর বর্ণনা সূত্র সম্পর্কে আল্লামা ইবনে কুদা-মাহ (রহঃ) বলেন, ঐ হাদীস সম্পর্কে সমালোচনা আছে। এ কথা বলা হয়েছে যে, ওর বর্ণনায় 'কুনূত' শব্দের উল্লেখ সঠিক নয়— (আল মুগনী ২য় খণ্ড ১৫২ পৃষ্ঠা)। অতএব উবাই এর রিওয়াযাতটি দলীলের যোগ্য নয়।

মুসান্নাফ ইবনে আবু শাইবাহ ও সুনানে দারাকুতনীতে ইবনে মাস'উদ (রাঃ) বর্ণিত হাদীসটির বর্ণনাসূত্র সম্পর্কে ইমাম দারাকুতনী (রহঃ) বলেন, ওর একজন বর্ণনাকারী আবান ইবনে আবু আইয়্যাশ মাতরুক বা পরিত্যক্ত রাবী— (সুনানে দারাকুতনী ১৭৫ পৃষ্ঠা)। সুতরাং ইবনে মাস'উদের হাদীসটি আপত্তিযোগ্য। বিধায় তা পরিত্যাজ্য।

আবু নু'আইমের হিলয়্যাহতে বর্ণিত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর বর্ণনাসূত্রে দু'জন রা-বী হাবীর ও আল ইবনে মুসাইয়িব সম্পর্কে মুহাদ্দিস আবু নু'আইম (রহঃ) বলেন, ওঁরা দু'জনই গারীব তথা বিরল সূত্রের রা-বী। আর ইমাম বাইহাকী (রঃ) বলেন, ওর আর এক রা-বী আতা ইবনে মুসলিম যযীফ— (মিরআ-তুল মাফা-তীহ ২য় খণ্ড ২১৩ পৃষ্ঠা লাক্কৌ ছাপা)। সুতরাং ইবনে আব্বাস বর্ণিত এ রিওয়াযাতটিও নড়বড়ে। ফলে এটিও ধোপে টিকছে না দলীল হিসেবে।

তাবারানী আওসাতি ইবনে উমার (রাঃ) বর্ণিত হাদীসটি সম্পর্কে হাফিয ইবনে হাজার আসকালানী (রঃ) বলেন, ওর ইসনাদ বা সূত্রগুলো যযীফ— (আদদিরা-য়াহ ১১৫ পৃষ্ঠা, বরাতে মিরআ-ত ২য় খণ্ড ২১৩-২১৪ পৃষ্ঠা)। অতএব ইবনে উমার বর্ণিত এ যযীফ হাদীসটিও দলীলযোগ্য হতে পারে কি?

খাতীব বাগদাদীর কিতাবুল কুনূতে ইবনে মাস'উদ (রাঃ) বর্ণিত হাদীসটিও ইবনে হাজার আসকালানীর গবেষণায় যয়ীফ- (মিরাআ-ত ২য় খণ্ড ২১৩ পৃষ্ঠা)। অতএব এটিও দলীলের অযোগ্য।


থাকলো ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে নাস্র মারআযীর কিয়া-মুল লাইলে আদুর রহমান ইবনে আবযা- বর্ণিত হাদীসটি। ওর বিরুদ্ধে কোন সমালোচনা আমার নযরে পড়েনি। তাই আপাতত ঐ একটি হাদীস থাকছে বিতর নামাযে- 'রুকুর আগে'- দু'আ কুনূত পড়ার স্বপক্ষে।

এর বিপরীত মুস্তাদরাকে হা-কিমে ও সুনানে বাইহাকীতে রসূলুল্লাহ ﷺ -এর নাতি হাসান ইবনে 'আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীস- যাতে তিনি বলেন, আমি যখন আমার মাথাটা তুলবো এবং কেবলমাত্র সিজদা বাকি থাকবে তখন আমার বিতর পড়ার জন্য রসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে শিখিয়ে দিয়েছেন এক দু'আ- আল্লাহুয়াহ দিনী ফী মান হাদাইতা..... 'আলান্ নাবিই। (মুস্তাদরাক হা-কিম ৩য় খণ্ড ১৭২ পৃষ্ঠা, বাইহাকী ৩য় খণ্ড ৩৯ পৃষ্ঠা)

দুই হানাফী মুহাদ্দিস আল্লামা মোল্লা আলী কা-রী ও আল্লামা ইব্রাহীম হালাবী (রঃ) মুস্তাদরাক হা-কিমে বর্ণিত- 'বিতর নামাযে রুকুর পরে দু'আ পড়া'- সংক্রান্ত উক্ত হাদীসটি বর্ণনার পর কোন মন্তব্য করতে পারেননি। বরং মোল্লা আলী কারী (রঃ) হা-কিমেরই মন্তব্যটা লিখেছেন যে, বুখারী ও মুসলিমের শর্ত অনুযায়ী এ হাদীসটি সহীহ। (শারহুন্ নিকা-য়াহ ১ম খণ্ড ৯৮ পৃষ্ঠা, গুন্যাতুল মুস্তাম্লী ওরফে কাবীরী ৩৯৬ পৃষ্ঠা)

অতএব এ সহীহ হাদীস অনুযায়ী বিতর নামাযে দুআ কুনূত রুকুর পরে পড়াই উত্তম। তবে রুকুর আগে পড়া বৈধ। কিন্তু উত্তম প্রমাণিত হয় না। রসূলুল্লাহ ﷺ যখন কারো বিরুদ্ধে বদদুআ কিংবা কারো জন্য দুআ করতে চাইতেন তখন রুকুর পরে দুআ কুনূত পড়তেন- (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ১১৩ পৃষ্ঠা)। এরূপ দুআ কুনূত কখনো তিনি ﷺ রুকুর আগেও পড়েছেন- (ইবনে মা-জাহ, মিশকাত ১১৪ পৃষ্ঠা)।

এ কুনূতকে শরীআতী পরিভাষায় কুনূতে না-যিলাহ বলা হয়। কুনূতে নাযিলাহ সংক্রান্ত সব হাদীসগুলোই সহীহ্ এবং ঐ কুনূত পড়া সংক্রান্ত এক দু'টি হাদীস ছাড়া প্রায় সব হাদীসই 'রুকুর পরে' পড়া সম্মত। যেমন ইমাম বাইহাকী ও আল্লামা


কাস্তালা-নী বলেন, রুক্কুর পরে কুনূত পড়া সংক্রান্ত হাদীসগুলোর রা-বী সংখ্যায়ও বেশী এবং মুখস্থকরণেও বেশী- (বাইহাকী ২য় খণ্ড ২০৮ পৃষ্ঠা, ইরশা-দুস সা-রী ২য় খণ্ড ২২৪ পৃষ্ঠা)। এজন্য এক হানাফী আলিম মাওলানা নিমুভী বলেন, রুক্কুর পরেই কুনূত পড়া উত্তম। কারণ, নাবী  কুনূতে না-যিলাহতে রুক্কু থেকে মাথা তুলেই দুআ পড়েছিলেন- (তা'লীকুত তালীক ২য় খণ্ড ২১ পৃষ্ঠা বরাতে মিরআত ২য় খণ্ড ২২০ পৃষ্ঠা)।

যেসব হাদীসে শুধুমাত্র 'কুনূত' শব্দ আছে তা যেমন কুনূতে নাযিলাহ হতে পারে, তেমনি তা বিতরের কুনূতও হতে পারে। তাই আমি দুরকম ভাবার্থবোধক কুনূত নয়, বরং কুনূতে বিতরের পরিষ্কার উল্লেখ করা হাদীসগুলোর আলোচনা ও সমালোচনা পেশ করে রুক্কুর পরে দু'আ কুনূত পড়ার প্রমাণ জোরদার পেয়েছি।

বিতরের দু'আ কুনূত আল্লা-হুয়াহুদিনী ফী মান হাদাইতা ..... 'আলান নাবীই-দু'আ সংক্রান্ত মুস্তাদারাক হা-কিমে বর্ণিত হাদীসে যেহেতু রুক্কু থেকে মাথা তোলার পর শব্দ আছে সেহেতু এ দু'আটি যাঁরা বিতরের কুনূতে পড়বেন তাঁদের উচিত রুক্কুর পরে তা পড়া। এটা আমার অভিমত।

আর যাঁরা 'আল্লা-হুয়া ইন্না নাস্তাঈনুকা.....বিল কুফ্ফা-রি মিলহিক' দু'আটি বিতরের কুনূতে পড়তে চান তাঁরা তা রুক্কুর আগে পড়তে পারেন। যেমন হানাফী ফাতওয়ায় রুক্কুর আগে দুআ কুনূত পড়া হয়। শা-ফিয়ী, মালিকী, হাম্বলী এবং আহলে হাদীসদের মতে দুই কুনূত- তা বিতরের কুনূত হোক কিংবা কুনূতে না-যিলাই হোক রুক্কুর পরেই পড়া সূনাত।

## দু'আ কুনূতে হাত তুলতে হবে কিনা

এ সম্পর্কে আল্লামা মুবারকপুরী বলেন : খাস করে 'কিত্র নামাযে' হাত তুলে দু'আ পড়ার ব্যাপারে আল্লাহর রসূল  থেকে কোন সহীহ প্রমাণ পাওয়া যায় না, তবে সাহাবায়ি কিরাম যেমন ইবনে মাস'উদ- (ইবনে আবী শায়বা ২য় খণ্ড ৩০৭ পৃঃ, ইবনুল মুনযির ও বায়হাকী ২য় খণ্ড ২১২ পৃষ্ঠার রিওয়ায়াত অনুযায়ী)। এবং 'উমর ও আবু হুরায়রা- (বায়হাকী ২য় খণ্ড ২১২ পৃঃ বর্ণনানুযায়ী)। প্রমুখ দু'আ কুনূতে হাত তুলতেন। অতএব যদি কেউ হাত তুলে দু'আ করে তাতে কোন আপত্তি নেই- (মুহাদ্দিস পত্রিকা দিল্লী ১৯৪১ অক্টোবর সংখ্যার ২০ পৃঃ)।

ইবনে 'আব্বাসও দু'আ কুনূতে বুক পর্যন্ত দুই হাত তুলতেন। (আল-মুগনী ২য় খণ্ড ১৫৪ পৃঃ)

হুসায়ন ইবনে মুহসিন আনসারী লিখেছেন : ইমাম আবু ইউসুফ হানাফী বলেন, আল্লাহর নাবী বিত্রের দু'আ কুনূতে দুই হাতের তালু মুখের দিকে করে আসমানের দিকে সীনা পর্যন্ত তুলতেন। ইমাম তাহাবী এবং কারখীও এ মত গ্রহণ করেছে। আল্লামা শামী বলেন, দু'আর শেষ পর্যন্ত তিনি (ﷺ) হাত দু'টোকে ঐক্যপ রাখতেন। (মজমুআহ ফাতাওয়া ১৬০ পৃঃ, মেরআত ২য় খণ্ড ২১৯ পৃঃ, শামী ১ম খণ্ড ৬২৩ পৃঃ)

ইমাম বায়হাকী বলেন, দু'আ কুনূত পড়ার শেষে হাত দুটোকে মুখে বুলানোর কোন প্রমাণ আমি কোন সালাফ [সাহাবা ও তাবিয়ী প্রমুখ] থেকে পাইনি। তাই সালাফদের মত নামাযের মধ্যে হাত তুলে দু'আ কুনূত পড়ে হাত দু'টো মুখে না বুলিয়ে এমনি ছেড়ে দেবে। (বায়হাকী ২য় খণ্ড ২১২ পৃঃ, তুহফাতুল আহওয়াযী ১ম খণ্ড ৩৪৩ পৃঃ)

বাংলাদেশের মাওলানা আব্দুস সাত্তার ত্রিশালী সাহেব যাদুল মাআদের পৃষ্ঠাহীন বরাত দিয়ে বলেন : “দু'আ কুনূত পড়তেন। তারপর হস্তদ্বয় মুখমণ্ডলে মুছে সিজদায় গমন করতেন”— (সহীহ নামায ও মাসনুন দু'আ শিক্ষা ৪র্থ সংস্করণ ৫৪ পৃঃ)। “দু'আ কুনূত পড়ার পর হাত দু'টো মুখে বোলানোর কথা আমি যাদুল মাআদে খুঁজে পেলাম না।

আল্লামা যায়লায়ী হানাফীর মতে রুকূর আগে দু'আ কুনূত পড়া সংক্রান্ত সমস্ত হাদীসই কোন না কোন দোষে দুষ্ট— (নাসবুর রায়াহ ২য় খণ্ড ১২৩-১২৪ পৃঃ)। তাছাড়া কুনূত পড়ার আগে দুই হাত তোলা এবং আবার হাত দু'টোকে বাঁধা আল্লাহর রসূল থেকে কিংবা কোন সাহাবী থেকে প্রমাণিত নেই। এ ব্যাপারে আল্লামা শামী হানাফী রদুল মুহতারে লিখেছেন : বাহরুর রায়িকে বলা হয়েছে যে, হাত ওঠানোর কোন দলীল নেই। বুরহানে বলা হয়েছে যে, হাত ওঠানোর কোন দলীল নেই। বুরহানে বলা হয়েছে যে, দুই হাত তোলা, তাকবীর দেয়া ও দু'আ কুনূত পড়া ওয়াজিব হওয়ার কোন দলীল আমরা জানি না। এবং হেদায়া প্রণেতা বলেন যে, হাদীসে সাত জায়গায় দুই হাত তোলার কথা আছে, তন্মধ্যে বিতরকে গণ্য করা হয়নি— (মুহাদ্দিস পত্রিকা, দিল্লী উল্লিখিত সংখ্যা ২১ পৃঃ)। আল্লামা

যায়লায়ীও তাই বলেন- (নাসবুর রায়াহ ২য় খণ্ড ১২৬ পৃঃ)। কতিপয় হানাফী গবেষক বলেন, কুনূত অজ্জব হওয়া, দুই হাত তোলা ও তাকবীর দেয়ার কোন দলীল আমরা জানতে পারিনি- (শারহুন্ নিকায়াহ ১ম খণ্ড ৯৮ পৃঃ)।

হানাফী আলিমগণ বলেন যে, দু'আ কুনূত যার মুখস্থ নেই সে তিনবার সূরায়ে এখলাস অবশ্যই পড়বে। নতুবা বিতর আদায় হবে না। এ ব্যাপারে আব্বাসী আবু মোঃ 'আব্দুল ওয়াহ্‌হাব সাদরী বলেন, এ কথাটি বেদলীল ও সনদহীন এবং মনগড়া কথা। কুরআন ও হাদীসে যার কোনই প্রমাণ নেই। (হিদায়াতুন নাবী ১৭৩ পৃঃ)

### দু'আয়ে কুনূত প্রত্যহ পড়তে হবে কি?

সব সময় দু'আ কুনূত পড়ার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে রমায়ানের শেষ অর্ধেক (অর্থাৎ ১৫ই রমায়ানের পর থেকে) লাগাতার দু'আয়ে কুনূত রুকুর পর পড়ার প্রমাণ সাহাবায়ে কিরাম ও তাবিয়ী থেকে পাওয়া যায়। (আবু দাউদ, মিশকাত ১১৪ পৃঃ, মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বা ২য় খণ্ড ৩০৫ পৃঃ)

'আলী ও ইবনে 'উমর (রাঃ) রমায়ানের শেষার্ধ ছাড়া অন্য সময়ে বিত্রে দু'আ কুনূত পড়তেন না। একটি দুর্বল হাদীসে আছে যে, রসূল ﷺ রমায়ানের অর্ধেকের পর থেকে শেষ পর্যন্ত দু'আ কুনূত পড়তেন। (বায়হাকী ২য় খণ্ড ৪৯৮-৪৯৯ পৃঃ)

অবশ্য ইবনে মাস'উদ (রাঃ) থেকে সারা বৎসর কুনূত পড়া প্রমাণিত আছে- (মুসান্নাফ ৩০৫ পৃঃ)। আব্বাসী 'আবদুল ওয়াহ্‌হাব সাদরী বলেন, এটা তাঁর ব্যক্তিগত আমল। কারণ অন্যান্য সমস্ত সাহাবী এ ব্যাপারে তাঁর বিরোধী। সেজন্য তাঁর একার 'আমল সবার জন্য গ্রহণযোগ্য দলীল হতে পারে না। জ্ঞানীশুনীরা এ কথা ভালভাবেই বোঝেন। সার কথা বিত্রে দু'আ কুনূত কখনো পড়া ভাল এবং কখনো না পড়াই উচিত- (হিদায়াতুন নাবী ২১৩-২১৪ পৃঃ)।

হানাফী ফিক্‌হের মতে প্রত্যেক দিনই বিত্রে কুনূত পড়া ওয়াজিব। কিন্তু মহানবীর হাদীস অনুসারে ঐ মত প্রমাণিত হয় না। তাই আহলে হাদীসের মতে প্রত্যেক দিন না পড়ে কোন কোন দিন ছেড়ে দেয়া উচিত। রমায়ান ছাড়া বাকি এগারো মাসে বিতর নামায জামা'আত করে পড়ার প্রমাণ নেই।

কোন কোন বর্ণনায় দু'আয়ে কুনূতের শব্দগুলো বহুবচন "ইহদিনা ওয়া'আফিনা" ইত্যাদি বর্ণিত আছে- (বায়হাকী ২য় খণ্ড ২১০ পৃঃ)। তাই ইমাম



নববী বলেন, অনেকে এ হাদীস - কোন ইমাম যদি (একবচন শব্দ দ্বারা) নিজের জন্য খাস করে দু'আ করে তাহলে সে আমানতের খিয়ানত করে- উপর ভিত্তি করে দু'আতে এক বচনের জায়গায় বহু বচন বলার পক্ষপাতী। তারা জেনে নিন যে, এ হাদীসটি জাল- ইবনে খুযায়মা তাঁর সহীহতে এ কথা উল্লেখ করেছেন। তবে ইমাম যখন (নামাযের মধ্যে) দু'আ করবেন তখন সমস্ত দু'আতে কেবল একবচন শব্দ না থাকে। বরং তাঁর দু'আর শুরুতে কিংবা মাঝখানে অথবা শেষ ভাগে বহুবচন শব্দ থাকা উচিত- (হিদায়াতুন নাবী ২১৭-২১৮ পৃঃ)।

## বিত্রের পরের দু'আ

আল্লাহর রসূল বিত্রের পর যখন সালাম ফিরতেন তখন তিন বার বলতেন :

سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ [সুবহা-নাল মালিকিল কুদ্দুস]

(পবিত্র রাদশাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছি) তৃতীয়বারের মাথায় তিনি এ শব্দগুলো একটু বেশী টেনে উচ্চঃস্বরে বলতেন। (নাসারী, মিশকাত ১১২ পৃঃ)

দারাকুতনীতে : رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ [রব্বুল মালা-য়িকাতি ওয়াররুহ] শব্দগুলো বাড়তি আছে। (দারাকুতনী ১ম খণ্ড ১৭৫ পৃঃ)

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, (তাহাজ্জুদের নামায পড়ার আশায়) যদি কেউ ঘুমিয়ে পড়ে অথবা ভুলে যান এক বিত্র না পড়া হয় তাহলে সে তখনই নামায পড়বে যখন তার মনে পড়ে অথবা সকালে ঘুম ভাঙলে। (তিরমিযী, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, মিশকাত ১১৩ পৃঃ, বুলুগল মারাম ২৮ পৃঃ)

হানাফী মতে মাকরুহ ওয়াস্ত ছাড়া অন্য সময়ে বিত্র কাযা পড়া যাবে। শাফিযী মতে দিনে ও রাতে যে কোন সময় চলবে। ইমাম মালিক ও ইমাম আহমাদের মতে ফজরের নামাযের আগ পর্যন্ত হবে। (ফিকহুস সুন্নাহ ১ম খণ্ড ১৯৭ পৃঃ)

## কুনূতে নাযেলাহ

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ যখন কারো জন্য বদদু'আ করার ইচ্ছা করতেন তখন রুকু'র পর দু'আতে কুনূত পড়তেন.....- (বুখারী ও মুসলিম)। ইবনে আব্বাস বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ রাআল, যাকোয়ান ও

উসায়্যাহ নামক কতিপয় গোত্রের বিরুদ্ধে বদু'আ করার জন্য যোহর, আসর, মাগরিব, এশা ও ফজরের নামাযে 'সামি'আল্লা-হু লিমান হামিদাহ' বলার পর একাদিক্রমে একমাস ধরে দু'আয়ে কুনূত পড়েন এবং তাঁর পিছনে মুক্তাদীরা আমীন বলতে থাকে— (আবু দাউদ, মিশকাত ১১৩-১১৪ পৃঃ)।

উক্ত হাদীসগুলোর ভিত্তিতে জমহুর (অধিকাংশ) উলামার মতে কোন সময়ে মুসলিম কওম যদি বিপদে পড়ে অথবা কলেরা, বসন্ত, প্লেগ ইত্যাদি মহামারী বা দুর্ভিক্ষে পতিত হয় কিংবা দুশমন দ্বারা অবরুদ্ধ বা আক্রান্ত হয় তাহলে বিতর ছাড়া পাঁচ ওয়াক্ত নামাযে পরিস্থিতি অনুযায়ী ইমামের দু'আ কুনূত উচ্চৈঃস্বরে পড়া এবং মুক্তাদীরা আমীন বলা সুন্নাত ও মুস্তাহাব এবং বিপদের সময় ছাড়া ভাল সময়ে ফজর ব্যতীত যোহর, আসর, মাগরিব ও এশার চার ওয়াক্তে দু'আ কুনূত পড়া সুন্নাত নয়। এ ব্যাপারে সবাই একমত।

থাকলো ফজরের ওয়াক্ত। এ ব্যাপারে আহলে হাদীসদের দু'টি মত। দ্বিতীয় সূফ্বী আল্লামা নওয়াব সিদ্দীক হাসান খান ভূপালীর মতে ফজরের সময় কখনো কখনো দু'আ কুনূত পড়া সুন্নাত। তাঁর দলীল দারাকুতনী, বায়হাকী ও হাকিমের কতিপয় রিওয়াযাত। কিন্তু আল্লামা 'উবায়দুল্লাহ রহমানী সাহেবের মতে চলবে না। (মুহাদ্দিস দিল্লী, অক্টোবর ১৯৪১ সংখ্যা ১৮-১৯ পৃঃ)

কুনূতে নাযিলার জন্য নাবী ﷺ থেকে কোন খাস দু'আর প্রমাণ নেই। যেমন বিতরের জন্য খাস দু'আ পাওয়া যায়। (মিরআত ২য় খণ্ড ২২০ পৃঃ)

## কুনূতে নাযেলার দু'আ

উমর (রাঃ) রুকু'র পরে কুনূতে (না-যিলা) এ দু'আ পড়েছিলেন।

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْفَ  
بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَأَصْلَحْ ذَاتَ بَيْنِهِمْ وَأَنْصُرْهُمْ عَلَى عَدُوِّكَ وَعَدُوِّهِمْ اللَّهُمَّ الْعَنِ  
الْكُفْرَةَ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِكَ وَيُكَذِّبُونَ رُسْلَكَ وَيُقَاتِلُونَ أَوْلِيَاءَكَ  
اللَّهُمَّ خَالَفَ بَيْنَ كَلِمَتِهِمْ وَزَلَزِلْ أَقْدَامَهُمْ وَأَنْزِلْ بِهِمْ بِأَسْكَ الَّذِي لَا تَرُدُّهُ  
عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ.

উচ্চারণ : আল্লা-হুমাগফির লানা ওয়ালিল মু'মিনীনা ওয়াল মু'মিনা-তি ০  
 ওয়াল মুসলিমীনা ওয়াল মুসলিমা-তি ০ ওয়াআল্লিফ বাইনা কুলুবিহিম ০  
 ওয়াআসলিহ যা-তা বাইনিহিম ওয়ানআনসুরহম 'আলা- 'আদু-উইকি ০  
 ওয়া'আদু-উইহিম ০ আল্লা-হুমা'আনিল কাফরাতাল্লাযীনা ইয়াসুদুনা 'আন  
 সাবীলিকা ০ ওয়াইউকায্যিবুনা রুসূলাকা ০ ওয়াইউকা-তিলুনা আউলিয়া-আকা ০  
 আল্লা-হুমা খা-লিফ বাইনা কালিমাতিহিম ০ ওয়াযালযিল আক্দা-মাহম ০  
 ওয়াআনযিল বিহিম বা'সাকাল্লাযী লা- তারুদুহ 'আনিল ক্বাওমিল মুজরিমীন ০

তরজমা : হে আল্লাহ! আমাদের ক্ষমা কর এবং বিশ্বাসী পুরুষ ও নারীদের  
 এবং মুসলিম পুরুষ ও নারীদেরও মাফ কর। আর তাদের হৃদয়গুলো জুড়ে দিও  
 এবং তাদের মধ্যে সমঝোতা করে দিও। আর তাদেরকে তুমি তোমার দুশমন  
 এবং তাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে সাহায্য কর। হে আল্লাহ! যারা তোমার পথ থেকে  
 (লোকদের) বিভ্রান্ত করে এবং তোমার রসূলদের মিথ্যাবাদী বলে আর তোমার  
 বন্ধুদের সাথে লড়াই করে সেই সব কাফিরদের উপর তুমি অভিসম্পাত বর্ষণ কর।  
 হে আল্লাহ! তুমি তাদের কথার মধ্যে বিরোধিতা সৃষ্টি করে দাও এবং তাদের  
 পা-গুলো টলমলে করে দাও আর তাদের মধ্যে তুমি তোমার এমন বিপদ নামিয়ে  
 দাও যা তুমি পাপাচারী সম্প্রদায় থেকে সরিয়ে দাও না।

(বায়হাকী ২য় খণ্ড ২১০-২১১ পৃঃ)

## বিতরের পর দুই রাক'আত নফল নামায

আবু উমামাহ থেকে বর্ণিত, নাবী ﷺ বিতরের পর দু' রাক'আত নামায বসে  
 বসে পড়তেন। তাতে তিনি ১ম রাক'আতে সূরা ইয়া-যুল যিলাতিল আরযু এবং ২য়  
 রাক'আতে সূরা কাফিরুন পড়তেন— (আহমাদ, মিশকাত ১১৩ পৃঃ)। এ হাদীস  
 প্রমাণ করে যে, বিতরের পর দুই রাক'আত হালকা নফল নামায বসে বসে পড়া  
 যেতে পারে। তবে এর মানে এ নয় যে, ঐ দু' রাক'আত সর্বদা বসে বসেই  
 পড়তে হবে। কারণ এ দু' রাক'আত সম্পর্কেই মা 'আয়িশা বলেন, নাবী ﷺ এক  
 রাক'আত বিতর পড়তেন। তারপর তিনি দু-রাক'আত বসে বসে পড়তেন। কিন্তু  
 যখন তিনি রুকুতে যাবার ইচ্ছা করতেন তখন উঠে দাঁড়াতেন, তারপর রুকুতে  
 যেতেন। (ইবনে মাজাহ, মিশকাত ১১৩ পৃঃ)

বসার কারণ সম্পর্কে তিনি বলেন, আমি নাবী ﷺ-কে রাতের নামায কখনো বসে পড়তে দেখিনি। তবে হ্যাঁ, যখন তিনি বুড়ো হয়ে আসেন তখন বসে বসে পড়া শুরু করতেন। অতঃপর যখন ৩০ বা ৪০টি আয়াত বাকি থাকতো তখন তিনি উঠে দাঁড়াতেন এবং তারপর রুকু ও সিজদা করতেন। এরূপ দ্বিতীয় রাক'আতেও করতেন— (মুসলিম)। অন্য বর্ণনায় হাফসা (রাঃ) বলেন, আব্বাহর নাবী এরূপ কাজ মৃত্যুর মাত্র এক বছর আগে করেছিলেন— (ইবনে খুযায়মা ২য় খণ্ড ২৩৮ পৃঃ)।

মা 'আয়িশা ও হাফসা (রাঃ) বর্ণিত, হাদীস দু'টি দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ৬০ বৎসরের উপরের বৃদ্ধরা সর্বদা বসে বসে নফল নামায পড়তে পারে। কিন্তু জোয়ানেরা সব সময় নয়, কোন ওজর থাকলে কখনো কখনো পারে। এ ব্যাপারে ইমাম নববী বলেন, দাঁড়াবার শক্তি থাকা সত্ত্বেও বসে নফল নামায পড়া জাযিম। তবে ওর নেকী অর্ধেক হবে— (রওয়াহ ১ম খণ্ড ২৩৯ পৃঃ)। হানাফী ফকীহরা বলেন, বসে নফল পড়া মকরুহ— (শারহে নিকায়াহ ১ম খণ্ড ১০৩ পৃঃ)।

একটি হাদীসে আছে, 'আবদুল্লাহ ইবনে 'আমর (রাঃ) বলেন, আমি নাবী ﷺ-কে বসে নামায পড়তে দেখে বললাম, আমি শুনেছি যে, আপনি বলেছেন, দাঁড়ানোর চেয়ে বসে নামাযের নেকী অর্ধেক। তিনি বললেন, হ্যাঁ, কিন্তু আমি তোমাদের কারোর মত নই। (ইবনে খুযায়মা ২য় খণ্ড ২৩৬ পৃঃ)

## বিত্র ও তার পরের নফল প্রসঙ্গে

একটি হাদীসে নবী ﷺ বলেন, তোমরা বিত্রকে রাতের শেষ নামায কর।

(বুখারী, মুসলিম, বুলুগল মারাম ২৭ পৃঃ)

আগের শিরোনামার অধীনে বর্ণনা করা হয়েছে যে, নবী ﷺ বিত্রের পরও দু'রাক'আত নফল পড়তেন। (আহমাদ, ইবনে মাজাহ, মিশকাত ১১৩ পৃঃ)

উপরের দু'টি হাদীস বাহ্যতঃ পরস্পর বিরোধী। তাই ওদের মধ্যে সমন্বয় করার উদ্দেশ্যে হাদীস বিশারদগণ বলেন, বিত্রের পর দু'রাক'আত নফল নামায নাবী ﷺ সর্বদা পড়তেন না। কখনো পড়তেন এবং কখনো ছেড়ে দিতেন। ঐ দু'রাক'আত নাবী সাহেবের জন্য খাস ছিল। কিন্তু উম্মাতের জন্য বিধান হল বিত্রকেই রাতের শেষ নামায করা। (নায়লুল আওতার ২য় খণ্ড ২৮১ পৃঃ)

তবে কেউ যদি কখনো কখনো বিত্বের পর দু'রাক'আত নফল নামায পড়তে চায় তাহলে আলিমদের মতে পড়তে পারে। কারণ, ইমাম নববী বলেন, নাবী ﷺ ঐ দু'রাক'আত নফল একবার কিংবা মাত্র কয়েকবার পড়েছিলেন তা বৈধ করা জন্য। (তুহফাতুল আহযযী ১ম খণ্ড ৩৪৫ পৃঃ)

## সিজদায়ে সাহুও বা ভুলের সিজদা

মানুষের দ্বারা ভুল ভ্রান্তি হওয়া স্বাভাবিক। দুনিয়ার কাজে যেমন তার দ্বারা ভুল হয় তেমনি ইবাদাতের কাজেও শয়তান তাকে অনেক সময় ভুলিয়ে দেয়। সে জন্য আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, তোমাদের কেউ যখন নামাযে দাঁড়ায় তখন (খিনযাব নামক) শয়তান তার মাথা গুলিয়ে দেয়। ফলে সে ধরতে পারে না যে, সে কয় রাক'আত নামায পড়ল। অতএব তোমাদের কারো অবস্থা যখন এরূপ হবে তখন সে বসে দু'টো সিজদা দেবে— (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৯২ পৃঃ)। এ সিজদা দু'টোকে সিজদায়ে সাহুও বা ভুলের সিজদা বলে। ইমাম দাউদ যাহিরী বলেন, নাবী ﷺ-এর ৫ বার সাহুও হয়েছিল— (বায়লুল মানফাআহ ৩৪ পৃঃ)।

## আত্তাহিয়াতু ছুটে গেলে

একদা নাবী ﷺ যোহরের নামায পড়ালেন। অতঃপর দুই রাক'আতের পর তিনি (ভুলবশতঃ) আত্তাহিয়াত না পড়ে তৃতীয় রাক'আতে উঠে দাঁড়ালেন। পরিশেষে সালাম ফেরার আগে তিনি বসে বসে আল্লাহ আকবার বলে দু'টো সিজদা দিলেন, তারপর সালাম ফিরলেন। (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৯৩ পৃঃ)

রসূল ﷺ বলেন, যদি কোন ইমাম দুই রাক'আতের পর আত্তাহিয়াত না পড়ে দাঁড়িয়ে যায় এবং সোজা হয়ে দাঁড়াবার আগেই যদি তার ভুল ধরা পড়ে যায় তাহলে সে বসে পড়বে এবং আত্তাহিয়াতু পড়বে, তাকে সাহুও সিজদা দিতে হবে না। আর যদি সে একবারে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে যায় তাহলে সে আর যেন বসে না যায় এবং সবশেষে দু'টো সাহুও সিজদা দিয়ে দেয়। (আবু দাউদ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত ৯৩ পৃঃ)

## চার রাক'আতের জায়গায় দুই রাক'আত হলে

আবু হুরায়রা বলেন, একদা আল্লাহর রসূল ﷺ যোহর কিংবা আসরের নামায পড়ালেন এবং দুই রাক'আত পড়ে (ভুলে গিয়ে) সালাম ফিরে দিয়ে উঠে গেলেন;

অতঃপর মাসজিদে পড়ে থাকা একটা কাঠের ওপর ভর দিয়ে বসলেন। তখন মনে হচ্ছিল যে, তিনি যেন রেগে রয়েছেন। তারপর তিনি ডান হাতটি বাম হাতের উপর রাখলেন। ইত্যবসরে তাড়াহুড়াকারীরা চলে গেল এবং বাকি লোকেরা আপোষে বলাবলি করতে লাগলো—নামায কি কমিয়ে দেয়া হয়েছে? ওদের মধ্যে আবু বাকর (রাঃ) এবং ‘উমরও ছিলেন, কিন্তু রসূলুল্লাহ ﷺ-এর গাভীর্য দেখে কেউ কথা বলতে সাহস পাননি। ঐ দলে আর একজন লোক ছিলেন যার হাত লম্বা ছিল। তাঁকে যুলইয়াদাইন (দুই হাত ওয়ালা) বলা হত। তিনি নাবী ﷺ-কে বললেন, হে আল্লাহর রসূল ﷺ! নামায কি কমিয়ে দেয়া হয়েছে? নাকি আপনি ভুলে গেছেন? তিনি বললেন, ভুলও হয়নি এবং কমও হয়নি। অতঃপর তিনি সাহাবীদের জিজ্ঞেস করলেন, যুলইয়াদায়েন কি ঠিক বলছে? সাহাবীরা বললেন, হ্যাঁ। অতঃপর তিনি আগে বাড়লেন এবং ছেড়ে যাওয়া (দুই রাক‘আত) নামায পড়ালেন। তারপর সালাম ফিরে ‘আল্লাহু আকবার’ বলে আগের মত দু’টো সিজদা কিংবা তার চেয়েও দীর্ঘ দু’টো সিজদা দিলেন তারপর আবার সালাম ফিরালেন। (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৯২-৯৩ পৃঃ)

এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, নামায যদি কম পড়া হয় এবং উঠে চলে গিয়ে কথাবার্তা বলার পর ভুলটা ধরা পড়ে তথাপি পুরো নামায পুনরায় পড়তে হবে না। বরং ছাড় যাওয়া বাকি নামায পড়ে সিজদায়ে সাহুও দিলেই যথেষ্ট হবে। কেউ কেউ বলেন যে এ হাদীসটি মানসূখ বা রহিত (মিশকাত ৯৩ পৃঃ ৪র্থ ও ৫ম লাইনের মাঝখানে লেখা আছে যে, হাদীসটি মানসূখ)। এটা তাদের কিয়াসী ও কাল্পনিক কথা। এটা রসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীস নয়। কিংবা সাহাবায়ি কিরাম অথবা মুহাদ্দিসীনে কিরামের মন্তব্য নয়।

## চারের জায়গায় তিন রাক‘আত হলে সিজদাহ

ইমরান ইবনে হুসায়ন বলেন, একদা আল্লাহর রসূল ﷺ আসরের নামায (ভুলে) তিন রাক‘আত পড়ে সালাম ফিরে দিয়ে ঘরে চলে গেলেন। তারপর খিরবাক নামক এক সাহাবী এ ভুলটা ধরিয়ে দেয়ায় এবং অন্যান্য সাহাবীরাও তাঁর কথা সমর্থন করায় তিনি (ﷺ) এক রাক‘আত নামায আবার পড়ালেন। অতঃপর তিনি সালাম ফিরে দু’টো সিজাদায়ে সাহুও দিলেন এবং আবার সালাম ফিরালেন।

(মুসলিম, মিশকাত ৯৩ পৃঃ)

## পাঁচ রাক'আতে সিজদাহ

ইবনে মাস'উদ (রাঃ) বলেন, একদা আব্বাহর রসূল ﷺ যোহরের নামায পাঁচ রাক'আত পড়ালেন। (ফলে জিজ্ঞেস করা হয়) নামায কি বেশী করা হয়েছে? তিনি (ﷺ) বললেন, তার মানে? সাহাবীরা বললেন, আপনি পাঁচ রাক'আত পড়েছেন। তারপর তিনি সালামের পর দু'টো সিজদা দিলেন। অন্য বর্ণনায় আছে, তিনি বললেন, আমি তোমাদেরই মত মানুষ। আমিও ভুলে যাই যেমন তোমরা ভুলে যাও। সুতরাং আমি যখন ভুল করি তখন তোমরা আমাকে মনে করিয়ে দিও। আর তোমাদের কেউ যখন সন্দেহে পড়বে তখন সে একটা সঠিক রায় কায়ম করবে, তারপর ঐ রায় মোতাবেক নামায পুরো করে সালাম ফিরাবে এবং দু'টো সিজদাও দেবে। (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৯২ পৃঃ)

যার নামাযে এ সন্দেহ হয় যে, সে এক রাক'আত পড়েছে, না দু'রাক'আত তখন সে ওটাকে এক রাক'আত মনে করবে। আর যার দুই বা তিনের মধ্যে সন্দেহ হবে, সে সেটাকে দু'রাক'আত ধরবে। কারো যদি তিন ও চারের মধ্যে সন্দেহ হয় তাহলে সে ওটাকে তিন গণ্য করবে। (অতঃপর বাকীটা পুরো করে) সালাম ফেরানোর আগে দুটো সাহুও সিজদা দেবে। (তিরমিযী, ৫৩ পৃঃ, ইবনে মাজাহ ৮৬ পৃঃ, নাসবুর রায়াহ ২য় খণ্ড ১৭৪ পৃঃ)

সহীহ মুসলিমে আবু সা'ঈদ খুদরী (রাযিঃ) বর্ণিত হাদীসে রয়েছে যে, নামায যদি ভুল না হয় তাহলে সন্দেহের কারণে সিজদায়ে সাহুও দেয়ার ফলে সিজদা দু'টি শয়তানের নাকে খত দেয়া হবে আর যদি রাক'আত বাড়তি হয় তাহলে সেটা আবু দাউদের রিওয়াযাত অনুযায়ী বেজোড়ের জায়গায় জোড় হয়ে গিয়ে নফলে পরিণত হবে। (মিরআতুল মাফাতীহ ২য় খণ্ড ২৯ পৃঃ)

## সাহুও সিজদা কিভাবে দেয়া হবে?

পূর্বোক্তিস্থিত সহীহ হাদীস দ্বারা প্রামাণিত হয় যে, নামাযে ভুলত্রুটি হলে শেষ বৈঠকে বসে আতাহিয়াতু, দরুদ ও দু'আয়ে মাসূরা পড়ার পর সালাম ফেরানোর আগে 'আব্বাহ আকবার' বলে নামাযে যেমন সিজদা দেয়া হয় সেরূপ দু'টি সিজদা দিতে হবে এবং সিজদার দু'আও তাই পড়বে, যা নামাযের সিজদায় পড়া হয়। অতঃপর সিজদা থেকে উঠে সালাম ফিরাতে হবে। এটা হল আহলে হাদীস ও

শাফিয়ী মাযহাবের মত এবং মালিকী ও হাম্বলীরাও শর্ত সাপেক্ষে সালামের আগে ও পরে সাহুও সিজদার পক্ষপাতী- (বিদায়াতুল মুজতাহিদ ১ম খণ্ড ১৮৫ পৃঃ)। অন্যান্য সহীহ হাদীস দ্বারা এটাও জানা যায় যে, প্রথমে সালাম ফিরাতে হবে এবং তারপরে সিজদায়ে সাহুও দিতে হবে। এরূপ করাই সুন্নাত।

কিন্তু হানাফীরা দুই দিকে সালাম না ফিরে কেবল একদিকে সালাম ফেরানোর পর সাহুও সিজদা দেয়। হিদায়াত ব্যাখ্যাকার আল্লামা ইবনুল হুমাম হানাফী বলেন, একদিকে সালাম ফিরানোকে বিদআত বলা হয়েছে- (ফাতহুল কাদীর ১ম খণ্ড ২২২ পৃঃ)। তাই হিদায়াওয়ালা বলেন, দু'দিকে সালাম ফেরানোই সঠিক- (হিদায়া ১ম খণ্ড ১৩৭ পৃঃ)। এ সম্পর্কে হাদীস ও ফিকহের নাড়ীবিদ ভারতের বিখ্যাত মনীষী আল্লামা 'আবদুল জলীল সামরুদী এবং পাকিস্তানের প্রথিতযশা আহলে হাদীস আলেম মাওলানা সাদেক শিয়ালকোটী (রহঃ) বলেন, শুধুমাত্র একদিকে সালাম ফেরার পর সিজদায়ে সাহুও দেয়া কোন হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় না- (যাহরাহ ২২০ পৃঃ ও সলাতুর রসূল ২৯৬ পৃঃ)। তাছাড়াও হানাফীগণ একদিকে সালাম ফিরে দু'টো সিজদা দেবার পর আবার তাশাহুদ পড়ে, তারপর দু'দিকে সালাম ফিরায়।

এই দ্বিতীয়বার তাশাহুদ পড়া সম্পর্কে হাফিয যায়লায়ী হানাফী বলেন, সাহুও সিজদার পর তাশাহুদ পড়ার প্রমাণে কোন সহীহ হাদীস নেই- (নাসবুর রায়াহ, মাসায়িল ও নামায শিক্ষা ৫৩ পৃঃ)। এ ব্যাপারে ইমাম শওকানী বলেন, দ্বিতীয়বার তাশাহুদ সম্পর্কে (১) 'ইমরান ইবনে হুসায়ন, (২) ইবনে মাস'উদ (রাঃ), (৩) মুগীরাহ (রাঃ), (৪) 'আয়িশা (রাঃ) বর্ণিত যে হাদীসগুলো পাওয়া যায় সবগুলোই যয়ীফ ও দুর্বল- (নায়লুল আওতার ২য় খণ্ড ৩৭৩ পৃঃ)।

তবে হাফিয ইবনে হাজার আসকালানী বলেন : কেউ কেউ বলেছেন, ইরান, ইবনে মাস'উদ ও মুগীরার রিওয়ায়াতগুলো এক জায়গায় করলে হাদীসটি যয়ীফ থেকে হাসানে উন্নীত হয়। (ফাতহুল বারী ৩য় খণ্ড ৯৯ পৃষ্ঠা)

নোট : এ কথাটা সবারই জেনে রাখা উচিত যে, হাদীসের বড় বড় পণ্ডিতগণ বলেন, যখন কোন বিষয়ে সহীহ হাদীস পাওয়া যাবে তখন তার মোকাবেলায় যয়ীফ ও হাসান প্রভৃতি হাদীসের উপর আমল করা চলবে না।



## সিজদায়ে সাহুওর পর তাশাহুদ না পড়া সম্পর্কে হানাফী ফকীহদের মতামত

দ্বিতীয় আবু হানীফা\* আল্লামা ইবনে নুজাইম বলেন, তাজনীস গ্রন্থে বলা হয়েছে, কেউ যদি দু'টি সিজদা দেবার পর না বসে তাহলে তার নামায নষ্ট হবে না। কারণ ঐ বসাটা নামাযের কোন রুকুন ও অঙ্গ নয়— (আলবাহরুর রাযিক ২য় খণ্ড ৯৩ পৃঃ)। আল্লামা শামী বলেন, কেউ যদি সিজদায় সাহুও থেকে মাথা তুলেই সালাম ফিরিয়ে দেয়া তাহলেও তার নামায সহীহ হবে— (শামী ১ম খণ্ড ৬৯২ পৃঃ)।

খাযা-নাতুর রিওয়াযাত ১৭০ পৃষ্ঠায় আছে, সিজদায়ে সাহুওর পর বসাটা ফরয নয়। এমন কি কেউ যদি ভুলের সি জদা দিয়েই দাঁড়িয়ে পড়ে ও চলে যায়, না বসে, তবু তার নামায নষ্ট হবে না। ফুরুক মামাতী ৩৮৪ পৃষ্ঠায় আছে, শামসুল আযিম্বা হালওয়ায়ী বলেন, ভুলের দু'টি সিজদার পর বসাটা নামাযের কোন রুকুনই নয়।

(যাহারাতু রিয়াযিল আবরার ২২১ পৃঃ)

উক্ত সমস্ত মন্তব্যগুলো প্রমাণ করে যে, ভুলের সিজদার পর আবার তাশাহুদ পড়া জরুরী নয়। যারা নিজেদের ফকীহদের ফাতওয়া অর্ধেক মানে এবং অর্ধেক মানে না আল্লাহ তাদের সুমতি দিন। আমীন।

## ইমাম ও মুক্তাদীর ভুল হলে

উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর নাবী ﷺ বলেন, মুক্তাদীর ভুল হলে সাহুও নেই। কিন্তু ইমাম ভুল করলে ইমাম ও মুক্তাদী উভয়কেই সাহুও সিজদা দিতে হবে। (বায়যার, বায়হাকী, বুলুগল মারাম ২৫ পৃঃ)

বিখ্যাত তাবিয়ী ইবরাহীম বলেন, কেউ যদি তার নামাযে বারংবার ভুল করে তাহলে তার সমস্ত ভুলের জন্য দু'টো সিজদাই যথেষ্ট— (মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা ২য় খণ্ড ৪৩ পৃঃ)। আর এক তাবিয়ী হাসান বলেন, সিজদায়ে সাহুওর মধ্যে ভুল হলে তা ভুল নয়— (ঐ- ৩২ পৃঃ)।

হাসান বলেন, কেউ যদি এ সন্দেহে পড়ে যে, সে নামায পড়েছে কিনা তাহলে ওয়াক্ত থাকলে সে ঐ ওয়াক্তে নামায পড়ে নেবে। আর ওয়াক্ত যদি চলে


\* দারুল কুতুবিল আরাবিয়াতিল কুবরা কর্তৃক প্রকাশিত 'বাহরে রা-য়িকের মলাটে আল্লামা ইবনে নুজাইমকে দ্বিতীয় আবু হানীফা বলা হয়েছে। -এস এ বারী

যায় তাহলে ঐ ওয়াক্তের নামায পুনরায় তাকে পড়তে হবে না। (মুসান্নাফ আবদুর রাযযাক ২য় খণ্ড ৩১৮ পৃঃ)

আতা ও হাম্মাদ বলেন, কেউ যদি নামাযের মধ্যে সিজদার আয়াত পড়ার পর সিজদায় না গিয়ে ভুল করে রুকুতে চলে যায় তাহলে সে সবশেষে দু'টি সিজদায়ে সাহুও দেবে- (ঐ ৩১৯ পৃঃ)। আতা বলেন, কেউ যদি ভুল করে একটা কিংবা তিনটা সিজদা দিয়ে ফেলে তাহলে সে দু'টি সিজদায়ে সাহুও দেবে। কিন্তু সে যদি ভুল করে রুকু ছেড়ে দেয় তাহলে তাকে নামায পুনরায় পড়তে হবে- (ঐ ৩১৯ পৃঃ)।

শা'বী ও কাতাদাহ বলেন, কেউ যদি ভুল করে “সামি’আল্লা-হু লিমান হামিদা”র জায়গায় ‘আল্লাহু আকবার’ বলে ফেলে তাহলে সিজদায়ে সাহুও দিতে হবে না- (ঐ ৩২৮ পৃঃ ৩২৯ পৃঃ)। কোন মাসবুক যদি ইমামের সালাম ফেরার সাথে ভুল করে সালাম ফিরে দেয় তাহলে তার নামায নষ্ট হবে না। কিন্তু সে যদি ইচ্ছাকৃত সালাম ফেরায় তাহলে তার নামায নষ্ট হয়ে যাবে- (ফাতাওয়া আলমগীরী, মজমুআহ ফাতওয়া ২১৫ পৃঃ)।

## ইমামের ভুল কিভাবে ধরতে হবে

নারী  বলেন, নামায পড়া অবস্থায় যদি কোন পুরুষ মুসল্লীর কোন কিছু বলার প্রয়োজন হয় তাহলে সে সুবহা-নাল্লাহ বলবে এবং মেয়ে নামাযী হলে হাতে তালি দেবে- (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৯১ পৃঃ)। ‘আলী (রাঃ) বলেন, আল্লাহর রাসুলের কাছে ভোর বেলায় আসার জন্য আমার একটা নির্দিষ্ট সময় ছিল। তখন যদি তিনি নামাযে থাকতেন তাহলে আমার জন্য ‘সুবহা-নাল্লাহ’ বলতেন। তাঁর এ বলাটা আমার আসার অনুমতি ছিল এবং তখন যদি তিনি নামাযে না থাকতেন তাহলে মুখে অনুমতি দিতেন- (মুসনাদে আহমাদ নায়লুল আওতার ২য় খণ্ড ২২২ পৃঃ)।

উল্লিখিত দু'টি রিওয়াযাত প্রমাণ করে যে, কোন নামাযীকে নামায পড়া অবস্থায় যদি কিছু বলতে হয় তাহলে সে পুরুষ হলে সুবহা-নাল্লাহ বলবে এবং নারী হলে হাতে তালি দেবে। আবু দাউদের রিওয়াযাতে আছে যে, মেয়েরা ডান হাতের দুই আঙ্গুল বাম হাতের তালুতে মেরে আওয়াজ করবে। এ হাদীসের ভিত্তিতে উলামায়ে কিরাম বলেন, পুরুষদের জামা’আতে মেয়েদের ইকামত দেয়া মোটেই চলবে না। (মিরআতুল মাফাতীহ ২য় খণ্ড ১০-১১ পৃঃ)

জামা'আতে নামায পড়ান অবস্থায় ইমাম যদি কোন ভুল করে তাহলে মুক্তাদীদের কর্তব্য হল ঐ ভুলটা ধরিয়ে দেয়া। তাই মুক্তাদীকে কিছু বলতে হয়। তখন ইমাম যদি কিরাআতে ভুল করে তাহলে কোন মুক্তাদী পেছন থেকে কোন কথা না বলে শুধুমাত্র একজন মুক্তাদী সঠিক কিরাআতটা পড়ে দেবে এবং তা শুনে ইমাম সেটা সংশোধন করে নেবেন। ইমাম যদি একবারে সঠিক কিরাআত ধরতে না পারেন তাহলে মুক্তাদী আবার কিরাআতটি পড়ে দেবে। (আবু দাউদ, ইবনে হিব্বান, ফাতওয়া নাযীরিয়া ১ম খণ্ড ২৪৩ পৃঃ)

একদা নাবী ﷺ ফজরের নামাযে কিরাআত গুলিয়ে ফেলেন। তারপর নামাযের পর বলেন, এ গোলমালের কারণ হল ঐসব মুসল্লী যারা আমার সাথে নামায পড়ে কিন্তু ভাল করে পাকসাফ হয় না (অর্থাৎ অযু গোসল ঠিকমত করে না)। (নাসায়ী, মিশকাত ৩৯ পৃঃ)

ইমাম যদি কিরাআত ছাড়া রুকু, সিজদা, রাক'আত ও আস্তাহিয়াতু প্রভৃতিতে ভুল করে তাহলে উক্ত হাদীসের ভিত্তিতে পুরুষ মুক্তাদী 'সুবহানাল্লা-হ' বলবে এবং নারী মুক্তাদী হলে হাতে হাত মেরে আওয়াজ দিবে। তখন ইমাম সাহেব বুঝে নেবেন যে, তিনি কোন ভুল করেছেন। ভুল ধরিয়ে দেবার পর ইমাম যদি ভুলটা তখনই ঠিক করে নেন তাহলে সিজদায়ে সাহুও দিতে হবে না। কিন্তু যদি ভুল সংশোধন না হয় কিংবা সংশোধন হলেও ইমামের মনে যদি সন্দেহ থাকে তাহলে তাকে সিজদায়ে সাহুও দিতে হবে।

হানাফী ফিক্‌হ বলে ইমামের ভুল ধরাবার জন্য মুক্তাদী 'আল্লাহু আকবার' বলবে। কিন্তু দিল্লী রহমানিয়া মাদ্রাসার কৃতি ছাত্র মাওলানা ইসমাতুল্লাহ রহমানী বলেন, 'সুবহা-নাল্লা-হ' ছাড়া অন্য কোন শব্দ যেমন 'আল্লাহু আকবার' বলা চলবে না। কারণ, সহীহ হাদীসে কেবল 'সুবহা-নাল্লা-হ' শব্দ এসেছে। সুতরাং 'সুবহা-নাল্লা-হ' ছাড়া অন্য শব্দ বলা সুন্নাতের খেলাফ। (সলাতুল মুত্তফা ৫৯ পৃঃ)

## সালামের আগে ও পরে সিজদায়ে সাহুও

বিভিন্ন হাদীসে সিজদায়ে সাহুওর কথা দু' রকমই এসেছে। শেষ সালামের আগে কিংবা সালামের পরে। ইমাম শাফিয়ী (রহঃ) সালামের আগে পছন্দ করেন। ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) সালামের পরে। ইমাম মালিকের মতে, নামাযে যদি

কমের সন্দেহ হয় তাহলে সালামের পরে। কিন্তু যদি বেশীর সন্দেহ হয় তাহলে সালামের আগে সিজদায়ে সাহুও দিতে হবে।

আহলে হাদীস আলিমদের মতে দু' রকমই ঠিক। কোন একটি দিককে নির্দিষ্ট করার কোন কারণই নেই। (তুহফাতুল আহওয়ায়ী ১ম খণ্ড ৩০৪ পৃঃ)

## কাযা নামাযের বিবরণ

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, যদি কেউ নামায পড়তে ভুলে যায় অথবা ঘুমিয়ে থাকার ফলে নামাযের ওয়াক্ত চলে যায় তাহলে যখনই তার নামাযের কথা মনে পড়বে কিংবা ঘুম ভাঙবে তখনই সে নামায পড়ে নেবে। (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৬১ পৃঃ)

সূর্য ওঠা ও ডোবার সময় নামায পড়তে মানা। কিন্তু রাতে ও দুপুরে ঘুমিয়ে থাকার ফলে বা অন্য কোন অসুবিধার কারণে কেউ যদি সূর্য ওঠা ও ডোবার ৫/৬ মিনিট আগেও নামায পড়ার সময় পায় তাহলে সে তৎক্ষণাৎ অযু করে নামাযে দাঁড়াবে। অতঃপর সূর্য ওঠা বা ডোবার পূর্ব মুহূর্তেও যদি সে এক রাক'আত নামায পড়তে পারে তাহলে সূর্য ওঠা ও ডোবার পর বাকি এক রাক'আত বা তিন রাক'আত নামায পড়লে তার ফজরের ও আসরের নামায কাযা হবে না, বরং আদায় হয়ে যাবে। (ঐ- পৃঃ ঐ)

যদি কারো সূর্য ওঠার পর কোনদিন ঘুম ভাঙ্গে তাহলে সে যোহর পর্যন্ত অপেক্ষা না করে ঘুম ভাঙ্গার সাথে সাথেই ফজরের নামায পড়ে নেবে। এরূপ যোহর কাযা করলে আসরের সময় নামায পড়ে নেবে। আসরের নামায সাধ্যমত কাযা করা উচিত নয়। এমন কি সূর্য ডোবার ২/৪ মিনিট আগে পর্যন্তও পড়ে নেয়া উচিত। যদি তাও সম্ভব না হয় তাহলে মাগরিবের আযানের পর পরই তা পড়তে হবে। এও সম্ভব না হলে মাগরিবের জামা'আতের পর পড়তে হবে। পরদিন আসর পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে না।

মাগরিব কাযা হলে এশার সময় পড়তে হবে। এশার নামাযের সময় খুবই দীর্ঘ। সেজন্য এশা তো কাযা হওয়া উচিত নয়। তথাপিও যদি কেউ ঘুমিয়ে যাবার ফলে ফজর পর্যন্ত এশা না পড়ে থাকে তাহলে সে ফজরের ওয়াক্তে এশা পড়ে নেবে। যদি কারো কয়েক ওয়াক্তের নামায কাযা হয়ে যায় তাহলে সে যখনই সময় পাবে তখনই সব ওয়াক্তের নামায ঐ ওয়াক্তেই পড়ে নেবে।

যদি কেউ মাসজিদে কাযা নামায পড়তে এসে অন্য ওয়াক্তের নামায জামা'আত পায় তাহলে সে প্রথমে জামা'আতে শরীক হবে, তার পরে কাযা নামায একা পড়বে। কিংবা কয়েকজন কাযা নামাযী থাকলে তাকবীর দিয়ে সবাই জামা'আত করে পড়বে।

কোন ওয়াক্তের নামায কাযা হলে কেবল ফরয নামায কাযা পড়লে চলবে। সুন্নাত নামায কাযা পড়লে সুন্নাত পড়তে পারে, না পড়লে আপত্তি নেই। কিন্তু ফজরের নামায কাযা হলে সুন্নাত দু'রাক'আতও কাযা পড়া উচিত। আল্লাহর রসূল ﷺ ঘরে ও সফরে কখনই বিত্ৰ ত্যাগ করেননি। সেজন্য এশা কাযা হলে বিত্ৰও কাযা পড়া উচিত।

### কাযায়ে 'উমরী' ভিত্তিহীন

কোন কোন লোক তার উপরে নামায ফরয হবার পরও অবহেলা করে নামায পড়ে না। অতঃপর তার সুমতি হলে বেশ কয়েক বছর পর সে নামায পড়া ধরে। এরূপ নামাযী সম্পর্কে কোন কোন আলিম তাকে প্রত্যেক ওয়াক্তে তার জীবনের ছাড় যাওয়া নামাযগুলো কিছু কিছু পড়ে আদায় করে দিতে বলেন। যাকে ঐ সব আলেমের পরিভাষায় 'কাযায়ে 'উমরী' বলা হয়। এ কাযায়ে 'উমরী' পড়ার প্রমাণ কুরআন ও হাদীসে কোথাও নেই। সুতরাং এটা মনগড়া ফাতওয়া। তাই যদি কারো কিছু নামায ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃতভাবে ছাড় গিয়ে থাকে তাহলে প্রতি ওয়াক্তে কিছু কিছু নামায পড়ে তাকে ভূত হতে হবে না। বরং ঐ ছাড় যাওয়া নামাযগুলোর জন্য আল্লাহর দরগায় কাঁদাকাটা ও তাওবা করাই যথেষ্ট। কারণ সহীহ হাদীসে রয়েছে যে, কারো ফরয নামায কম পড়ে গেলে নফল নামায তা পুরো করে দিবে— (আবু দাউদ, আহমাদ, মিশকাত ১১৭ পৃঃ)। সেজন্য নফল নামায যত বেশী পড়া যায় ততই লাভ।

### নারী ও পুরুষের নামাযে পার্থক্য আছে কিনা

কতিপয় হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, কয়েকটি বিষয়ে নারী ও পুরুষের নামাযের মধ্যে কিছু পার্থক্য হবে। যেমন কোন নারী মেয়েদের ইমাম হলে তিনি পুরুষ ইমামের মত সামনে না দাঁড়িয়ে মেয়ে মুজাদীদের কাতারের মাঝেই দাঁড়াবেন।

(দারাকুতনী ১ম খণ্ড ১৫৫ পৃঃ)

অন্য বর্ণনা দ্বারা বোঝা যায় যে, মেয়ে ইমাম কোন ভুল করলে মেয়ে মুক্তাদীরা তার ভুল ধরবার জন্য পুরুষদের মত মুখে 'সুবহানাল্লাহ' না বলে হাতে হাত মেয়ে তালি দেয়ার মত আওয়াজ করবে। (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৯১ পৃঃ)

আর একটি হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, পুরুষের মত পরনের কাপড় মেয়েরা পরে থাকলেও প্রাপ্তবয়স্কা মেয়ে একটি বাড়তি চাদর গায়ে দিয়ে নামায না পড়লে তার নামায কবুল হয় না। (আবু দাউদ, তিরমিযী, মিশকাত ৭৩ পৃঃ)

উক্ত তিনটি পার্থক্য ছাড়া নামাযে আর কোন পার্থক্য নারী ও পুরুষের মধ্যে আছে বলে হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় না। তথাপি হানাফী ফকীহরা আরো কয়েকটি পার্থক্যের কথা ফিকহের বইগুলোতে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু ঐ পার্থক্যের প্রমাণে তারা কোন হাদীসই পেশ করতে পারেননি। তারা দু'টি মাসআলায় হাদীস পেশ করলেও ঐ হাদীসগুলো অত্যন্ত যয়ীফ এবং দলীলের অযোগ্য। তাই হাদীস বিশারদদের মতে ঐ মাসআলাগুলো পরিত্যাজ্য। মাসআলাগুলো এই

হানাফী ফকীহগণ বলেন, তাকবীর দেবার সময় মেয়েরা সীনা পর্যন্ত হাত তুলবে- (কাবীরী ২৯৩ পৃঃ)। এবং ক্রীতদাসীরা পুরুষের মত (কাঁধ বা কান পর্যন্ত) তুলবে- (হাশিয়া তাহতাত্তী আলা মারাকিল ফালাহ ১৫২ পৃঃ)। এর প্রমাণে আল্লামা হালাবী হানাফী কোন হাদীস পেশ না করতে পেরে নিজের মায়হাবকে রক্ষা করার জন্য যুক্তির আশ্রয় নিয়ে বলেন, সীনা পর্যন্ত হাত তোলায় নাকি মেয়েদের জন্য অধিক পর্দা হয়- (গুন্যাতুল মুস্তামলী ওরফে কাবীরী ২৯৩ পৃঃ)।

অথচ বুখারী ও মুসলিমের সহীহ হাদীসসহ দুনিয়ার কোন হাদীসে হাত তোলার ব্যাপারে নারী ও পুরুষের পার্থক্যের উল্লেখ নেই বরং একটি হাদীসে আবদু রুব্বিহী ইবনে যায়তুন নামক এক তাবিত্তী বলেন, আমি এক নারী সাহাবী উম্মুদ দারদাকে নামায শুরু করবার সময় এবং রুকু থেকে উঠার পর কাঁধ পর্যন্ত তাঁর দুই হাত তুলতে দেখেছি। (মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বা ১ম খণ্ড ২৯৩ পৃঃ)

তাকবীরে তাহরীমা বলার পর হানাফী নারীরা হাতটা কোথায় বাঁধবে সে সম্পর্কে ফকীহগণ বলেন যে, নারীরা নাভির নীচে হাত না বেঁধে সীনার উপরে হাত বাঁধবে- (কাবীরী ২৯৪, শারহে নিকায়াহ ১ম খণ্ড ৭৩ পৃঃ)। এ ব্যাপারেও ফুকাহায়ে কিরাম হাদীস পেশ করতে না পেরে যুক্তির আশ্রয় নিয়ে বলেন, এতে নাকি পর্দা হবে- (ঐ- পৃঃ, ঐ)।

এ বিষয়েও কোন হাদীসই নেই বলে ভারতের বিখ্যাত হানাফী মুহাদ্দিস আল্লামা 'আব্দুল হাই লাক্কৌতী (রহঃ) বলেন, মেয়েদের বুকে হাত বাঁধা সম্পর্কে কোন হাদীসই আমার নয়রে পড়েনি। (ফাতয়ায়ে আব্দুল হাই মুবাওয়ায ২০২ পৃঃ)

মেয়েদের সিজদা করার পদ্ধতি সম্পর্কে হানাফী ফকীহরা বলেন, তারা সিজদা দেবার সময় পুরুষদের মত উরু ও পেটের মাঝে ফাঁক না রেখে পেটটি দুই উরুর সাথে সঁটিয়ে দেবে। কারণ, এতে তাদের পর্দা হবে- (হিদায়া ১ম খণ্ড ১৪৭ পৃঃ)। এ পদ্ধতির প্রমাণে মাওলানা আঃ হাই লাক্কৌতী (রহঃ) এবং মাওলানা ইয়ায 'আলী দেওবন্দী (রহঃ) মারা-সীলে আবু দাউদ এবং বায়হাকী থেকে দু'টি হাদীস পেশ করেছেন- (শারহে অকায়াহ ১ম খণ্ড ১৪৭ পৃঃ ৫ নং টীকা এবং শারহে নিকায়াহ ১ম খণ্ড ৭৯ পৃঃ ৫ নং টীকা)।

কিন্তু দেওবন্দীদের ভাষায় ভারতের ইমাম বুখারী মাওলানা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী যাকে হাফিযুদ্ দুনয়া (বিশ্বের হাফিয) বলতেন সেই হাফিয ইবনে হাজার আসকালানী উক্ত হাদীস দু'টি সম্পর্কে বলেন, দুটোরই সূত্রে মতরূক বা পরিত্যাগ বর্ণনাকারী রয়েছে- (তালখীসুল হাবীব ৯১ পৃঃ)। সুতরাং দু'টি হাদীসই দলীলের অযোগ্য বিষয় পরিত্যাজ্য। হানাফী বিদ্বানগণও বলেন, মুরসাল হাদীস সহীহ হলে দলীলের যোগ্য হবে- (নাসবুর রায়াহ ১ম খণ্ড ভূমিকা ২৭ পৃঃ)। উক্ত দু'টি হাদীসই মুরসাল, কিন্তু সহীহ নয়, বরং যয়ীফ। সুতরাং হানাফী বিদ্বানদের ঐ নীতি অনুসারেও হাদীস দু'টি দলীলের অযোগ্য।

প্রথম এবং দ্বিতীয় তাশাহুদে নারীদের বসা সম্পর্কে ফকীহরা বলেন, মেয়েরা বাম পাছার উপরে ভর দিয়ে বসবে এবং পা দু'টি ডান দিকে বের করে দেবে। কারণ এতে পর্দা বেশী হবে (হিদায়া ১ম খণ্ড ৯৩ পৃঃ)

অথচ সহীহ হাদীসে রয়েছে যে, রসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিখ্যাত সাহাবী আবুদ দারদা (রাঃ)-এর বিবি উম্মে দারদা (রাঃ) পুরুষদের মত বসতেন- (বুখারী ১১৪ পৃঃ তর্জুমাতুল বাব)। এ হাদীসটির ব্যাখ্যায় হানাফী জগতের চীফ জাফিস আল্লামা আইনী (রহঃ) বলেন, এ হাদীস প্রমাণ করে যে, মেয়েদেরও পুরুষদের মত বসা মুস্তাহাব ও পছন্দনীয়। আর তা হল বাম পা-টা বিছিয়ে তার উপরে বসা এবং ডান পা-টা খাড়া রাখা। ইমাম নাখয়ী, ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম মালিক প্রমুখের মত তাই- (উমদাতুল কারী ৬ষ্ঠ খণ্ড ১০১ পৃঃ)। এ কথা গোপন নয় যে, এ বসাটা

হানাফী ফেকহের কেতাবগুলোকে বর্ণিত পাছার ভরে বসার বিরোধী মত। কারণ এতে নাকি পর্দা বেশী- (বুখারী ১১৪ পৃঃ ৮ নং টীকা)।

ফকীহদের বর্ণিত হানাফী নামাযী মেয়েদের দুই পা এক দিকে বের করে পাছার ভরে বসাটা সাহাবী নারী উম্মে দারদার বসার বিপরীত এ চরম সত্যটি মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করা সত্ত্বেও নিজের মাযহাবকে রক্ষার জন্য আইনী তদীয় ভাষ্যগ্রন্থ উমদাতুল কারীতে বলতে বাধ্য হয়েছেন যে, সুন্নাতের উপরে আমল করার চেয়ে পর্দা রক্ষা করা শ্রেয়। (সলাতুল মুস্তফা ১৮৭ পৃঃ)

উপরোক্ত চারটি পার্থক্যে হানাফী ফকীহগণ হাদীসের বিরোধিতা করে নিজেদের বিবেক অনুযায়ী পর্দার দোহাই দিয়েছেন। এখানে একটা প্রশ্ন ওঠে যে, শরীয়তের বিধানদাতা স্বয়ং আল্লাহ। যিনি কিছু বিধান ‘ওয়াহীয়ে গায়র মাতলু’ দ্বারা নাবী ﷺ-এর মুখে দিয়ে দিয়েছেন। যা হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। তাহলে আল্লাহ এবং রসূল মেয়েদের অধিক পর্দার জ্ঞান রাখতেন না? (নাউয়ুবিল্লাহ) তাই সেকথা হানাফী ফকীহদের বলতে হল!

তাই বলছি, ফুকাহায়ে কিরাম যেহেতু হাদীসে সবজাভা নন সেহেতু তাদের কোন ফাতওয়া অজ্ঞতাবশতঃ হাদীস বিরোধী হলেও তা মানতে হবে কি? আল্লাহ তাদের উপর রহম করুন এবং আমাদেরকে রাসূলের হাদীস মোতাবেক আমল করার তাওফীক দিন- আমীন!

## নামাযে সুফল না পাবার কারণাবলী

নামাযের গুণ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, নিশ্চয় নামায অশ্লীল কথা এবং আপত্তিকর কাজ থেকে বিরত রাখে- (সূরা ‘আনকাবূত ৪৫ আয়াত)। এ আয়াতটির ব্যাপারে এক প্রশ্নের উত্তরে নাবী ﷺ বলেন, যার নামায তাকে অশ্লীল এবং আপত্তিকর কথা ও কাজ থেকে বিরত রাখে না তার নামাযই হয় না- (ইবনে আবী হাতিম, তাফসীর ইবনে কাসীর ৩য় খণ্ড ৪১৫ পৃঃ)।

অন্য একটি হাদীসে রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি নামায পড়ে অথচ তার নামায তাকে ভাল কাজের নির্দেশ দেয় না এবং মন্দ ও জঘন্য বিষয় থেকে তাকে বিরত রাখেনা ঐ নামায দ্বারা সে আল্লাহ থেকে দূরেই সরে যেতে থাকে।

(বায়হাকীর শুআবুল ইমান, কানযুল উম্মাল ৭ম খণ্ড ৩৭৩ পৃঃ)



বর্তমান যুগে সারা পৃথিবীর মুসলমান সংখ্যা একশো কোটিরও বেশী। এদের মধ্যে ৩৫ কোটি নামাযী পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ। তারপর যারা নামায পড়েন তাদের মধ্যে শতকরা ৮০ ভাগ নামাযীর উপরে নামাযের ঐ প্রভাব পড়তে দেখা যায় না, যা উপরের আয়াতটিতে বর্ণনা করা হয়েছে তাহলে কি আল্লাহর দাবী তুল [নাউযবিলাহ], না আজকের নামাযীদের নামাযই ঠিক হচ্ছে না?

এ বিষয়টি নিয়ে একটু মাথা ঘামালে দেখা যাবে যে, আজকের যুগের অধিকাংশ নামাযীর নামায ঠিক হয় না। যার কারণে ওর ফল দেখতে পাওয়া যায় না। ইমাম আহমাদ, ইবনে হাম্বল (রহঃ) একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন, নাবী ﷺ বলেন, লোকদের উপর একটি যুগ আসবে যখন তারা বাহ্যতঃ নামায পড়বে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা নামায পড়বে না। (কিতাবুস সলাত ওয়ামা-য়ালখামু ফীহা ৫ ম পৃঃ)

এর একটা কারণ এ হতে পারে যে, তারা রুকু ও সিজদা ঠিকমত পালন করবে না এবং কিরাআতও শুদ্ধ পড়বে না। বরং চুবচাব করে রুকু ও সিজদা দিয়ে কোন রকম দায়সারা নামায শেষ করে পালাবে- যেমন প্রায় জুমু'আর দিন দেখা যায়। একটি হাদীসেও রয়েছে যে, একজন লোক ষাট বছর নামায পড়বে। অথচ তার নামায হবে না। কেউ জিজ্ঞেস করলো, তা কেমন করে? তিনি (ﷺ) বললেন, সে রুকু পুরো করে তো সিজদা পুরো করে না এবং সিজদা ঠিক দেয় তো রুকু ঠিক দেয় না। অন্য এক হাদীসে আছে যে, একদা বিখ্যাত সাহাবী হুযায়ফা ঐরূপ নামাযে রুকু-সিজদা পুরো না-কারী একজন মুসল্লীকে জিজ্ঞেস করেন, তুমি এ রূপ নামায কয় বছর ধরে পড়ছ? সে বলল, চল্লিশ বছর। হুযায়ফা বললেন, তাহলে তুমি নামাযই পড়নি। অতএব তুমি যদি ঐ অবস্থায় মরতে তাহলে ইসলামী প্রকৃতির বিপরীত প্রকৃতিতে নিশ্চয়ই মরতে। (ঐ- ৩৩ পৃঃ)

সুতরাং মুরগীর কুড়ো খাওয়ার মত নামায পড়লে নামাযের সুফল পাওয়া যাবে না। তাই ধীরে সুস্থে ও ভীত-বিনয়চিত্তে (খুশ-খুশ সহকারে) নামায পড়তে হবে। এ খুশ বা ভীতচিত্তের গুরুত্ব সম্পর্কে বিখ্যাত তাবিয়ী বিদ্বান ইমাম সুফয়ান সগরী (রহঃ) বলেন, যে ব্যক্তি নামাযে খুশ করে না এবং আল্লাহর ভয়ে ভীত হয় না তার নামায নষ্ট হয়ে যায় এ ব্যাপারে হাসান বাসরী বলেন, যে নামাযে মন হাযির থাকে না তা পুণ্যের তুলনায় শাস্তিকেই দ্রুত টেনে আনে। (আত্‌তা'লিকুস সাবীহ ১ম খণ্ড ২৬৬ পৃঃ)

এবার খুত্তর কয়েকটি উদাহরণ দিচ্ছি। যদ্বারা আপনারা বুঝতে পারবেন যে, খুত্ত বা মনে ভীতি কেমন হয়। ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল বলেন, হাদীসে এসেছে, বিখ্যাত তাবিয়ী ইবনে সীরীন যখন নামাযে দাঁড়াতেন তখন আল্লাহর ভয়ে তাঁর চেহারার খুন শুকিয়ে যেত— (কিতাবুস সলাত ওয়ামা-য়্যালযামু ফীহা ২০ পৃঃ)। ‘আমির ইবনে ‘আব্দ কায়স বলেন, নামায না পড়া অবস্থায় দুনিয়াবী চিন্তা করার চেয়ে গর্দানে খঞ্জর মারাকে আমি বেশী পছন্দ করি। সাঈদ ইবনে মু‘আয বলেন, আমি জীবনে এমন কোন নামায পড়িনি, যাতে আমি সালাম ফেরা পর্যন্ত দুনিয়াদারীর কোন চিন্তা করি— (ঐ- ২১ ঐ)।

আবু বাকর (রাঃ)-এর নাতি ‘আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়র (রহঃ)-এর খুত্ত সম্পর্কে মুজাহিদ তাবেয়ী বলেন, ইবনে যুবায়র যখন নামাযে দাঁড়াতেন তখন খুত্তর কারণে তাকে একটি কাঠ মনে হত। ইয়াহইয়া ইবনে আসসাব বলেন, ইবনে যুবায়র যখন সিজদা দিতেন তখন চড়ুই পাখীরা তাঁর পিঠে নেমে আসতো এবং তারা মনে করতো যে, এটা কোন দেয়ালের খুঁটি। (সিফাতুস সফওয়াহ ১ম খণ্ড ৩২২ পৃঃ)

একদা নামায পড়া অবস্থায় ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে নাসর মারআযীর কপালে একটি বোলতা কামড়ে খুন বের করে দেয়। তথাপি তিনি একটু নড়াচড়া করেননি— (তায়কিরাতুল হুফযায ২য় খণ্ড ৬৫২ পৃঃ, সিফাতুস সফওয়াহ ৪র্থ খণ্ড ১২২ পৃঃ)। সুতরাং খুত্ত ও খুয়ু সহকারে নামায না পড়া সুফল না পাবার আর একটি কারণ।

পরিসংখ্যান নিলে দেখা যাবে যে, এ উপমহাদেশের শতকরা প্রায় নব্বইটা নামাযী না বুঝে নামায পড়ে। তাই তাদের অধিকাংশই নামাযের স্বাদ পায় না। ফলে নামাযে তাদের মন বসে না এবং খুত্তর ভাব ফুটে উঠে না। অথচ না বুঝে পড়লে কী ক্ষতি হয় তাও রসূলুল্লাহ ﷺ-এর মুখ থেকে শুনুন। তিনি (ﷺ) বলেন, আল্লাহর বান্দা তার নামাযের অতটুকু অংশ পাবে যতটা সে ওর মধ্যে বুঝে থাকে। (ইহইয়া-উল উলুম, মিসফাতুস সাআ-দাহ, নামায কি হাকীকাত ৮০ পৃঃ)

এ হাদীসটি অন্য শব্দে এভাবে বর্ণিত হয়েছে, “তুমি তোমার নামাযের মধ্যে অতটুকু পাবে যতটুকু তুমি বুঝে পড়বে।” এর ব্যাখ্যায় হাফিয ইবনুল কাইয়িম বলেন, কোন নামাযী তার নামাযের যে অংশটা বুঝে পড়বে সে কেবল ঐ অংশ অনুযায়ী প্রতিফল পাবে। যদিও এর দ্বারা তার নামায পড়ার দায়িত্ব পালন হয়ে যাবে। (আস-সলাতু ওয়াআহকামু তারিকিহা)

উক্ত বর্ণনাগুলো প্রমাণ করে যে, সাধ্যমত বুঝে সুঝে নামায পড়তে হবে। সেজন্য নামাযের নিয়ম কানুন ভাল করে শিখতে হবে এবং সূরা ও দু'আগুলোর অর্থও জানার চেষ্টা করতে হবে। অতএব অর্থ না বুঝে নামায পড়া গুর সুফল না পাবার আরো একটি কারণ।

মাওলানা মুহাম্মাদ মানসুর নু'মানী বলেন, আমি কোন বুযুর্গ (মহান) ব্যক্তির মুখে শুনেছি যে, শাহ রফিউদ্দিন (রহঃ) তাঁর কোন পুস্তিকায় লিখেছেন কুরআন মাজীদে বিভিন্নভাবে স্পষ্ট ও ইঙ্গিতে প্রায় সাতশো জায়গায় নামাযের উল্লেখ আছে— (নামায কি হাকীকাত ১৯ পৃঃ ১ নং টীকা)। অতএব এ নামায পরিচালক ইমামও যেন যোগ্য ব্যক্তি হন। একটি হাদীসে এসেছে কোন জাতির ইমামতী যখন এমন একজন করে যার পেছনে তার চেয়ে উত্তম ব্যক্তি থাকে তাহলে তারা সর্বদাই অবনতির মধ্যে থাকবে— (কিতাবুস সলাত ওয়ামা-য়্যালযামু ফীহা ১৩ পৃঃ)।

এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কুরআন ও হাদীসের মাসআলা না জানা ইমামও নামাযের প্রত্যাশিত ফল না পাবার একটি কারণ।

প্রায়ই দেখা যায় যে, যারা নামায পড়েন-তাদের অধিকাংশই নিজেকে আল্লাহর প্রিয় মনে করেন এবং বেনামাযীদেরকে অমানুষ জ্ঞান করেন। এটাও কিছু আপত্তিকর কাজ এবং এর ক্ষতিও দারুন। যেমন একটি হাদীসে এসেছে যে, ইব্রাহীম খলীলুল্লাহ ('আঃ) একদা সারা রাত ইবাদত করে সকালে বলেন, ইব্রাহীমের প্রভু কী উত্তম প্রভু! এবং ইব্রাহীম কী উত্তম বান্দা! অতঃপর তারপরের দিনে তাঁর কাছে কোন ব্যক্তি এলো না যিনি তাঁর সাথে আহ্বার করবেন। কারণ, তিনি অন্য কোন একজনকে সঙ্গে নিয়ে খেতে ভালবাসতেন। তাই তিনি তাঁর খাবারটা বের করে পথে নিয়ে গেলেন, যাতে কোন পথিককে সঙ্গে নিয়ে খেতে পারেন।

অতঃপর দু'টি ফেরেশতা আসমান থেকে নেমে তাঁর দিকে ধাবিত হল। তাই তিনি তাদেরকে খাবার দা'ওয়াত দিয়ে বললেন, ঐ বাগানটির দিকে চলুন। কারণ, ওখানে একটি ঝরণা আছে, যাতে পানিও আছে। ফলে ওখানে আমাদের খাওয়া হবে। অতঃপর তারা বাগানে গেলেন কিন্তু ঝরণাটি শুকনো পেলেন। ফলে ইব্রাহীম খুবই লজ্জিত হলেন। তাই ফেরেশতা দু'জন বললেন, হে ইব্রাহীম! আপনি আপনার প্রভুর কাছে দু'আ করুন এবং ঝরণাটিকে পানি ফেরত দেবার প্রার্থনা করুন। তাই তিনি আল্লাহর কাছে দু'আ করলেন, কিন্তু বিফল হলেন। অতঃপর তিনি বললেন, আপনারা দু'জন আল্লাহর কাছে দু'আ করুন। একজন

দু'আ করল। ফলে ঝরণাটি পানিতে ভরে গেল। তারপর দ্বিতীয়জন দু'আ করল। ফলে ঝরণাটি বইতে লাগল।

অতঃপর তারা খবর দিল যে, তারা দু'জনই ফেরেশতা এবং একরাত ইবাদত করে তাঁর (অর্থাৎ ইব্রাহীম) খুশী হবার কারণে তাঁর দু'আ কবুল না করে ফেরত দেয়া হয়েছে। (কিতাবুস সলাত্ অমা ম্যালযামু ফীহা ১৯ ও ২০ পৃঃ)

এ হাদীস প্রমাণ করে যে, আল্লাহর ইবাদত করে গর্বিত হওয়া আপত্তিকর কাজ। তাই নামায পড়ে আত্মগর্ব করা নামাযের সুফল না পাবার একটি বিশেষ কারণ। সুতরাং কোন নামাযী যেন আত্মগর্বী না হন, বরং বিনয়ী ও নম্র হন। আল্লাহ আমাদের নামাযের সুফল পাবার তাওফীক দিন- আমীন।

### কতিপয় আয়াতের জওয়াব

বিভিন্ন হাদীস দ্বারা জানা যায় যে, কুরআনে কতিপয় আয়াতের জওয়াব স্বরূপ কিছু শব্দ বলা সুন্নাত।

[১] যেমন সাহাবী মু'আয ইবনে জাবাল যখন সূরা বাকারাহ শেষ করতেন তখন-

فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ \*

[ফানসুরনা- 'আলাল কাওমিল কা-ফিরীন] পড়ার পর বলতেন- আমীন- (ইবনে জারীর, ইবনে কাসীর ১ম খণ্ড ৩৪৪ পৃঃ)। সাহাবায়ি কিরামের একদল থেকে বর্ণিত আছে যে, জিবরাঈল ('আঃ) নাবী ﷺ-কে সূরা বাকারাহ শেষে 'আমীন' বলার তালকীন করেছিলেন- (ফাতহুল বায়ান ১ম খণ্ড ৩৭৯ পৃঃ)।

[২] জাবের [রাঃ] বলেন, একদা রসূল ﷺ সাহাবাদের কাছে সূরা রহমান পড়লে তারা চুপ থাকায় তিনি ﷺ বললেন, আমি এ সূরাটি জিন্নদের কাছে পড়েছিলাম। তারা তোমাদের তুলনায় কী সুন্দর জওয়াব দিয়েছিল। আমি যখনই

﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ [ফাবিআইয়ি আ-লায়ি রব্বিকুমা- তুকায্যিবা-না]

আয়াতটি পড়ছিলাম তখন তারা বলছিল :

لَا يَشِينِي مِّنْ نِّعَمِكَ رَبَّنَا نَكَذَّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ.

[লা- বিশাইয়িম মিন নি'আমিকা রব্বানা নুকায্যিবু ফালাকাল হাম্দ]

অর্থাৎ, হে আমাদের প্রভু! আমরা তোমার কোন সম্পদকেই অস্বীকার করছি না। (তিরমিযী, মিশকাত ৮১ পৃঃ)

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি নিম্নের আয়াতগুলো পড়বে সে যেন নিম্নের জওয়াবগুলো দেয়। (আবু দাউদ, তিরমিযী, মিশকাত ৮১ পৃঃ)

[৩] সূরা তীনের শেষে : ۞ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمَ الْحَاكِمِينَ ۞

[আলাইসাল্লা-হু বিআহুকামিল হাকিমীন] (আল্লাহ কি সর্বোত্তম বিচারক নন?)

بَلَىٰ وَأَنَا عَلَىٰ ذَٰلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ.

[বালা- ওয়াআনা- 'আলা- যা-লিকা মিনাশ্ শা-হিদ্দীন]

(হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। আর আমি এর একজন সাক্ষী।)

[৪] সূরা কিয়ামার শেষে : ۞ أَلَيْسَ ذَٰلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يُخَيِّبَ الْمُتَوْتَىٰ ۞

[আলাইসা যা-লিকা বিকা-দিরিন আলা- আইইউহুয়ি ইয়াল মাওতা] (আল্লাহ কি এ ব্যাপারে সমর্থ নন যে, তিনি মৃতকে জ্বান্তু করতে পারেন?) পড়লে বলবে-

بَلَىٰ [বালা] অর্থাৎ হ্যাঁ।

[৫] সূরা মোরসালাতের শেষে- ۞ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ ۞

[ফাবি আইয়ি হাদীসিম বা'দাহ্ ইউ'মিনূন] পড়লে বলবে-

أَمَّا بِاللَّهِ [আ-মান্না- বিল্লা-হ]

[৬] ইবনে 'আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত নাবী ﷺ যখনই পড়তেন-

سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَىٰ ۞

[সাক্বিহিসমা রাক্বিকাল আ'লা] (তুমি তোমার সমুন্নত প্রভুর পবিত্রতা বর্ণনা কর।) তখনই বলতেন. سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَىٰ [সুবহানা রক্বিয়াল আ'লা] আমি আমার সমুন্নত প্রভুর পবিত্রতা বর্ণনা করছি- (আবু দাউদ, মিশকাত ৮১ পৃঃ)। অন্য হাদীসে আছে যে, সর্বপ্রথম “সুবহা-না রক্বিয়াল আ'লা” বলেন মীকাঈল (আঃ)- (তাকসীরে কাশ্শাফ ৪র্থ খণ্ড ২০৫ পৃঃ)।

[৭] সূরা গা-শিয়ার শেষ আয়াত : ۞ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ ۞ [সুন্না ইন্না 'আলাইনা হিসা-বাহম] (আল্লাহ বলেন, তারপরও আমার দায়িত্ব তাদের হিসাব নেয়া।) এর পর বলা হয়- আল্লাহুয়া হাসিবনা হিসা-বাই ইয়াসীরা- (মুসনাদে আহমাদ ৮ম খণ্ড ৭৩ পৃঃ বৈরুত ছাপা ১৯৯৩ ইং)। এর প্রমাণে বাংলাদেশের মাওঃ ইবনে ফযল (রাঃ) ‘তাকসীরে ইবনে কাসীরের’ বরাত দিয়েছেন। কিন্তু আমি ইবনে কাসীরে সূরা গা-শিয়ার তাকসীরে ওর প্রমাণ কোথাও খুঁজে পেলাম না।

[৮] আল্লামা জালালুদ্দীন মাহাদী বলেন : হাদীসে এসেছে, সূরা মুল্কের শেষ আয়াত ۞ **فَمَنْ يَأْتِيَكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ** [ফামাই ইয়া'তীকুম বিমা-য়িম মা'ঈন]

এর শেষে পাঠকের এ শব্দগুলো বলা উত্তম- **اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ**

[আল্লাহ্ রব্বুল 'আ-লামীন] (তাফসীরে জালালাইন ৪৮ পৃঃ)

এ জওয়াবটাতে নওয়াব সিদ্দীক হাসান খান (রহঃ) উক্ত আল্লামা মাহাদীর বরাত দিয়ে আল্লাহ এবং রব্বুল 'আলামীনের মাঝে 'ইয়াতীনা ওয়াহওয়া' দু'টি শব্দ বাড়তি লিখেছেন- (তরজুমানুল কুরআন বিলাতায়িফিল বায়ান সূরা মুল্ক ১৪ পৃঃ)। এ বাড়তির রহস্য কী? তা বুঝতে পারলাম না। কারণ জালালাইনের আল্লামা মাহাদীর তাফসীরে ঐ বাড়তি শব্দ দু'টি আমি খুঁজে পেলাম না।

তেমনি ঐ বাড়তি শব্দসহ পূর্ণাঙ্গ জওয়াবটার প্রমাণে বাংলাদেশের মাওলানা ইবনে ফযল সাহেব কোন হাদীসের বরাত ছাড়া তাফসীরে মুযিহুল কুরআন-এর হাওয়ালা দিয়েছেন। আমার কাছে এবং আশেপাশে কোন লাইব্রেরীতে 'মুযিহুল কুরআন' নেই বলে প্রমাণটা আমি যাচাই করতে পারলাম না এবং সূরা গাশিয়ার শেষ আয়াতের জওয়াবে তাঁর বরাত ইবনে কাসীরে খুঁজে না পাওয়ায় তাঁর এ 'হাদীস বিহীন' হাওয়ালার উপরে আমি আস্থা রাখতে পারছি না।

টীকা : (ক) হে আল্লাহ! আমাদের হিসাবটা সহজে নিও। (খ) (তোমাদের পানি যদি শুকিয়ে যায়) তাহলে তোমাদের কাছে সুস্বাদু পানি কে আনবে? (গ) বিশ্বপালক আল্লাহ তা আনবেন।

[৯] সূরা ওয়া-কিয়ার শেষ আয়াত এবং ৭৪ নং আয়াত

**فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ** [ফাসাব্বিহ্ বিসমি রব্বিকাল 'আযীম]

এর জওয়াবে অনেকে বলেন, "সুবহা-না রব্বিয়াল 'আযীম" অর্থাৎ আমি আমার মহান প্রভুর পবিত্রতা বর্ণনা করছি। এ জওয়াবের বরাত হাদীস থেকে কোন প্রমাণ আমি পাইনি। মাওলানা আকরাম খাঁ (রহঃ) বলেন, ঐ আয়াতটির আগে যে সব প্রশ্ন করা হয়েছে তাঁর জওয়াবে উক্ত জওয়াবী বাক্যটি আপনা আপনি বেরিয়ে আসে। সুতরাং এ জওয়াবটা মনে হয় বিবেক প্রসূত, যা যুক্তি সঙ্গতও বটে।

[১০] সূরা জুমু'আর শেষ আয়াত- **وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ \*** [ওয়াল্লাহু-হু খায়রুন্ রায়িকীন] এরপর অনেকে এ বাক্যটি বলেন, আল্লা-হুম্মারযুকনা রিয়কান হাসানা। এরও কোন প্রমাণ আমি হাদীস-তাফসীর থেকে পাইনি।

টীকা : (ক) তুমি তোমার মহান প্রভুর নামে পবিত্রতা বর্ণনা কর। (খ) হে আল্লাহ! আমাদেরকে উত্তম জীবিকা দান কর।

## নামাযের মধ্যেও আয়াতের জওয়াব দেয়া সুন্নাত

উক্ত আয়াতগুলো কেউ যদি নামাযে পড়ে তাহলে সে নামাযের মধ্যে ঐ জওয়াবগুলো দেবে কিনা এ ব্যাপারে হানাফী মাওঃ বলেন, নামাযের বাইরে জওয়াব দেয়া জাযিয়, ভেতরে নয়— (মিশকাত ১ম খণ্ড ৫৩৬ পৃঃ)। তাদের এ ফাতওয়া কয়্যাসী ও বিবেকপ্রসূত। এ মতের সমর্থনে তাদের কাছে কোন হাদীস নেই।

কিন্তু শাফিয়ীরা বলেন, নামায হোক কিংবা বাইরে যখনই কেউ কোন ইহমতের আয়াত পড়বে তখন তার উচিত আল্লাহর রহমতের প্রার্থনা করা, আযাবের আয়াত হলে তা থেকে আশ্রয় কামনা করা, তাসবীহের আয়াতে তসবীহ গড়া এবং প্রশ্নের আয়াত হলে জওয়াব দেয়া। যেমন সূরা ত্বীন ও সূরা মুরসালাতের শেষে “বালা ওয়াআনা ‘আলা- যা-লিকা মিনাশ্ শাহিদীন” ও “আমাল্লা বিল্লাহ” বলা। ইমাম ও মুক্তাদী উভয়েই এরূপ করবে। (রওয়াতুত তালিবীন ১ম খণ্ড ২৪৯)

একটি হাদীসে বর্ণিত আছে যে, একদা ‘আলী (রাঃ) নামাযের মধ্যে সাব্বিহিসমা রব্বিকাল আ‘লা’ আয়াতটি পড়ার পর ‘সুবহানা রব্বিয়াল আ‘লা’ বললেন। তখন কেউ কেউ বললো, আপনি কি কুরআনকে বাড়িয়ে দিলেন? তিনি বললেন, না। বরং আমাদেরকে যে হুকুম দেয়া হয়েছে আমি তাই বললাম। বায়হাকীতে আছে, আবু মূসা আশ‘আরী জুমু‘আর নামাযে ও ‘আলী (রাঃ) ফজরের নামাযে এবং ইবনে ‘উমর (রাঃ) প্রমুখ ‘সাব্বিহিসমা রব্বিকাল আ‘লা’ পড়ার পর ‘সুবহানা রব্বিয়াল আ‘লা’ বলেন। (মিরআত ২য় খণ্ড ১৯৭৪ সংস্করণ বেনারস ছাপা, হাকিম ২য় খণ্ড ৫২১ পৃঃ)

আল্লামা রহমানী বলেন, উক্ত হাদীসগুলো প্রমাণ করে যে, যে কেউ ঐ আয়াত পড়বে এবং শুনে সেই জওয়াব দেবে। যাতে আল্লাহর হুকুম তামীল হয়।

(মিরআত ২য় খণ্ড, ঐ)

ভারতের বিখ্যাত হানাফী আলিম মাওলানা আব্দুল হক হাক্কানী (রহঃ) বলেন, ঐ জওয়াবী বাক্যগুলো হানাফী মতে নামাযে মনে মনে বলতে হবে এবং নামাযের বাইরে উচ্চৈঃস্বরে বলতে হবে কিন্তু অন্যান্য ইমামদের মতে নামাযের ভেতরে ও বাইরে একই হুকুম— (তাফসীরে হাক্কানী, আমপারা ১৮৩ পৃঃ)। তাই আহলে হাদীসদেরও মতে উচ্চৈঃস্বরে বলা যাবে।

## কতিপয় মাহাত্ম্যপূর্ণ সূরা ও তার অনুবাদ

এ বইয়ের ২০৭ পৃষ্ঠায় একটি হাদীস নোট করা হয়েছে যে, 'তুমি তোমার নামাযের মধ্যে অতটুকু পাবে যতটুকু তুমি বুঝে পড়বে।' (ইহুইয়াউল উলূম, নামায কী হাকীকাত ৮০ পৃঃ)

সূতরাং নামাযে যা যা পড়া হয় তার অর্থ জানা প্রত্যেক নামাযীর একান্ত উচিত। ইতোপূর্বে বিভিন্ন দু'আ দরুদে অর্থ দেয়া হয়েছে। কিন্তু সূরা ফাতিহা ছাড়া আর কোন সূরার অর্থ দেয়া হয়নি। তাই এখানে আটটি মাহাত্ম্যপূর্ণ সূরা এবং তার বাংলা উচ্চারণ ও তর্জমা দেয়া হল। যাতে মুসল্লীগণ ঐ সূরাগুলো পড়ে তৃপ্তি পান।

**সূরা না-স :** بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
 قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ \* مَلِكِ النَّاسِ \* إِلَهِ النَّاسِ \* مِنْ شَرِّ  
 الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ \* الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ \* مِنَ الْجِنَّةِ  
 وَالنَّاسِ \*

উচ্চারণ : ১। কুল আ'উযুবিরব্বিন্না-স। ২। মালিকিন্না-স। ৩। ইলা-হিন্না-স। ৪। মিন শাররিল ওয়াসওয়া-সিল খান্না-স। ৫। আল্লাযী ইওয়াস্বিসু ফী সুদূরিন্না-স। ৬। মিনাল জিন্নাতী ওয়ান্না-স।

তরজমা : তুমি বল, আমি মানুষের রব্বের (প্রতিপালকের) ২। মানুষের মালিকের ৩। মানুষের উপাস্যের আশ্রয় প্রার্থনা করছি ৪। সেই লুকায়িত কুমন্ত্রণা দানকারীর দূষ্টি থেকে ৫। যে মানুষের অন্তরসমূহে কুমন্ত্রণা দান করে ৬। জিন ও ইনসানের মধ্য হতে।

**সূরা ফালাক :** بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
 قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ \* مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ \* وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ \*  
 \* وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثِ فِي الْعُقَدِ \* وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ \*

উচ্চারণ : ১। কুল আ'উযুবিরব্বিল ফালাক। ২। মিন শাররি মা খালাক। ৩। ওয়ামিন শাররি গা-সিকিন ইযা- ওয়াক্বাব। ৪। ওয়ামিন শাররিন্ নাফফা-সা-তি ফিল উক্বাদ। ৫। ওয়ামিন শাররি হা-সিদিন ইযা- হাসাদ।

তরজমা : ১। তুমি বল, আমি ভোরের প্রতিপালকের আশ্রয় চাচ্ছি। ২। সেই সমস্ত জিনিসের অনিষ্ট থেকে যা তিনি সৃষ্টি করেছেন। ৩। এবং অন্ধকারের অনিষ্ট



থেকে যখন তা (বিশ্বচরকে) ঢেকে নেয়। ৪। আর গিরাসমূহে ফুক দানকারিণীদের দৃষ্টি থেকে। ৫। হিংসুক ব্যক্তির ক্ষতি থেকে যখন সে হিংসা করতে থাকে।

**সূরা ইখলাস :** بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ  
قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۝ اللّٰهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۝ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ  
كُفُوًا اَحَدٌ ۝

উচ্চারণ : ১। কুল হু আল্লাহু আহাদ। ২। আল্লা-হুস সামাদ ৩। লাম্ ইয়ালিদ ৪। ওয়ালাম ইউলাদ। ৫। ওয়ালাম ইয়াকুল লাহু কুফুওয়ান আহাদ।

তরজমা : ১। তুমি বলে দাও- সেই আল্লাহ একক ২। যে আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষী নন অথচ সবাই তাঁরই মুখাপেক্ষী ৩। তিনি (কাউকে) জন্ম দেননি এবং (কারো দ্বারা) তিনি জন্মলাভও করেননি ৪। আর তার সমকক্ষ কেউই নেই।

উক্ত তিনটি সূরার মাহাত্ম্য সম্পর্কে রসূলুল্লাহ ﷺ 'আব্দুল্লাহ ইবনে খুয়ায়বকে বলেন। তুমি 'কুলহু আল্লাহ আহাদ এবং মুআওযিয়াতায়ন অর্থাৎ সূরা নাস ও সূরা ফালাক সকাল ও সন্ধ্যায় তিনবার করে পড় তাহলে ঐ পড়াটা তোমাকে প্রত্যেক জিনিসের অনিষ্ট থেকে বাঁচিয়ে নেবে। (তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসায়ী, মিশকাত ১৮৮ পৃঃ)

**সূরা নাসর :** بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ  
اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ ۝ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِیْ دِیْنِ اللّٰهِ  
اَفْوَاجًا ۝ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ اِنَّهٗ كَانَ تَوَّابًا ۝

উচ্চারণ : ১। ইয়া-যা-আ নাসরুল্লা-হি ওয়ালফাত্হ। ২। ওয়ারাআইতান্ না-সা ইয়াদখুলুনা ফী দীনিল্লা-হি আফুওয়াজা। ৩। ফাসাব্বিহ বিহামদি রব্বিকা ওয়াস্তাগফিরহু ইন্নাহু কা-না তাউওয়াবা।

তরজমা : ১। যখন আল্লাহর (তরফ থেকে) সাহায্য ও জয় এসে যাবে ২। এবং তুমি দেখে নেবে যে, লোকেরা দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে ঢুকছে ৩। তখন তুমি তোমার প্রতিপালকের প্রশংসা সহকারে পবিত্রতা বর্ণনা করতে থাকবে এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনাও করবে। নিঃসন্দেহে তিনি তাওবা কবুলকারী (অনুশোচনা গ্রহণকারী)।

এ সূরাটি কুরআনের চার ভাগের এক ভাগের সমান। (তরজুমানুল কুরআন বিলাতা-য়িফিল বায়ান আমপারা ৩৬০ পৃঃ, তাফসীরে আইনী, আমপারা প্রথমার্ধ ৬৫ পৃঃ)

সূরা কা-ফিরুন : بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ  
 قُلْ یٰۤاَیُّهَا الْکٰفِرُوْنَ ۖ لَا اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ ۚ وَلَا اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَا اَعْبُدُ  
 ۚ وَلَا اَنَا عٰبِدُ مَا عٰبَدْتُمْ ۚ وَلَا اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَا اَعْبُدُ ۚ لَكُمْ دِیْنُكُمْ وَلِیَّ  
 دِیْنِ ۚ

উচ্চারণ : ১। কুল ইয়া আইয়্যাহাল কা-ফিরুন। ২। লা- আ'বুদু মা-  
 তা'বুদুন। ৩। ওয়ালা- আত্তুম 'আ-বিদুনা মা- আ'বুদ। ৪। ওয়ালা- আনা  
 আ'-বিদুম মা- 'আবাদতুম। ৫। ওয়ালা আত্তুম 'আ-বিদুনা মা- আ'বুদ। ৬। লাকুম  
 দীনুকুম ওয়ালিয়া দীন।

তরজমা : ১। (হে মুহাম্মাদ!) তুমি বলে দাও- ওহে সত্য প্রত্যাখ্যানকারী  
 কাফিরগণ! ২। আমি তার 'ইবাদত করি না তোমরা যার পূজা কর ৩। আর  
 তোমরাও তাঁর পূজারী নও আমি যার 'ইবাদত করি। ৪। এবং আমি তার  
 'ইবাদতকারী হব না তোমরা যার পূজা করে আসছ ৫। আর তোমরাও তার পূজারী  
 হবে না আমি যাকে 'ইবাদত করছি ৬। (অতএব) তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্ম  
 এবং আমার জন্য আমার দীন (ভাল)।

একটি হাদীসে রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, সূরা ইয়া-যুলযিলাত কুরআনের  
 অর্ধেকের সমান এবং সূরা কুলহু আল্লা-হু আহাদ কুরআনের তিন ভাগের এক  
 ভাগের সমান আর সূরা কুল ইয়া আই যুহাল কা-ফিরুন কুরআনের চারভাগের এক  
 ভাগের সমান। (তিরমিযী, মিশকাত ১৮৮ পৃঃ)

অন্য বর্ণনায় তিনি (ﷺ) বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর দু'টি সূরার সাথে সাক্ষাৎ  
 করে তার উপর কোন হিসাব নেই। তা হল সূরা কা-ফিরুন এবং কুলহু আল্লাহু  
 আহাদ। (ইবনে মারদুআহে, তরজুমানুল কুরআন বিলাত-য়িফিল বায়া-ন, আমপারা  
 ৩৫৬ পৃঃ, তাফসীরে আইনী, আমপারা প্রথমার্ধ ৭১ পৃঃ)

সূরা কাওসার : بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ  
 اِنَّا اَعْطَيْنٰكَ الْکَوْثَرَ ۚ فَصَلِّ لِرَبِّکَ وَانْحَرْ ۚ اِنَّ شَانِکَ هُوَ الْاٰبِتَرُ ۚ

উচ্চারণ : ১। ইন্না- আ'তাইনা- কাল কাওসার। ২। ফাসল্লি লিরব্বিকা  
 ওয়ান্‌হর। ৩। ইন্না- শা-নিআকা হুওয়াল আবতার।

তরজমা : ১। (হে মুহাম্মাদ!) আমি নিশ্চয়ই তোমাকে কাওসার (প্রচুর  
 কল্যাণ) দান করেছি। অতএব তুমি (ঐ মহাদানের কৃতজ্ঞতা স্বরূপ) তোমার

প্রতিপালকের উদ্দেশে নামায পড় এবং কুরবানী দাও। নিঃসন্দেহে তোমার দুশমনই লেজকাটা।

সূরা আসর : بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
وَالْعَصْرِ • إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ • إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا  
الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ •

উচ্চারণ : ১। ওয়াল'আসরি। ২। ইন্নালা ইনসা-না লাফী খুসরিন। ৩। ইল্লাল্লাযীনা আ-মানু ওয়া'আমিলুস স-লিহা-তি ওয়াতাওয়া-সও বিলহাক্কি ওয়াতাওয়া সও বিসুবরি।

তরজমা : ১। 'আসরের (কালপ্রবাহের) কসম ২। নিশ্চয়ই মানুষ ক্ষতির মধ্যে রয়েছে। কিন্তু যারা (আল্লাহকে) বিশ্বাস করে এবং ভাল কাজ করে, আর একে অপরকে সত্যের জন্য উপদেশ দান করে এবং (বিপদে আপদে) পরস্পরকে ধৈর্যধারণের পরামর্শ দান করে (তারা ঐ ক্ষতির মধ্যে নয়)।

সূরা তাকাসুর : بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
أَلْهَكُمُ التَّكَاثُرُ • حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ • كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ • ثُمَّ  
كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ • كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ • لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ •  
ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ • ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ •

উচ্চারণ : ১। আলহা-কুমু'ত তাকাসুর। ২। হাত্তা- যুরতুমুল মাকা-বির। ৩। কাল্লা- সাওফা তা'লামুন। ৪। সুম্মা কাল্লা- সাওফা তা'লামুন। ৫। কাল্লা- লাও তা'লামুনা ইলমাল ইয়াক্বীন। ৬। লাতারাউন্নালা জাহীম। ৭। সুম্মা লাতারাউন্নাহা 'আয়নাল ইয়াক্বীন। ৮। সুম্মা লাতুস আলুনা ইয়াওন্নাযিযিন 'আনি'না ন'ঈম।

তরজমা : ১। (সব জিনিস) বেশী বেশী পাবার আশা তোমাদেরকে (আল্লাহ থেকে) ভুলিয়ে রেখেছে। ২। যতক্ষণ না তোমরা কবরের সাক্ষাৎ কর। ৩। (দুনিয়াবী বিষয়ে এত মজে থাকা) কখনই উচিত নয়, খুব জলদি তোমরা (নিজেদের ভুল) জানতে পারবে। ৪। আবার বলছি কক্ষনো (এরূপ কর) না, অতি শীঘ্রই তোমরা (এর পরিমাণ) জানতে পারবে। ৫। কক্ষনো (গাফেল থাকতে) না, যদি তোমরা প্রকৃত ব্যাপারটি বিশ্বাস জ্ঞানে জানতে। ৬। নিশ্চয়ই তোমরা (এ উদাসীনতার কারণে) জাহীম দোযখ অবশ্যই দেখবে। ৭। পুনরায় (বলছি) তোমরা

তাকে বিশ্বাসের চোখে নিশ্চয়ই দেখবে। ৮। তারপর (আল্লাহর) অবদান সম্পর্কে তোমাদেরকে অবশ্যই প্রশ্ন করা হবে।

এ সূরার মাহাত্ম্য সম্পর্কে রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, ‘আল্লাহ-কুমুত্ তাকাসুর’ সূরা প্রত্যেক দিন পড়লে এক হাজার আয়াত পড়ার নেকী পাওয়া যায়। (বাইহাকীর শু‘আবুল ইমান, মিশকাত ১৯০ পৃঃ)

## পরিশিষ্ট

### নামাযের মধ্যে হাত কোথায় থাকবে?

দুই হাতের স্বাভাবিক অবস্থা দুই পাশে পড়ে থাকা। কিন্তু নামাযের মধ্যে তা স্বাভাবিক অবস্থা থেকে ব্যতিক্রম হয়ে অন্য অবস্থায় রূপান্তরিত হয়ে থাকে। যেমন নামায আরম্ভের সময় হাত দু’টি কাঁধ বা কান পর্যন্ত তুলতে হবে— (বুখারী, আবু দাউদ, মিশকাত ৭৫-৭৬ পৃঃ)। তারপর ডান হাতটা বাম গজ হাতের উপর রেখে— (বুখারী, আবু দাউদ, মিশকাত ৭৫-৭৬ পৃঃ)। তা সীনার উপরে বাঁধতে হবে— (সহীহ ইবনে খুযাইমা ১ম খণ্ড ২৪৩ পৃঃ)। এরপর কিরাআতের শেষে হাত দু’টো কান পর্যন্ত তুলতে হবে— (বুখারী ১০২ পৃঃ, মুসলিম ১৬৮ পৃঃ)।

তারপর রুকুতে গিয়ে হাত দু’টো হাঁটুতে রাখতে হবে— (বুখারী, মিশকাত ৭৫ পৃঃ)। অতঃপর রুকু হতে মাথা তুলে হাত দু’টোকে আবার কাঁধ পর্যন্ত তুলতে হবে— (বুখারী ১০২ পৃঃ, মুসলিম ১ম খণ্ড ১৬৮ পৃঃ)। এরপর হাত দু’টো তার জায়গায় ফিরে যাবে— (বুখারী, মিশকাত ৭৬ পৃঃ)। ওর ব্যাখ্যা পরে আসছে।

তারপর সিজদায় গিয়ে হাত দু’টোর কনুই উঁচু রেখে তালু দু’টো যমীনে বিছানো থাকবে— (ঐ, পৃঃ ঐ)। কাঁধ বা কান বরাবর— (আবু দাউদ, মিশকাত ৭৬ পৃঃ)। তারপর প্রথম সিজদা থেকে মাথা তুলে ডান হাতটা ডান হাঁটু বা উরুর উপরে এবং বাম হাতটা বাম হাঁটুর বা উরুর উপরে রাখতে হবে— (মুসলিম, মিশকাত ৭৬ পৃঃ)। তারপর দ্বিতীয় সিজদা দেবার সময় আবার হাত দু’টোকে প্রথম সিজদা দেবার মতই যমীনে রাখতে হবে— (আবু দাউদ, মিশকাত ৭৬ পৃঃ)। অতঃপর দ্বিতীয় সিজদা থেকে মাথা তুলে নামমাত্র বসে যমীনের পর দুই হাতের ভর দিয়ে উঠতে হবে— (বুখারী ১১৪ পৃঃ)।

উপরোক্ত বর্ণনা দ্বারা রুকুর পর দাঁড়ানো অবস্থায় হাতের অবস্থান কোথায় হবে ছাড়া বাকী অন্যান্য জায়গায় হাতের অবস্থান নামাযের মধ্যে কোথায় হবে তা পরিষ্কার প্রমাণিত। তাই ঐ একটি মাত্র জায়গা ছাড়া বাকী জায়গাগুলোতে হাতের

অবস্থান নিয়ে হাদীস-বিশারদদের মধ্যে কোন মতভেদ নেই। থাকলো রুক্কুর পরের কথা। এ ব্যাপারে আরব জাহানে বর্তমানে দু'রকম আমল প্রচলিত আছে। এক-রুক্কু থেকে মাথা তুলে আবার বুকে হাত বেঁধে কওমার দুআ পড়া। তারপর সিজদায় যাওয়া। এটা সউদী আরবের মরহুম মুফতিয়ে আযম আল্লামা 'আব্দুল আযীয ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে বায (রহঃ) সাহেবের অভিমত। (আইনা ইয়াযাউল মুসল্লী ইয়াদাইনী বা'দার রফয়ি মিনার রুক্কুয়ি, যিয়া-দাতুল খুশ ৪৭ পৃঃ)

দ্বিতীয় আমল হচ্ছে রুক্কুর পরে মাথা তুলে হাত ছেড়ে দিয়ে কওমার দুআ পড়া। এটা বিশিষ্ট মুহাদ্দিস আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী সাহেবের অভিমত।

(সিফাতুস সলাতিন্ নাবীই ১৯৯১ সংস্করণের ১৩৮ পৃঃ ৩ নং টীকা)

এবার রুক্কুর পর হাতের অবস্থান সম্পর্কে হাদীসগুলোর পর্যালোচনা করা যাক। বিখ্যাত সাহাবী আবু হুমাইদ আস্‌সায়িদী একদল লোকের মধ্যে নামায দেখতে গিয়ে রুক্কুর পরের বর্ণনায় বলেন, 'অতঃপর তিনি (ﷺ) যখন তাঁর মাথাটা তুললেন তখন তিনি সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। পরিশেষে তাঁর পিঠের প্রত্যেকটি হাড় তার জায়গায় ফিরে গেল। (বুখারী, মিশকাত ৭৫, বুল্‌গল মারাম-ম ১৯ পৃঃ রশীদিয়াহ দিল্লী ছাপা)

উক্ত হাদীসে একটি শব্দ আছে 'ফাকার' যার অর্থ পিঠের হাড়- (মিরআত ২য় খণ্ড ২৫১ পৃঃ বেনারস ছাপা)। শিরদাঁড়ার হাড়- (মিসবাহুল লুগাত ৬২৮ পৃঃ দিল্লী ছাপা ১৯৫৭ সংস্করণ)। সব হাড় নয়। তাই এ হাদীস দ্বারা এটা প্রমাণিত হয় না যে, হাতের হাড়গুলোও তার জায়গায় ফিরে যাবে। ফলে হাত ছেড়ে দিতে হবে।

রিফা-আহ ইবনে রা-ফির বর্ণিত হাদীসে নাবী (ﷺ) এক ব্যক্তিকে রুক্কুর পরের বর্ণনায় বলেন, অতঃপর যখন তুমি রুক্কু থেকে মাথা তুলবে তখন তোমার পিঠটাকে সোজা কর। পরিশেষে (পিঠের) হাড়গুলো যেন তার জোড়গুলোতে ফিরে যায়। (মিশকাত ৭৭ পৃঃ, আহমাদ ৫ম খণ্ড ৪৪ পৃঃ, ইবনে হিমান, বুল্‌গল মারাম ১৯ পৃঃ)

এ হাদীসের উক্ত শব্দে পিঠের উল্লেখের পর শুধু ইয়া-ম শব্দ নয়, বরং 'আলইয়াম' শব্দ আছে। যা পিঠের হাড়ের ভাবার্থ প্রমাণ করে, দুই হাতের হাড়ের ভাবার্থ প্রমাণ করে না। কারণ এখানে হাতের উল্লেখই নেই।

ইমাম ইবনে হায্ম একটি হাদীস রিফাআহ ইবনে রাফিঅ থেকে বর্ণনা করেছেন। তাতে রুক্কু থেকে ওঠার পর বর্ণনায় আছে 'সামি'আল্লাহ লিমান হামিদাহ' বলার পর সোজা দাঁড়াবে। পরিশেষে প্রত্যেক অঙ্গ যেন তার মাথায বা আসল জায়গা কিংবা ধরার জায়গাকে ধরে নেয়। (মুহাল্লা ৩য় খণ্ড ২৫৭ পৃঃ)

এ হাদীসের প্রত্যেক অঙ্গ শব্দটির মধ্যে দু'টি হাতও গণ্য। তাই প্রশ্ন উঠে যে, নামাযের মধ্যে হাত দু'টোকে ধরার জায়গা কোথায়? হুলবের বর্ণনায় আছে যে, নবী ﷺ তাঁর ডান হাত দ্বারা বাম হাতটিকে ধরতেন। (ইবনে মাজাহ ৯৫ পৃঃ, বাবু ওয়ায্বিল ইয়্যামীন আলাশ শিমাল ফিস সলাতি)

এ বর্ণনায় 'ধরার' আরবী শব্দ আছে 'ইয়াখুযু'। যার ধাতুগত শব্দ আখযু। এ আখয ধাতু থেকে উৎপন্ন হয়েছে মা'খায বা ধরার জায়গা। রুকুর আগে দাঁড়াবার সময় দুই হাতের ধরার জায়গা ছিল সীনার উপর। তাই রুকুর পরে হাত দু'টো তার ধরার জায়গা সীনার উপরে ধরাটাই প্রমাণ করে নাকি?

তেমনি আবু হুমাইদ (রাঃ)-এর বর্ণনায় রুকু ও সিজদার পর বর্ণিত আছে, 'প্রত্যেক হাড় যেন তার জায়গায় ফিরে যায়'। (আবু দাউদ, দারিমী, তিরমিযী, মিশকাত ৭৬পৃঃ)

এই বর্ণনায় জায়গার আরবী শব্দ এসেছে 'মাওযা'। যার ধাতুগত শব্দ অযউন। রুকু ও সিজদায় এবং সিজদার পর হাতের অবস্থা বর্ণনায় হাদীসে এই অযউন ধাতুটিই ব্যবহৃত হয়েছে- (আবু দাউদ, মিশকাত ৭৬ পৃঃ)। সুতরাং 'প্রত্যেক হাড় যেন তার জায়গায় ফিরে যায়' বাক্য দ্বারা রুকুর পর হাত দু'টো নামাযের বাইরে তার স্বাভাবিক জায়গা 'ছাড়া অবস্থায়' ফিরে যাবে, না নামাযের মধ্যে ওর আগের অবস্থান 'সীনার উপরে রাখার জায়গায়' তা ফিরে যাবে?

আবু হুমাইদ (রাঃ)-এর বর্ণনায় নামাযের শুরুতে তাকবীরে তাহরীমার জন্য হাত কাঁধ পর্যন্ত তোলার পর এবং রুকু থেকে উঠে দুই হাত কাঁধ পর্যন্ত তোলার পর বর্ণনায় শব্দ এসেছে 'হাত্তা য়্যাকিরা কুলু আযমিন ইলা-মাওযিয়হী অর্থাৎ প্রত্যেক হাড় যেন তার জায়গায় স্থিত হয়ে যায়। (ইবনে মাজাহ ৭৫ পৃঃ)

এ বর্ণনায় তাকবীরে তাহরীমার জন্য দুই হাত তোলার পর প্রত্যেক হাড় যেন তার জায়গায় স্থিত হয়ে যায় বাক্যের দ্বারা এটা কি প্রমাণিত হয় না যে, ১ম বারে হাত দু'টো কাঁধ পর্যন্ত তোলার পর কিছুক্ষণ ছেড়ে দিতে হবে-যতক্ষণ না হাতের হাড়গুলো তার জায়গায় স্থিত হয়ে যায় তারপরে তা সীনার উপরে বাঁধতে হবে? প্রকৃত ব্যাপার কি তাই মোটেই না। তাহলে ঐ একই বাক্যের উল্লেখ রুকুর পরে থাকায় রুকুর পরে হাত দু'টো কাঁধ পর্যন্ত তোলার পর তা পুনরায় তার বাঁধার জায়গা সীনার উপরে স্থিত না হয়ে ছেড়ে দেয়াটা প্রমাণিত হয় কি? যদি তা প্রমাণ করা হয় তাহলে তাকবীরে তাহরীমার পরেও হাত দু'টোকে সীনায় না বেঁধে ছেড়ে

দিতে হয় কিনা? কিন্তু তা তো হয় না। তাই উপরোক্ত দু'টি হাদীস দ্বারাও পরোক্ষভাবে প্রমাণিত হচ্ছে যে, রুকুর পরে হাত দুটো ছেড়ে না দিয়ে তার আগের জায়গায় রাখতে হবে অর্থাৎ পুনরায় তা বাঁধতে হবে। এবার আরো পরিষ্কার একটা হাদীসের প্রতি নিম্নে লক্ষ্য করুন।

প্রখ্যাত সাহাবী ওয়া-য়িল ইবনে হুজর (রাঃ) বলেন, আমি নাবী ﷺ কে দেখলাম, তিনি যখন তাকবীরে তাহরীমা দিলেন তখন হাত দু'টো তার দু'টি কান বরাবর তুললেন। তারপর যখন রুকু করলেন তখনও তিনি হাত দু'টো উঠালেন। তারপর যখন তিনি বললেন, 'সামি'আল্লাহ্ লিমান হামিদাহ' তখনও তিনি দু'টো হাত তুললেন। আর আমি তাঁকে নামাযের মধ্যে তাঁর ডান হাতটা তাঁর বাম হাতের উপরে ধরে রাখতে দেখেছি— (মুসনাদে আহমাদ ৫ম খণ্ড ৪১৬ পৃঃ বৈরুত ছাপা ১৯৯৩ সংস্করণ)

উক্ত হাদীস 'সামি'আল্লাহ্-লিমান হামিদাহ' বলার পর নাবীজীর বাম হাতের উপর ডান হাত ধরে রাখার উল্লেখ পরিষ্কার রয়েছে। তেমনি ওয়ায়িলের অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখেছি যে, যখনই তিনি নামাযে দাঁড়িয়েছিলেন তখনই তিনি তাঁর ডান হাত দিয়ে তাঁর বাম হাতটা ধরেছিলেন।

(নাসায়ী ১ম খণ্ড ১০২ পৃঃ, বাবু অযউল য্যামীনি আলাশ শিমালি ফিসসলাতি রহীমিয়াহ দিল্লী ছাপা)

উক্ত হাদীসের বর্ণনাকারী ওয়ায়িল। তাঁর পুত্র আলকামাহ নাকি তাঁর থেকে কোন হাদীসই শুনেনি। যেমন ইবনে হাজার আসকালানী উল্লেখ করেছেন। (তাকরীবুত তাহযীব ৪র্থ খণ্ড নওলকিশোর লাগ্নৌ ছাপা)

ইয়াহুইয়া ইবনে মা'ঈন বলেন, আলকামাহ তাঁর পিতা থেকে মুরসাল। কিন্তু ইবনে হাজার আক্ষালানী অন্যত্র বলেন, ইবনে হিব্বান ও ইবনে সা'দ তাকে সিকাহ বা বিশ্বস্ত বলেছেন। (তাহযীবুত তাহযীব ৪র্থ খণ্ড ১৭৭ পৃঃ)

ইমাম বুখারী বলেন, তিনি তাঁর পিতা থেকে হাদীস শুনেছেন— (তারীখে কাবীর ৪র্থ খণ্ড ১ম অংশ ৪১ পৃঃ)। তাই ইমাম হাকিম তাঁর হাদীসকে সহীহ বলেছেন। আর হাফিয যাহাবীও মুত্তাদরাকে তালখীসে ওর সহীহ বলাটাকে স্বীকৃতি দিয়েছেন— (মুস্তাদরাকে হাকিম ১ম খণ্ড ২২৭ পৃঃ)। অতএব নাসায়ী বর্ণিত হাদীসটি সহীহ ও বিশ্বস্ত সূত্র।

উক্ত হাদীসে দাঁড়ানো অবস্থায় হাত বাঁধার উল্লেখ আছে। নামাযের মধ্যে দাঁড়ানো অবস্থা দু'বার হয়ে থাকে। এক রুকুর আগে। দুই রুকুর পরে। রুকুর

আগে হাত বাঁধার ব্যাপারে সবাই একমত। কিন্তু রুক্কুর পরে হাত বাঁধার ব্যাপারে মতভেদ আছে। এ ব্যাপারে আল্লামা আব্দুল আযীয ইবনে বায বলেন, উক্ত হাদীসে বর্ণিত কায়িম বা দাঁড়ানো শব্দটির মধ্যে রুক্কুর আগে ও পরে দু'টো কিয়ামই নিঃসন্দেহে গণ্য। তাই যে ব্যক্তি উক্ত দুই কিয়ামের মধ্যে পার্থক্য করবে তাকে ওর দলীল পেশ করতে হবে, আইনা ইয়্যাযাউল মুসল্লী য্যাদাইহী বাদার রফয়ি মিনার রুক্কুয়ি- (যিয়াদুতুল খুত্ব ৪৭ পৃঃ)। পরিভাষায় রুক্কুর আগে দাঁড়ানোকে 'কিয়াম' এবং রুক্কুর পরে দাঁড়ানোকে 'কাওমাহ' বলা হয়। তাই উক্ত দুই দাঁড়ানোকে অনেকে কিয়াম ও কাওমাহ নামে আলাদা আলাদা দু'রকম ভেবে বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন। সেজন্য কিয়াম ও কাওমাহ দু'টি আলাদা, না একই তা জানা দরকার। হাদীসের পরিভাষায় কিয়াম ও কাওমাহ একই জিনিস। যেমন বুখারীতে আছে সাহাবায়ে কিরাম ততক্ষণ কিয়াম (দাঁড়ানো) অবস্থায় থাকতেন যতক্ষণ তারা তাঁকে (ﷺ) দেখতেন যে, তিনি সিজদায় চলে গেছেন- (বুখারী বাবু রফয়িল বাসারি ইলাল ইমাম ফিসসালাতি)। সহীহ মুসলিম ও সুনানে ইবনে মাজাহতেও রুক্কুর পরের দাঁড়ানোকে কিয়াম বলা হয়েছে। নাসায়ীতেও বাব রয়েছে 'কাদরুল কিয়ামা বাইনার রুক্কু অস সুজুদ' অর্থাৎ রুক্কু ও সিজদার মাঝে কিয়ামের পরিমাণ। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রুক্কুর পরের দাঁড়ানোর নামও কিয়াম। তাই কিয়াম ও কাওমাহ দু'টোরই অর্থ দাঁড়ানো। এর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।

কেউ বলতে পারেন যে, রুক্কুর আগের কিয়ামে কিরাআত পড়া হয়। কিন্তু রুক্কুর পরের কিয়ামে তো কিরাআত নেই। তার জওয়াবে বলা হয় যে, ওয়াজিল বর্ণিত হাদীসে 'কারিয়ান' বা কিরাআত পাঠকারী শব্দতো নেই। যদি থাকতো তাহলে রুক্কুর পরের কিয়ামটা আগের কিয়াম থেকে আলাদা কিয়াম বলে প্রমাণিত হত। তাই রুক্কুর আগে ও পরে দুই কিয়ামের কোন পার্থক্য নেই। ফলে এর দ্বারা রুক্কুর পরের কিয়ামেও দুই হাত বাঁধার প্রমাণ সাব্যস্ত হচ্ছে।

হানাফী ফকীহ আবু সালামার গ্রন্থ 'আল-জামিউল আসগার' থেকে আল্লামা আইনী হানাফী বর্ণনা করেছেন- যখন কোন মুসল্লী তার মাথাটা রুক্কু থেকে তুলবেন তখন তিনি শান্তশিষ্ট শান্তশিষ্ট হয়ে দাঁড়াবেন এবং তার ডান হাতটা বাম হাতের উপরে রাখবেন। পরিশেষে সিজদায় পড়ে যাবেন- (আলবিনায়াহ লিলআইনী ১ম খণ্ড ৬১১ পৃষ্ঠার বরাতে যিয়াদুতুল খুত্ব অ বিঅযয়িল ইয়্যাদাইনি ফিল কিয়া-ম বা'দার রুক্কু ২৫ পৃঃ)। হানাফী ফকীহ আল্লামা কা-শা-নী (মৃত্যু ৫৮৭ হিঃ) আবু ওজা, আবু আলী নাসাফী, হাকিম আব্দুর রহমান ও ইসমাইল আয্যা-হিদ



প্রমুখদের অভিমতও তাই— (ঐ পৃঃ ঐ, কিতাব বাদায়িনিস সনায়ি ফী তারতীবিশ শারায়ি ১ম খণ্ড ২০১ পৃঃ, বৈরুত ছাপা ১৯৮২ সংস্করণ)।

ইমাম ইবনে হায্ম বলেন, আমরা এটা পছন্দনীয় মনে করি যে, একজন মুসল্লী তার ডান হাতটা বাম হাতের পিঠের উপরে রাখবে নামাযের মধ্যে প্রত্যেক দাঁড়ানোতেই। (আল মুহাল্লা ৪র্থ খণ্ড ১১২ পৃঃ)

## নামাযের মধ্যে ঝোলানো নিষেধ

রসূলুল্লাহ ﷺ নামাযের মধ্যে ঝোলানো মানা করেছেন। (আবু দাউদ ১ম খণ্ড ৯৪ পৃঃ, তিরমিযী ১ম খণ্ড ৫০ পৃঃ, হাকিম ১ম খণ্ড ২৫৩ পৃষ্ঠা)

উক্ত হাদীসে এ কথা পরিষ্কার নেই যে, কি ঝোলানো মানা? আবু দাউদের এক ব্যাখ্যায় লেখক আল্লামা আবুল হাসান সিন্ধী হানাফী বলেন, ‘সাদল’ বা ঝোলানোর অর্থ শরীআত তিন রকম বলেছে। তা হলো : (১) অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ঝোলানো, (২) চুল ঝোলানো, (৩) কাপড় ঝোলানো। (আল ওয়াদুদ শারহু আবী দাউদ ২৪৪ পৃঃ কলমে লেখা; যিয়া-দাতুল খুশু ৯ম পৃষ্ঠা)

তাই ঐ হাদীসটির নিষেধাজ্ঞা ‘ঝোলানো মানার’ মধ্যে অঙ্গ ও চুল এবং কাপড় তিনটিই হতে পারে। এজন্য হাদীসের বিখ্যাত গ্রন্থ আল-জামিউন্ সগীর এর ব্যাখ্যা লেখক আল্লামা মানাভী বলেন, এখানে ‘সাদলের’ ভাবার্থ হাত ছেড়ে দেয়া।

(ফাইয়ুল কাদীর ৬ষ্ঠ খণ্ড ৩১৫ পৃঃ, যিয়াদাতুল খুশু ১১ পৃষ্ঠা)

সহীহুল বুখারীর বিশিষ্ট ব্যাখ্যাকার আল্লামা কিরামানী বুখারীর ব্যাখ্যা গ্রন্থে সাহুল ইবনে সা’দ বর্ণিত হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন, নামাযের মধ্যে দুই হাত বাঁধাতে এ সতর্কতা রয়েছে যে, নামাযে দণ্ডায়মান ব্যক্তিটি অতি প্রতাপশালী বাদশার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। তার উচিত যে, সে যেন আদবের শর্ত পালনে তাক্ষিল্য না করে। বরং সে যেন তার হাতটা বেঁধে রাখে এবং নীচু হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। যেমন দুনিয়ার বাদশাহদের সামনে করে থাকে। (যিয়াদাতুল খুশু ৬৬ পৃষ্ঠা)

নামাযে দাঁড়ানো এক ব্যক্তি এবং নামাযের বাইরে দাঁড়ানো আর এক ব্যক্তির মধ্যে বাহ্যিক পার্থক্যই হচ্ছে হাত বেঁধে দাঁড়ানো এবং হাত ছেড়ে দাঁড়ানো। তাই উপরোক্ত হাদীসে বর্ণিত ‘সাদল’ এর ভাবার্থ নামাযের মধ্যে হাত ঝোলানো নিষেধের দিকেই ইঙ্গিত পাওয়া যায় না কি, যেমন আল্লামা মানাভী ওর ব্যাখ্যায় করেছেন। তাই রুকূর পরে দাঁড়ানোতে হাত না বেঁধে ঝুলিয়ে রাখা নিষেধাজ্ঞাটি প্রযোজ্য হবে না কি? একটি হাদীসে আছে, একদা হুযাইফা (রাঃ) নাবী ﷺ-কে

রাতে নামায পড়তে দেখেন যে, তিনি প্রথম রাক'আতে সূরা বাকারাহ পুরা পড়লেন। তারপর তিনি রুকু করলেন। তাঁর রুকুটা তাঁর দাঁড়ানোর মতই লম্বা ছিল। তারপর তিনি রুকু থেকে মাথা তুলে দাঁড়ালেন। তাঁর এ দাঁড়ানোটা তাঁর রুকুর মত (লম্বা) ছিল। তখন তিনি দাঁড়িয়ে বলছিলেন- 'লিরবিবল হাম্দ' অর্থাৎ আমার প্রতিপালকের যাবতীয় গুণগান। তারপর তিনি ঐরূপ লম্বা লম্বা সিজদা দিয়ে চার রাক'আত নামায পড়লেন। তাতে তিনি সূরা বাকারাহ ও আলু ইমরান এবং নিসা ও মায়িদাহ কিংবা আল আন'আম পড়েন। (আবু দাউদ, মিশকাত ১০৬ পৃষ্ঠা)

উক্ত হাদীসে রয়েছে যে, তিনি (ﷺ) প্রথম রাক'আতে সূরা বাকারাহ পড়েন। যা প্রায় আড়াই পারা। তিনি (ﷺ) খুবই ধীরে ধীরে কিরাআত পড়তেন। তাই তাঁর আড়াই পারা পড়াটা এক ঘণ্টার কমে হবে কি? উক্ত হাদীসে এ বর্ণনাও রয়েছে যে, তাঁর রুকুর পরে দাঁড়ানোটাও রুকুর আগের দাঁড়ানোর মতই ছিল। অর্থাৎ এক ঘণ্টার বেশী। রুকুর পরের এ এক ঘণ্টা দাঁড়ানোতে তিনি (ﷺ) হাত ছেড়ে নামাযের বাইরে দাঁড়ানোর মত দাঁড়িয়ে দু'আ পড়েছিলেন না হাত বেঁধে দু'আ পড়েছিলেন তাঁর উল্লেখ হাদীসে নেই। কিন্তু নামাযে দাঁড়ানো এবং নামাযের বাইরে দাঁড়ানোর পার্থক্যই ইস্তিত দেয় যে, তখন তিনি হাত ঝুলিয়ে ছিলেন না।

নামাযের মধ্যে দাঁড়ানোর অবস্থায় দুই হাত ঝুলে থাকবে এমন কোন হাদীস প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে পাওয়া যায় না। এর বিপরীত নামাযের মধ্যে না ঝোলানোর নিষেধাজ্ঞা দ্বারা রুকুর পরে দাঁড়ানোতেও হাত বাঁধার ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। তাছাড়া মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত ওয়া-য়িল ইবনে হুজ্জের হাদীস দ্বারা আরো প্রমাণিত হয়েছে যে, রুকুর পরেও নাবী (ﷺ)-কে দুই হাত বাঁধা অবস্থায় দেখেছিলেন। ইমাম ইবনে হাযমের মত মহা মনীষীর ফাতাওয়ায় নামাযের মধ্যে প্রত্যেক রকম দাঁড়ানোতেই দুই হাত বাঁধা পছন্দনীয় কাজ। কতিপয় বিখ্যাত হানাফী ফকীহদের ফাতওয়াও তাই। ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) থেকে বর্ণিত একটি মতে রুকুর পর কাওমাহতে হাত বাঁধা যাবে। (কাবীরী ২৯৪ পৃষ্ঠা)

ইমাম আহমাদ ইবনে হাযাল এর মতে কাওমাহতে বাঁধা ও ছাড়া দুই চলবে- (কাশশা ফুল-কুনূঅ ১ম খণ্ড ২৩১ পৃষ্ঠা)। কিছু শাফিয়ীর মতে রুকুর পরেও রুকুর আগের দাঁড়ানো অবস্থায় ফিরে আসতে হবে। ফলে আবার হাত বাঁধতে হবে- (আলআনওয়া-র লি-আমা-লিল আবরার ১ম খণ্ড ৯২ পৃষ্ঠা, লি আল্লামা ইউসুফ আদবীলী, যিয়া-দাতুল খুশু বিঅয়্যিল য্যাদাইনি ফিল কিয়া-ম বা'দার রুকু ২৬ পৃষ্ঠা)।

উক্ত সমস্ত আলোচনার সার দাঁড়ালো এ যে, রুকুর পরে দাঁড়ানোতেও পুনরায় বাম হাতের উপর ডান হাত রাখা তত্ত্ব গবেষক আলিমদের মতে উত্তম সন্নাহ। আর হাত ছেড়ে দেয়া আপত্তিকর। কিছু আলিমের মতে কাওমাহুতে হাত না বাঁধাই স্বাভাবিক। এ ব্যাপারে সউদী মুফতীয়ে আযম আল্লামা আব্দুল আযীয ইবনে বায বলেন, উত্তম কাজ ত্যাগ করার ব্যাপারে কোন্দল করা উচিত নয়। যেমন রুকুর পরে দাঁড়ানোতে হাত বাঁধা ও ছাড়ার ব্যাপারে আফ্রিকাতে গণ্ডগোল হয়েছে। সাবাহায়ে কিরাম এবং তাঁদের পরবর্তী আলিমদের মধ্যেও খুঁটিনাটি মাসআলায় মতভেদ ছিল। তাই বলে তাঁদের মধ্যে বিচ্ছেদ হয়নি। কারণ, তাদের প্রত্যেকেরই লক্ষ্য ছিল দলীল দ্বারা হককে জানা। তাই যখনই তাঁদের সামনে হক হাযির হয়েছে তখনই তাঁরা তাতে ঐক্যবদ্ধ হয়েছেন। কিন্তু যখনই কারো কাছে তা অজানা রয়ে গেছে তখন সে তাঁর অন্য ভাইকে গোমরা ও পথভ্রষ্ট বলেননি এবং তাঁর পেছনে নামায পড়া ত্যাগ করেননি। তাই আমাদের উচিত আল্লাহকে ভয় করা এবং আমাদের আগেকার সালাফ স-লিহীন (সাহাবী ও তা-বিয়ীদের) অনুসরণে আপোষে কোন্দল না করে (কুরআন ও হাদীসের) দলীল দ্বারা হককে জানা ও চেনার অনুরাগ সৃষ্টি করা। (আইনা গ্যায়াউল মুসল্লী গ্যাঁদাইহি বা'দার রফয় মিনার রুকুয়, যিয়াদাতুল খুশু ৪৯ পৃষ্ঠা)

আরবের মুশরিকরা কোন নতুন কথা শুনলে বলতো : মা ওয়াজাদনা 'আলাইহি আ-বা-আনা। অর্থাৎ এ কাজে আমরা আমাদের বাপ দাদাদেরকে পাইনি। তেমনি মাযহাবপন্থীগণ বলেন, মা-ওয়াজাদনা 'আলাইহি ইমা-মানা। অর্থাৎ আমরা এ ব্যাপারে আমাদের ইমামকে পাইনি। অনুরূপভাবে কুরআন ও হাদীসের সরাসরি অনুসরণকারী কোন আহলে হাদীস এ কথা বলতে পারে কি যে, এ মাসআলাটা আগেকার অমুক অমুক বড় বড় মাওলানা জানতেন না? তাহলে কোন এক ইমাম ও এক মাযহাবের অন্ধ অনুসারী এবং কুরআন ও সহীহ হাদীসের সরাসরি অনুসারী ব্যক্তির মধ্যে পার্থক্য থাকলো কি? তাই কোন আহলে হাদীসই এ কথা বলার অধিকার রাখে না যে, এ মাসআলাগুলো অমুক অমুক আলিম জানতেন না ..... ইত্যাদি। কারণ কোন আলিম, এমনকি নাবীগণও সবজান্তা নন। তাই তিনি সব বিষয়েই জানবেন। সবজান্তা একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কেউ নন। ফলে কোন আলিম সব মাসআলাই জানেন এমন ধারণা করাও পরোক্ষভাবে শিরকের আশংকা।

নামাযের বই সলাতে মুত্তকা লেখার সময় ১৯৭৭ সালে এবং তারপরে ওর বিভিন্ন সংস্করণের পরিমার্জন ও পরিবর্ধন কালে ১৯৯৩ পর্যন্ত-রুকুর পরে দাঁড়ানোতে আবার দুই হাত বাঁধা ও ছাড়ার মতভেদী মাসআলা সম্পর্কে কোন

বিতর্কিত তথ্য আমার নযরে পড়েনি। সেজন্য আমি ঐ ব্যাপারে চিন্তাভাবনা ও গবেষণার প্রয়োজন বোধ করিনি। অতঃপর শ্রদ্ধেয় ভাই মাওলানা নুসরাতুল্লাহ সাহেবের দু'টি প্রবন্ধ আহলে হাদীস পত্রিকায় প্রকাশের পর পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন এলাকা থেকে অল্পবিস্তর বাদানুবাদের রিপোর্ট আমার কাছে আসে। ফলে ঐ মাসআলার ব্যাপারে চিন্তাভাবনার প্রয়োজন দেখা দেয়। ইত্যবসরে ভাই নুসরাতুল্লাহ সাহেবের সন্ধান দেয়া বই আল্লামা আবু মুহাম্মাদ বাদীউদ্দীন শাহ সিক্রির রচিত—“যিয়া-দাতুল খুশু বিঅযয়িল য়াদাইন ফিল কিয়া-ম বা'দার রুকু” নামক বইটি দিল্লীতে পেয়ে যাই। ওতে ইবনে বা-য এর পুস্তিকা-আইনা য়াযাউল মুসল্লী য়াদাইহি বা'দার রফয়ি মিনার রুকুয়ি এবং সাইয়িদ ইবনে সা'দুদ্দীন প্রণীত হাদউ খাইরিল আনাম নামে আরো দু'টি পুস্তিকা আছে। ঐ তিনটি পুস্তিকা পড়ার পর অনেক নতুন তথ্য ও দলীল সামনে আসে। যার ফলশ্রুতি এ প্রবন্ধটি। এটি পড়ার পর যার যা ইচ্ছা তা করতে পারেন আপোষে কোন্দল করবেন না। কারণ রুকুর পরে দাঁড়ানোতে হাত বাঁধা কাজটা সুন্নাত। আর কোন্দল করা হারাম কাজ এবং তা না করা ফরয কাজ। অতএব সুন্নাত নিয়ে কোন্দল করে ফরয ছাড়া কোন মতেই চলবে না। রুকুর পরে কাওমাতে হাত ছাড়ার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কোন দলীল নেই। কিন্তু হাত বাঁধার ব্যাপারে পরোক্ষ কতিপয় হাদীস এবং প্রত্যক্ষ ইঙ্গিত রয়েছে। তাই আমার এখনকার ব্যক্তিগত অভিমতে কাওমাতে দুই হাত আবার বাঁধার মতটাই জোরদার বেশী। আল্লাহ ভাল জানেন।

## পরের রাক'আতে যমীন থেকে ওঠার নিয়ম প্রসঙ্গে

নামাযে প্রথম রাক'আত পড়ার পর দ্বিতীয় রাক'আতে ওঠা এবং তারপর তৃতীয় রাক'আত পড়ার পরে চতুর্থ রাক'আতের জন্য যমীন থেকে ওঠাটা কিভাবে হবে? এ ব্যাপারে দু'টি নিয়ম চালু ছিল। ইদানিং একটি তৃতীয় ঢং চালু হয়েছে। তাই ঐ তিন রকম নিয়ম সম্পর্কে নীচে আলোচনা করা হচ্ছে। নিয়মগুলো হচ্ছে :

১। দুই সিজদার পরে যমীনে হাতের ভর না দিয়ে বরং দুই হাঁটুতে দুই হাত রেখে দুই পায়ের আসুলগুলোর উপরে ভর দিয়ে সটাং করে উঠে পড়া। এটা হানাফী মাযহাবের ফাতওয়া। (শারহুন্ নিকায়াহ ১ম খণ্ড ৭৯ পৃষ্ঠা)



২। দুই সিজদার পরে সোজা হয়ে নাম মাআ বসে দুই হাতের উপর ভর দিয়ে ধীরভাবে ওঠা। এটা শা-ফিয়ী, হাম্বলী ও আহলে হাদীসদের নিয়ম। (মিরআ-তুল মাফা-তীহ ২য় খণ্ড ২৯২ পৃষ্ঠা, বেনারস ছাপা)

৩। দুই সিজদার পরে আটার খামীর ছানার মত দুই হাত মুঠো করে যমীনে ভর দিয়ে ওঠা। এটা বিশিষ্ট মুহাদ্দিস আল্লামা না-সিরুদ্দীন আলবানী ও তাঁর অনুরক্তদের অভিমত।

এবার ঐ তিন রকম নিয়মের দলীলের পর্যালোচনা নিম্নে করা হল।

প্রথম নিয়মটির প্রমাণে আল্লামা মুহাম্মাদ আলী কারী হানাফী তিরমিযীতে আবু হুরায়রা বর্ণিত হাদীস মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবাতে নু'মা-ন ইবনে আবী আইয়্যাশ বর্ণিত হাদীস এবং 'উমর, 'আলী, ইবনে মাস'উদ, ইবনে যুবাইর (রাঃ) বর্ণিত রিওয়ায়াতগুলো পেশ করেছেন। (শারহুন্ নিকা-য়াহ ১ম খণ্ড ৭৯ পৃষ্ঠা)

১ম ও ৩য় রাক'আতের দুই সিজদার পর নাম মাত্র বসাতাকে শরীআতের পরিভাষায় জালসায়ে ইস্তিরা-হাত বলা হয়। এ জালসায়ে ইস্তিরা-হাত না করে দুই পায়ের আঙ্গুলের ডগার উপর ভর দিয়ে সটাং করে উঠে পড়া সংক্রান্ত তিরমিযী, ইবনে আবী শাইবাহ, মুসান্নাফ আবদুর রায্যাক ও ইবনে আদীর আলকা-মিলে বর্ণিত হাদীসগুলো সম্পর্কে বিখ্যাত হানাফী মুহাদ্দিস আল্লামা যায়লায়ী (রহঃ) বলেন যে, হাদীসগুলো সবই যয়ীফ- (নাসবুর রা-য়াহ ১ম খণ্ড ৩৮৯ পৃষ্ঠা)। অতএব হাদীসের নীতিশাস্ত্র বিশারদদের মতে ঐ যয়ীফ হাদীসগুলো দলীলযোগ্য হতে পারে না। কারণ ওর বিপরীতে সহীহ হাদীস মঞ্জুদ রয়েছে। যা উপরে বর্ণিত দ্বিতীয় নিয়মের দলীল। তা হল এ :

বিখ্যাত সাহাবী মা-লিক ইবনে হুআইরিস (রাঃ) একবার নাবী -এর নামায দেখেন যে, তিনি () দ্বিতীয় সিজদা থেকে মাথা তুলে বসলেন এবং যমীনের উপর ভর দিলেন। তারপর তিনি দাঁড়ালেন। (বুখারী ১৪৪ পৃঃ, সহীহ ইবনে খুযাইমাহ ১ম খণ্ড ২৪২ পৃঃ, মুসনাদ শা-ফিয়ী, তালখীসুল হাবীর ৯৯ পৃঃ)

এক তা-বিয়ী আযরাক ইবনে কাইস বলেন, আমি ইবনে 'উমরকে দেখেছি যখন তিনি দু'রাক'আতের পর দাঁড়াতেন তখন তিনি দু'টো হাত দিয়ে যমীনের উপর ভর দিতেন- (বাইহাকী ৩য় খণ্ড ১৩৫ পৃঃ)। অন্য হাদীসেও ইবনে উমার থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি যখন সিজদা থেকে মাথা তুলতেন তখন হাত দু'টোকে তুলবার আগে দুই হাতে ভর দিয়ে দাঁড়াতেন- (মুসান্নাফ আবদুর রায্যাক, ফাতহুল বা-রী ২য় খণ্ড ৩০৩ পৃঃ)। উক্ত তিনটি হাদীসই সহীহ হাদীস। অতএব এসব সহীহ হাদীসের ভিত্তিতে দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ রাক'আতের জন্য ওঠার সময় যমীনে দুই হাতের ভর দিয়ে ওঠাটাই নাবীজীর সন্নাত।

থাকলো তৃতীয় নিয়ম দুই হাত মুঠো করে যমীনে ভর দিয়ে ওঠা। এ ব্যাপারে বর্তমানে ইসলাম জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী আবু ইসহাক হারবী বর্ণিত একটি হাদীস পেশ করেছেন যে, তিনি (রাঃ) নামাযের মধ্যে আটার খামীর ছানার মত করে দুই হাতের উপরে ভর দিতেন যখন তিনি দাঁড়াতেন। (সিফাতুস সলা-তিন নাবীই ১৫৫ পৃঃ)

উক্ত আবু ইসহাক হারবী (রাঃ) বর্ণিত হাদীসটির সনদ সিফাতু সলাতিন নাবীই বইয়ে নেই। ঐ ব্যাপারে আলবা-নী সাহেব বলেছেন যে, আবু ইসহাক হারবীর সনদ জোরদার। সে কথা আমি আমার কিতাব তামা-মুল মিন্নাহ ফিত্ তা'লীক আলা ফিকহিস সুন্নাহতে বর্ণনা করেছি। (ঐ- পৃঃ ঐ)

তামা-মুল মিন্নাহ বইটি আমার কাছে নেই। তবে আলবা-নী সাহেবের অন্য গ্রন্থে আবু ইসহাক হারবীর সনদ আছে- তা হল, আবদুল্লাহ ইবনে উমার- ইউনুস ইবনে বুকাইর- আতিয়াহ ইবনে কাইস- ইবনে উমার- রসূলুল্লাহ (সঃ)।

(সিলসিলাতিল আহ-দীসিয্ যারীফাহ ২য় খণ্ড ২৯২ পৃঃ ৯৬৭ নং হাদীস, গারীবুল হাদীস ২য় খণ্ড ৫২৫ পৃষ্ঠা)

উক্ত সনদের এক বর্ণনাকারী হাইসাম ইবনে ইমরান একজন অজ্ঞাত পরিচয় তথা মাজহুল রা-বী। হাদীস শাস্ত্রের নীতিবিশারদের মতে মাজহুল রা-বী কর্তৃক বর্ণিত হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়। তাই উক্ত রা-বী হাইসামকে পরিচিতি দেবার জন্য আলবানী সাহেব সাধ্য-সাধনা করেছেন। তাতে তিনি কতটা সফল হয়েছেন সে আলোচনা নিম্নে দেখুন :

আলবানী সাহেব হাইসামের বর্ণনায় বলেন যে, ইবনে হিব্বান তাঁর কিতা-বুস সিকা-ত ২য় খণ্ড ২৯৬ পৃষ্ঠায় হাইসাম ইবনে ইমরানের নাম উল্লেখ করেছেন। আর ইবনে আবু হাতিম তাঁর 'কিতা-বুল জারহি অন্তা'দীল' গ্রন্থে হাইসামের উল্লেখের পর তাঁর বিরুদ্ধে তিনি কোন সমালোচনা করেননি। (সিলসিলাতিল আহ-দীসিয্ যারীফা ওয়াল মাউযুআ ২য় খণ্ড ৩৯২ পৃষ্ঠা)

কোন রা-বীকে ইবনে হিব্বানের সিকা-ত-এর মধ্যে গণ্য করার ব্যাপারে অন্য জায়গায় আলবানী সাহেব এ মন্তব্য করেছেন যে, কাউকে সিকাহ বা বিশ্বস্ত রা-বী বলার ব্যাপারে ইবনে হিব্বান টিলে ব্যক্তি। কারণ, তিনি বহু এমন মাজহুল বা অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তিকেও বিশ্বস্ত বলেছেন, যার সম্পর্কে তিনি নিজেই বলেছেন যে, তিনি তাঁকে চেনেন না এবং তাঁর বাপকেও জানেন না। যেমন ইবনুল হাদী 'আস্ সা-রিমুল মুনকী' গ্রন্থে ওর উল্লেখ করেছেন। তাঁর মত টিলে ব্যক্তি ইমাম

হা-কিমও। যা রিজালশাত্তের পারদশীদের নিকট গোপন নয়। তাই ঐ দু'জনের কথা পরস্পর বিরোধী হলে তার কোন ধার তার থাকে কি? (ঐ ১ম খণ্ড ৩২ পৃষ্ঠা, ২৩ নং হাদীস)

অন্য জায়গায় এক মন্তব্যে আলবানী সাহেব বলেন, ইবনে হিব্বানের তাওসীক বা কাউকে বিশ্বস্ত বলা রিজালবিদদের নিকট গ্রহণযোগ্য হয় না। (ঐ- ১ম খণ্ড ১১৫ পৃষ্ঠা ২ নং টীকা ৮৩ নং হাদীস)

আর এক জায়গায় তিনি বলেন, কোন রা-বীকে ইবনে হিব্বানের একা বিশ্বস্ত বলাতে মান নিশ্চিত হয় না। (ঐ ১ম খণ্ড ১৩১ পৃষ্ঠা ৯৪ নং হাদীস)

অতএব উপরে বর্ণিত আল্লামা আলবানী সাহেবের মন্তব্য দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে যে, আবু ইসহাক হারবী বর্ণিত হাদীসটির এক মাজহুল রা-বী হাইসাম ইবনে ইমরানকে কেবলমাত্র ইবনে হিব্বানের একা সিকাহ বলায় তিনি সিকাহ প্রমাণিত হচ্ছেন না। বরং আলবানী সাহেবের একমাত্র গবেষণার আগে তিনি যেমন মাজহুল ছিলেন তেমনই এখনও মাজহুল রয়ে গেছেন। ৩৪ নং হাদীসের গবেষণায় আলবানী সাহেব বলেন, ঐ হাদীসটি ভিত্তিহীন। ওর আসল কারণ, ওর এক রাবী আবু দারদা রাহা-ভীর মাজহুল হওয়া। (ঐ ১ম খণ্ড ৫৩ পৃষ্ঠা ৩৪ নং হাদীস)

তাহলে হাইসাম ইবনে ইমরানের মাজহুল থাকা অবস্থায় হাত মুঠো করে যমীনে ভর দেয়া হাদীসটি যয়ীফ হবার কারণে দলীলযোগ্য হবে কি? না, মোটেই না। থাকলো ইবনে আবু হাতিমের কোন মন্তব্য না করা হাইসাম সম্পর্কে। ফলে তাঁর মন্তব্য না করায় হাইসামের মাজহুল চরিত্র পাল্টাচ্ছে না। অতএব আলবানী সাহেবের দুই খুঁটি- ইবনে হিব্বান ও ইবনে আবু হাতিম- দুর্বল। ফলে ওঁদের ভিত্তিতে তাঁর আবু ইসহাক হারবী বর্ণিত হাদীসটির সনদকে হাসান বলা ভিত্তিহীন হয়ে যাচ্ছে। তাই দুই হাত মুঠো করে যমীনে ভর দিয়ে ওঠা হাদীসটি দলীলের অযোগ্য বিধায় এ নিয়মটা পরিত্যাজ্য। হাতে ভর দেয়া সম্পর্কে একটি হাদীস ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে এভাবে- রসূলুল্লাহ ﷺ যখন নামাযের মধ্যে দাঁড়াতেন তখন তিনি হাত দুটোকে যমীনে রাখতেন এভাবে যেভাবে আটার খামীর ছানা ব্যক্তি রাখে। (তালখীসুল হাবীর ৯৯ পৃষ্ঠা আনসারী দিল্লী ছাপা)

উক্ত হাদীসটি নোট করার পর হাফিয় ইবনে হাজার আসকালানী (রহঃ) বলেন, ইবনুস সলাহ আলঅসীতু গ্রন্থে বলেন, এ হাদীসটি সহীহ নয় এবং পরিচিতও নয়। তাই এর দ্বারা দলীল পেশ করা বৈধও নয়। আর ইমাম নববী (মৃত ৬৭৬ হিঃ)

শারহুল মুহাযযাব গ্রন্থে বলেন, এ হাদীসটি যয়ীফ কিংবা বাতিল। যার কোন ভিত্তিই নেই। আর তানকীহ গ্রন্থ প্রণেতা বলেন, এটা যয়ীফ বাতিল হাদীস। (ঐ ৯৯ পৃষ্ঠা)

ইবনে হাজার আসকালানী তাবারানী আওসাতের বরাত দিয়ে ইবনে উমরের একটি মাওকুফ হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, তিনি নামাযের মধ্যে আটা ছানার মতো মুঠো করে দুই হাত যমীনে ভর দিয়ে উঠেছেন। (ঐ ১০০ পৃষ্ঠা)

এ হাদীসটি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীস নয়। বরং ইবনে উমরের মাওকুফ হাদীস। এ হাদীসটি সহীহ না যয়ীফ সে মন্তব্য হাফিয ইবনে হাজার আসকালানী করেননি। কিন্তু তিনি মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাকের বরাত দিয়ে ইবনে উমরেরই আর একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন এভাবে- ইবনে উমার যখন তাঁর মাথাটা সিজদা থেকে তুলতেন তখনই তিনি তাঁর হাত দু'টোকে তুলবার আগে যমীনে ভর দিয়ে দাঁড়াতে- (ফাতহুল বারী ২য় খণ্ড ৩০০ পৃষ্ঠা)। এ হাদীসটিতে আটা ছানার মতো মুঠো করা শব্দগুলো নেই।

এরূপ আর একটি হাদীস আলবানী সাহেব বাইহাকীর বরাত দিয়ে আযরাক ইবনে কাইস থেকে বর্ণনা করেছেন এভাবে- আযরাক দেখেছিলেন ইবনে উমরকে, যখন তিনি দুই রাক'আত থেকে দাঁড়ালেন তখন তিনি তাঁর দু'টি হাত যমীনে ভর দিলেন। (বাইহাকী ২য় খণ্ড ১৩৫ পৃষ্ঠা)

এ হাদীসটি বর্ণনার পর আলবানী সাহেব মন্তব্য করেছেন, এর সনদগুলো উত্তম এবং এর সমস্ত বর্ণনাকারীই বিশ্বস্ত। (সিলসিলাতিল আহাদিসিয যয়ীফা ওয়াল মাউযুআহ ২য় খণ্ড ৩৯২ পৃষ্ঠা)

এ হাদীসেও হাত মুঠো করার শব্দাবলী নেই। সুতরাং আলবানী সাহেবের গবেষণা অনুযায়ী ইবনে উমর থেকে বিশ্বস্ত সূত্রে বর্ণিত হাদীস দ্বারা আটা ছানার মতো দুই হাত মুঠো করা প্রমাণিত হয় না। আর তাঁর দুই নড়বড়ে খুঁটি- ইবনে হিব্বানের 'একা-মন্তব্য' ও ইবনে আবু হাতিমের নিশূপ থাকা'র ভিত্তিতে আটা ছানার মত দুই হাত মুঠো করা এক অখ্যাত মুহাদ্দিস আবু ইসহাক হারবীর বর্ণিত একমাত্র যয়ীফ হাদীসটি সহীহ বুখারী বর্ণিত সহীহ হাদীস এবং সহীহ ইবনে খুযাইমা, মুসান্নাফ আবদুর রাযযাক এবং বাইহাকী বর্ণিত বিশ্বস্ত রা-বীদের সহীহ হাদীসের সামনে টিকতে পারে কি?

হাদীসের নীতি শাস্ত্রবিদদের আইনানুযায়ী একটি দ্বিধাশ্রুত হাসান হাদীস (১) তিনটি সহীহ হাদীসের মোকাবিলায় টিকতে পারে না। তাই ইদানিংকালের নিয়মটা



ধোপে টিকছে না। অতএব উক্ত সমস্ত আলোচনার সার দাঁড়ালো এ যে, প্রথম রাক'আতের পর দ্বিতীয় রাক'আতে ওঠার সময় এবং দ্বিতীয় রাক'আতের তাশাহুদ পড়ার পর তৃতীয় রাক'আতের জন্য ওঠার সময়, আর তৃতীয় রাক'আতের শেষে চতুর্থ রাক'আতের জন্য দাঁড়াবার সময় নামমাত্র বসে দুই হাতের পাতা যমীনে ভর দিয়ে ওঠা নাবী ﷺ-এর সঠিক সূনাত।

### ঃ পরিশিষ্টের প্রমাণপঞ্জী :ঃ

১। আব্বাসা না-সিরুদ্দীন আলবানী'র 'সিলসিলাতিল আহা-দিসিয় যয়ীফাহ অল্লয়াউযুআহ' ১ম খণ্ড ৫ম সংস্করণ, ১৯৮০ ইং আলমাকতাবুল ইসলামী, বৈরুত ছাপা, ২। ঐ ২য় খণ্ড ৩য় সংস্করণ ১৪০৬ হিঃ মাকতাবাহ ইসলামিয়াহ, জর্ডান আলমাআ-রিফ, রিয়াদ ছাপা। ৪। আব্বাসা মানা-ভীর ফাইয়ুল কাদীর শারহুল জা-মিয়িস সগীর। ৫। শাইখ মানসূর ইবনে ইদরীস হাফলীর কাশশা-ফুল কুনাঅআম মাতনিল আকুনাআ, মিসরী ছাপা। ৬। আব্বাসা আলাউদ্দীন আবু বাকর ইবনে মাস'উদ কা-সা-নী (মৃত্যু ৫৮৭ হিঃ) কৃত কিতা-বুল বাদ-য়িয়িস সনী-য়িঅ ফী তারতীবিশ শরা-য়িঅ, দারুল কিতাব, বৈরুত ছাপা ১৯৮২ ইং সংস্করণ। ৭। হাফিয় ইবনে হাজার আসকালানীর তাকরীবুত তাহযীব, নওলকিশোর লাক্সে। ৮। ওরই তাহযীবুত তাহযীব, দা-রু ইহয়্যায়িত তুরা-সিল আরাবী বৈরুত, ১৯৯১ ইং সংস্করণ। ৯। আব্বাসা বাদীউদ্দীন শাহের যিয়াদাতুল খুশু' বিঅয়িল যিয়াদাইনি ফিল কিয়ামি বা'দার রুকু, দা-রুল খুলাফা, কুয়েত ছাপা, ১৯৮৬ ইং সংস্করণ। ১০। আব্বাসা আব্দুল আযীয ইবনে বায-এর আইনা য্যাযাউল মুসল্লী য্যাদাইহি বা'দার রফয়ি মিনার রুকুয়ি, ঐ ছাপা। ১১। সাইয়িদ ইবনে সা'দুদ্দীন এর হাদউ খাইরিল আনাম ফী অয়িল যুমনা আলাল য়াসরা ফিল কিয়া-ম, ঐ ছাপা। ১২। মিসবাহুল লুগাত দিন্নী ছাপা, ১৯৫৭ ইং সংস্করণ। ১৩। নিহা-য়্যাহ ফী গারীবির হাদীস। ১৪। ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল বুখারীর তারিখে কাবীর, হায়দারাবাদ ছাপা।

## প্রমাণপঞ্জী

### কুরআন ও কুরআনের তাফসীরসমূহ

১। আল-কুরআন ২। তাফসীর ইবনে কাসীর, দারুল ফিক্‌র, কাতার ছাপা, ১৯৮০ ইসং সংস্করণ ৩। তাফসীরে কাবীর, বোম্বাই ছাপা ৪। ফাতহুল বায়া-ন, বুলাক, মিসরী ছাপা ৫। তাফসীর মাআ-লিমুত্ তানযীল, বোম্বাই ছাপা ৬। তাফসীরে খাযিন, আব্বাকাদ্দুমুল ইলমিয়াহ, মিসরী ছাপা ৭। তাফসীরে কাশশা-ফ, তুজ্জা-রিয়্যাহ কুবরা, মিসরী ছাপা ৮। তাফসীরে জালালাইন, রশীদিয়্যাহ, দিল্লী ছাপা ৯। তরজুমা-নুল কুরআন বিলাতা-য়িফিল বায়া-ন, সিদ্দীকী, লাহোর ছাপা ১০। আত্‌তাফসীরাতুল আহমাদিয়াহ দিল্লী ছাপা।

### সহীহ হাদীস ও জাল হাদীস গ্রন্থাবলী

১২। সহীহুল বুখারী, দিল্লী ছাপা ১৩। সহীহ মুসলিম, নওলকিশোর, লাক্ষৌ ছাপা। ১৪। নাসায়ী, রহীমিয়াহ, দিল্লী ছাপা-১৩৫০ হিঃ ১৫। আবু দাউদ, মিসরী ও মাজীদী কানপুরী দুই ছাপা। ১৬। তিরমিযী রশীদিয়্যাহ, দিল্লী ছাপা ১৭। ইবনু মাজাহ, দিল্লী, কোলকাতা ছাপা। ১৮। মুওয়াত্তা মালিক, দিল্লী ছাপা। ১৯। তাহাভী, রহীমিয়াহ, দেওবন্দ ছাপা। ২০। সহীহ ইবনে খুযায়মা, বৈরুত ছাপা। ২১। মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা, বোম্বাই ছাপা। ২২। মুসান্নাফ আবদুর রাযযাক, বৈরুত, ১৯৭০ ইং সংস্করণ। ২৩। দারাকুতনী, ফারুকী, দিল্লী ছাপা। ২৪। আল মুত্তাদরাক আলাস্ সহীহায়ন ফিল হাদীস লিল্ হা-কিম, দায়েরাতুল মাআ-রিফ, হায়দ্রাবাদ ছাপা। ২৫। আসসুনানুল কুবরা লিল বায়হাকী, ঐ ছাপা। ২৬। জামউল ফাওয়া-য়িদ মিন জামিউল উসূল অমাজ্‌মায়িয্ যাওয়া-য়িদ, রহীমিয়াহ, দেওবন্দ ছাপা। ২৭। মুসনাদে ইমাম আহমাদ, দারুল ফিক্‌রিল আরবী ছাপা। ২৮। মিশকাত, কানপুরী, দিল্লী ছাপা। ২৯। বুলুগুল মারা-ম রশীদিয়্যাহ দিল্লী ১৯৫২ ইং সংস্করণ। ৩০। তালখীসুল হাবীর, দিল্লী ছাপা। ৩১। কানযুল উমমা-ল, হায়দারাবাদ ছাপা। ৩২। ইতিখাবুত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব, দিল্লী ছাপা। ৩৩। হাফিয সুযুতীর আল্লায়ায়িল মসনুআহ ফিল আহা-দীসিল মউযুআহ, হুসায়নিয়া মিসরী ছাপা। ৩৪। আদ্বামা মোল্লা আলী কারীর মাউযুআ-তে কাবীর মুজতাবায়ী, দিল্লী ছাপা। ৩৫। ইমাম সাখা-বীর আলমাকা-সিদুল হাসানাহ ফী বায়ানে কাসীরিম মিনাল আহা-দীসিল মুশতাহিরাহ আলাল আলসিনাহ, দারুল কিতাবিল ইলমিয়াহ, বৈরুত ছাপা।

### হাদীসের ব্যাখ্যা, মাসআলা ও ফাতওয়া গ্রন্থসমূহ

৩৬। ফাতহুল বারী, রিয়াদ ছাপা। ৩৭। উমদাতুল কা-রী শারহ্ সহীহিল বুখারী ওরফে আইনী, দারুল ফিক্‌র ছাপা। ৩৮। ইরশা-দুস সারী, মিসরী ছাপা। ৩৯।

ফায়যুল-বারী, সুরাট ছাপা। ৪০। নববী শারহে মুসলিম, দিল্লী ছাপা ৪১। তুহফাতুল আহুওয়াযী, দিল্লী ছাপা, ১৩৪৯ হিঃ। ৪২। আলআর ফুশ শাহী, রহীমিয়াহ, দেওবন্দ ছাপা। ৪৩। আওনুল মা'বুদ ঐ ছাপা ১৩৯৩ হিঃ সংস্করণ। ৪৪। আত্মা'লীকা-তুস সালাফিয়াহ আলান নাসা-য়ী, লাহোর ছাপা, ১৯৭৬ ইং সংস্করণ। ৪৫। মিরকা-ত, বোম্বাই ছাপা। ৪৭। মিরআতুল মাফা-তীহ ১ম খণ্ড, লাহোর ছাপা এবং ২য় খণ্ড লাক্কৌ ছাপা, ১৯৫৮ ইং সংস্করণ। ৪৮। আত্ তা'লীকুস সবীহ, হায়দারাবাদ ছাপা। ৪৯। নায়লুল আওতা-র মিসরী ছাপা। ৫০। নাসবুর রা-য়াহ, সুরাট ছাপা ১৯৩৮ ইং সংস্করণ। ৫১। মাজমুআহ ফাতওয়া শাইখিল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া, দারুল আরবিয়াহ, বৈরুত ছাপা। ৫২। ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বলের কিতা-বুস সলাত ওয়ামা-ইয়্যালযামু ফীহা, মিসরী ছাপা। ৫৩। ইবনে রুশদের বিদায়াতুল মুজতাহিদ, কায়রো ছাপা, ১৯২৮ ইং সংস্করণ। ৫৫। ইমাম নববীর রওয়াতুত তলবীন, দামেশক ছাপা। ৫৬। আলমুগনী লি ইবনে কুদামাহ, রিয়াদ ছাপা। ৫৭। ইবনুল কাইয়িমের যাদুল মাআদ, মিসরী ছাপা, ১৯৫০ ইং সংস্করণ। ৫৮। ওঁরই ইগা-সাতুল লাহফা-ন মিম মাসায়িদিশ শায়তান, মিসরী ছাপা ১৯৩৯ ইং সংস্করণ। ৫৯। ওঁরই কিতা-বুস সলাত অআহকামু তারিকিহা। ৬০। ইমাম গাযালীর এইয়া-ও উলুমিদীনের বাংলা অনুবাদ, ঢাকা ছাপা। ৬১। আব্দুল কাদের জীলানীর গুন্যাতুত তা-লিবীনের বাংলা অনুবাদ, ঢাকা ছাপা। ৬২। ফাতওয়া নাযীরিয়াহ, দিল্লী ছাপা। ৬৩। ফাত-ওয়াহ সানায়িয়াহ, বোম্বাই ছাপা। ৬৪। আল্লামা সাইয়িদ সাবেক মিসরীর ফিক্‌হুস সুন্নাহ, বৈরুত ছাপা। ৬৫। অধ্যাপক আল্লামা আব্দুল আযীয মোঃ সালামান সাহেবের আলআসয়িলাহ ওয়ালআজজেবাতুল ফিক্‌হিয়াহ, রিয়াদ ছাপা। ৬৬। ইমাম নওয়াব সিদ্দীক হাসান খানের বায়লুল মানফাআহ, আধা ছাপা। ৬৭। শাহ ওয়ালিউল্লাহর হুজ্জাতুল্লা-হিল বা-লিগাহ, দিল্লী ছাপা, ১৩৭৪ হিজরী সংস্করণ। ৬৮। আল্লামা ইউনুস দেহলভীর দসতুর্কল মুত্তাকী, কোলকাতা, ছাপা। ৬৯। আল্লামা আবদুল জলীল সামরুদীর যাহরাতু রিয়াজিল আবরার, বোম্বাই ছাপা। ৭০। ইমাম নওয়াব সিদ্দীক হাসান খান ভূপালীর বাশারাতুল ফুসসাক, বেনারস ছাপা ১৩০৭ হিঃ সংস্করণ।

### হানাফী ফিক্‌হ গ্রন্থাবলী

৭১। ইমাম সারাখসীর মাবসূত, মিসরী ছাপা ১৩২৪ হিঃ সংস্করণ। ৭২। হিদায়া, দিল্লী ছাপা। ৭৩। ফাতহুল কাদীর, নওল কিশোর লাক্কৌ ছাপা। ৭৪। শারহে অকা-য়াহ মাজীদী, কানপুর ছাপা। ৭৫। দুররে মুখতার, দিল্লী ছাপা। ৭৬। রদে মুহতার ওরফে শামী, দুররে সাআদত, মিসরী ছাপা, ১৩২৪ হিঃ সংস্করণ। ৭৭। আলজাওহারাতুন নাইয়িরাহ, দেওবন্দ ছাপা ৭৮। গুন্যাতুল মুত্তামলী ওরফে কাবীরী, কাইয়ুমী কানপুর ছাপা। ৭৯। শারহুল নিকায়াহ, ইয়াহিয়াহ, দেওবন্দ ছাপা। ৮০। মারা-কিল ফালাহ, দামেশক ছাপা, ১৩৮৯ সংস্করণ। ৮১। হা-শিয়াহ তাহতা-ভী আলা-মারা-কিল ফালা-হ, ঐ ছাপা।

৮২। আলবাহরুর রা-য়িক, দারুল কুতুবিল আরাবিয়াহ, মিসরী ছাপা। ৮৩। মাজমুআহ ফাতাওয়া আবদুল হাই, কামিল মুবাওয়াব, দেওবন্দ ছাপা, ১৯৬৯ ইং সংস্করণ। শারহে ফেক্হ আকবর, কানপুরী, ছাপা।

## দু'আ, জীবনী এবং নামাযের বই

৮৫। ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ আলকালিমুত্ তাইয়িব, কাতার ছাপা, ১৯৮১ ইং সংস্করণ। ৮৬। ইবনুল কাইয়িমের আলওয়া-বিলুস সাইয়িব, রিয়াদ ছাপা। ৮৭। ইবনে সুন্নীর আমালুল ইয়াওমি ওয়ালাইলাহ, হায়দারাবাদ ছাপা, ১৩৫৮ হিঃ সংস্করণ। ৮৮। হিসনে হাসীন, দেওবন্দ ছাপা, ১৯৭৬ ইং সংস্করণ। ৮৯। ইবনুল জওযীর সিকাতুস সফআহ, হায়দারাবাদ ছাপা, ১৯৭৬ ইং সংস্করণ। ৯০। হাকিম যাহাবীর তাযকিরাতুল হফফায়, এ, ১৯৬৮ ইং সংস্করণ। ৯১। তাবাকতে ইবনে সা'দ, দারে বৈরুত ছাপা ১৯৫৭ ইং সংস্করণ। ৯২। তাবাকতে শা-রানী মিসরী ছাপা। ৯৩। মুহাদিস পত্রিকা, দিল্লী ১৯৪১ অক্টোবর সংখ্যা। ৯৪। মুহাদিস পত্রিকা বেনারস, ১৯৮২ ইং সংস্করণ। ৯৫। কিয়ামুল লায়ল, মুলতান ছাপা। ৯৬। মওঃ মোঃ ইসমাঈল গুজরানওয়ালার রাসূলে আকরাম কী নামায, দিল্লী ছাপা। ৯৭। মওঃ সাদিক শিয়ালকোটের সলাতুর রসূল। ৯৮। মওঃ ইসমাতুল্লাহ রহমানীর সলা-তুল মুত্তফা, ইলাহাবাদ ছাপা। ৯৯। মওঃ হাকিম আঃ মতীন সাহেবের হাদীসে নামায, বাঙ্গালোর ছাপা। ১০০। মাওলানা আব্দুল্লাহ ইবনে ফযল সাহেবের সহীহ নামায ও দু'আ শিক্ষা, ময়মনসিংহ ছাপা। ১০১। ডঃ মওলানা আফতাব আহমাদ রহমানী সাহেবের মাসায়েল ও নামায শিক্ষা, পাবনা ছাপা। ১০২। আব্দামা আব্দুল ওয়াহহাব সদরীর হিদায়াতুনাবী, করাচী ছাপা। ১০৩। মওঃ মোঃ মনযুর নূ'মানী সাহেবের নামায কি হাকীকাত, লাক্কো ছাপা। ১০৪। মাওলানা মোঃ রুহুল আমীন রচিত নামায শিক্ষা ৭ম সংস্করণ ১৩৮৭ বাংলা। ১০৫। সহীহ নামায ও মাসনুন দু'আ শিক্ষা ৪র্থ সংস্করণ, ঢাকা ছাপা।

## আধুনিক শিক্ষিত ভাইদের প্রতি

প্রচলিত মাযহাবপন্থী আলিমগণ নামাযের যেসব বই লিখেছেন তাতে তারা প্রায় সব মাসআলাতেই বলেছেন যে, অমুক বিষয়ে ফরয এত এবং সুন্নাত এত ইত্যাদি। কিন্তু কুরআন ও হাদীসে কোথাও এ কথা উল্লেখ নেই, অথুর ফরয এত এবং গোসলের ফরয সুন্নাত এত।

আমার এ নামায শিক্ষা বইয়ের ভিত্তি যেহেতু আব্দাহর কুরআন এবং রাসূলের হাদীস, ইসলামী ব্যবহার শাস্ত্রবিদ ফকীহদের ফিক্হের বই নয় সেজন্য এ বইয়ে কোন মাসআলায় বলা হয়নি যে, অথুর ফরয এত এবং গোসলের সুন্নাত এত।

মায়হাবপন্থী অধিকাংশ আলিমদের লিখিত বইয়ে কোন মাসআলার প্রমাণে বরাতই থাকে না। কিছু সংখ্যক আলিম যারা বরাত দেন তাও কুরআন ও হাদীসের উদ্ধৃতি নয়, বরং তাদের নিজ নিজ মায়হাবের ফিক্‌হ গ্রন্থের উদ্ধৃতি দেন। যেমন বাংলার বিখ্যাত হানাফী আলিম মাওলানা রুহুল আমীন (রহঃ) নামায শিক্ষা নামে ১৬০ পৃষ্ঠার একটি বই লিখেছেন। তাতে তিনি প্রায় মাসআলাতে কোন হাওয়ালাই দেননি এবং নামমাত্র যেসব উদ্ধৃতি দিয়েছেন সেগুলোও কুরআন এবং হাদীসের নয়, বরং হানাফী ফিক্‌হ গ্রন্থের।

দু'চারটি গ্রন্থে দেখা যায় যে, মায়হাবপন্থী কতিপয় আমে হাদীস গ্রন্থের বরাত দিয়েছেন। কিন্তু ঐ উদ্ধৃতিগুলো আহলে হাদীস আলিমদের লিখিত বইয়ে উদ্ধৃত হাদীসের বিপরীত হাদীস। তাই কিছু আধুনিক শিক্ষিত পাঠক ঐ পরস্পর বিরোধী হাদীসের বরাত দেখে বিভ্রান্ত হয়ে যান যে, কোন বরাতটা ঠিক। তাই তাদের জ্ঞাতার্থে জানাচ্ছি যে, হাদীস শাস্ত্রের নীতিবিদগণ হাদীস গ্রহণ ও বর্জনের ব্যাপারে কিছু নীতি নির্ধারণ করেছেন। ঐ নীতি অনুযায়ী একটু মাথা ঘামালে আমার আধুনিক শিক্ষিত ভাইয়েরা বিভ্রান্তি থেকে অনেকটা মুক্ত হতে পারবেন ইনশা-আল্লাহ।

ঐ নীতির ব্যাপারে হানাফী মুহাদিস আল্লামা আব্দুল হক দেহলভী (রহঃ) বলেন, যে হাদীসের ব্যাপারে ইমাম বুখারী ও মুসলিম একমত সে হাদীসটি সবার উপরে অগ্রগণ্য ও প্রাধান্যযোগ্য। তারপর শুধু সহীহুল বুখারীতে বর্ণিত হাদীসের স্থান এবং তারপর শুধু সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হাদীসের স্থান। (মিশকাতের ভূমিকা ৭ম পৃঃ)

বুখারী ও মুসলিমের পরের স্তর সম্পর্কে আর এক হানাফী আলিম দারুল উলুম দেওবন্দের সাবেক শায়খুল হাদীস আল্লামা আনোয়ার শাহ কান্দহারী (রহঃ) বলেন, আমার মতে সিহাহ সিহাহ বা ছ'টি হাদীস গ্রন্থের পর্যায়ক্রম এরূপ— (১) বুখারী (২) মুসলিম (৩) নাসায়ী (৪) আবু দাউদ (৫) তিরমিযী (৬) ইবনে মাজাহ— (আল আরফুশ শাযী ২৮ পৃঃ)। কারো মতে মুওয়াত্তা ইমাম মালিক এবং মুসনাদে আহমাদ এ দ্বিতীয় স্তরে গণ্য। নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে গৌড়ামি মুক্ত হয়ে পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, আহলে হাদীসদের কোন মাসআলার প্রমাণে যেখানে এক ও দুই নম্বর সহীহুল বুখারী ও সহীহ মুসলিমের বর্ণিত হাদীস পাওয়া যায় সেখানে তার বিরুদ্ধে মায়হাবপন্থীদের উদ্ধৃতিতে বুখারী ও মুসলিম তো নয়ই বরং পাঁচ ও ছয় নম্বরে মানের তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ হাদীস পাওয়া যায়। যেমন রফউল ইয়াদাইনের প্রমাণে এ বইয়ের ১১৪ পৃঃ দেখুন।

কখনো কোন মাসআলার প্রমাণে মায়হাব অনুসারীদের নিকট হাদীসই থাকে না। যেমন মেয়েদের বুকে হাত বাঁধার মাসআলা।

সিহাহ সিহাহ দু'টি স্তরের পরে তৃতীয় স্তরে এ গ্রন্থগুলোর স্থান মুসতাদরাকে হাকিম, সহীহ ইবনে হিব্বান, সহীহ ইবনে খুযায়মা, সহীহ ইবনুন্ সাকান— (দারসে তিরমিযী ৬৪-৬৮ দেওবন্দ ছাপা)। এর পরের স্তরে নিম্নে বর্ণিত গ্রন্থগুলো : দারাকুতনী,

সুনানে কুবরা, বায়হাকী, মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক, মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বা, তাবারানীর তিনটি মুজাম, মুসনাদে আবু ইয়লা- (ঐ ৭০-৭১ পৃঃ) ।

উপরে বর্ণিত হাদীসের নীতিবিদদের বিচারানুযায়ী কেউ যদি প্রথম স্তরের হাদীস গ্রহণ না করে দ্বিতীয় স্তরের হাদীস অনুযায়ী ইচ্ছাকৃত আমল করে কিংবা প্রথম স্তরের হাদীস না পাওয়া গেলে দ্বিতীয় স্তরের হাদীসের উপর কেউ যদি আমল না করে ইচ্ছাকৃত তৃতীয় স্তরের হাদীসের উপর আমল করে তাকে তা করতে দিন । তার ভালমন্দের বিচার আল্লাহর উপর ছেড়ে দিন । এ ব্যাপারে কেউ দয়া করে আত্মকলহ করবেন না ।

আল্লাহ আমাদের সহীহ হাদীস মোতাবেক আমল করার এবং আত্মকলহ থেকে বাঁচার তাওফীক দিন । আর হাদীস-অজ্ঞ আল্লাহর ভয়শূন্য মুফতীদের কুপ্ররোচনা থেকে মুক্ত-মন সাধারণ জনগণকে বাঁচান- আমীন ।

## ইসলামী গ্রন্থরাজীর অপূর্ব সমাবেশ

কুরআন ও হাদীসের ভাষা আরবী জানা যোগ্য বাঙ্গালী আলিমগণ তাদের মাতৃভাষায় বই লিখতে না পারায় এবং প্রকৃত আলিম নন এমন ব্যক্তিগণ ইসলামী বিষয়ে বই লিখে প্রকাশ করায় বহু ভেজাল তথ্য বাংলা-ইসলামী বইয়ে স্থান পেয়েছে । ফলে বাংলার জনগণ বহু ভেজাল তথ্যে ডুবে গেছে এবং নির্ভেজাল তথ্য থেকে বঞ্চিত হচ্ছে । তাই কুরআন ও হাদীসের নির্ভেজাল তথ্য জানতে হলে বাংলার অতুলনীয় গবেষক ও অধ্যাপক মাওলানা হাফিয শাইখ আইনুল বারী আলিয়াবী সাহেব রচিত নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলো অবশ্যই পড়ুন ।

- (১) আমপারার অতুলনীয় তাফসীর ‘তাফসীরে আইনী প্রথমার্ধ’ ৩৫ টাকা । ঐ শেষার্ধ ৩৫ টাকা ।
- (২) নব্বায়ের খুঁটিনাটি মাসআলা সম্বলিত ১২৫ খানা গ্রন্থের নির্ধারিত ‘আইনী তুহফা সলাতে মুস্তফা’ ১ম খণ্ড, ১০০ টাকা । ঐ ২য় খণ্ড ৯০ টাকা ।
- (৩) রমাযানের রোযা ও অন্যান্য নফল রোযার খুঁটিনাটি মাসআলা সম্বলিত ১১২ খানা গ্রন্থের সার- ‘সিয়াম ও রমাযান’ ১৮ টাকা ।
- (৪) পবিত্র হজ্জ ও ‘উমরাহ এবং মক্কা ও মদীনার পবিত্র জায়গাসমূহের চিত্তাকর্ষক বর্ণনা সম্বলিত ৬২ খানা গ্রন্থের বরাতে সমৃদ্ধ ‘স্বপ্নের দেশে তেইশ দিন’ ২০ টাকা ।
- (৫) ‘সংক্ষেপে হজ্জ, ‘উমরাহ ও যিয়ারাহ’ সাড়ে ৬ টাকা ।
- (৬) ৮০টি গ্রন্থ মন্বন করে কুরআনের ইতিহাস ও কুরআন সংক্রান্ত অশ্রুত তথ্যের সমাবেশ- ‘কুরআনী তথ্যের খনি’ ১৫ টাকা ।

- (৭) ১০৫টি গ্রন্থের বরাতে হাদীস সংক্রান্ত বহুমুখী তথ্য 'হাদীসের ইতিবৃত্ত' ১৬ টাকা।
- (৮) ৮৫টি গ্রন্থের সার ৫৪ জন তা-বিয়ী ও তাবা তাবিয়ীর মনোহর জীবনী "হাদীসের সংরক্ষণ যুগে যুগে" ১৬ টাকা।
- (৯) ৭২টি গ্রন্থের সমন্বয়ে কুরবানীর মর্মস্পর্শী ইতিহাস ও খুঁটিনাটি মাসআলার অপূর্ব সমাবেশ 'কুরবানী ও আইনী বিবরণী' ১৫ টাকা।
- (১০) ৬১টি গ্রন্থের সমাহার নাবীজীর মিলাদ এবং যে কোন ব্যক্তির জন্য ও মৃত্যুবার্ষিকী পালন সংক্রান্ত গ্রন্থ 'মীলাদুল্লবী ও বিভিন্ন বার্ষিকী' ৬ টাকা।
- (১১) ইলয়্যাসী তাবলীগের গুণাগুণ ও দিনে ইসলামের তাবলীগী নিয়মকানুনসহ প্রচলিত মাযহাব ও সুফীদের কুপ্রভাব সংক্রান্ত ৫৭টি গ্রন্থের নির্যাস 'ইলয়্যাসী তাবলীগ ও দিনে ইসলামের তাবলীগ' ১৮ টাকা।
- (১২) সঠিক ইসলামী নাম ও আকীকার বিভিন্ন আহকাম সংক্রান্ত তথ্য ৩৬টি গ্রন্থের বরাতে সমৃদ্ধ 'আকীকা ও নামরাখা'।
- (১৩) চরিত্র গঠনমূলক একশো হাদীসের অভিনব সংকলন 'প্রিয় নাবীর অমিয় বাণী' ৮ টাকা।
- (১৪) ইসলামী ধ্যান ধারণা সংক্রান্ত একশো হাদীসের মনোহর সমাহার 'বিশ্বনবীর অমৃত বাণী' ৮ টাকা।
- (১৫) আপনার শিশুকে ইসলামী ধাঁচে গড়ার অপূর্ব শিশুপাঠ্য বই 'সালাফী বর্ণ পরিচয়' ১ম ভাগ ৭ টাকা ও ২য় ভাগ, ৭ টাকা।
- (১৬) তৃতীয় শ্রেণীর উপযোগী ইসলামী ও আধুনিক কাহিনীর সমন্বয়কারী বই 'সালাফী সাহিত্য বীথি' ৯ টাকা।
- (১৭) কাদিয়ানীদের স্বরূপ তাদের বই থেকে জানতে হলে পড়ুন 'কাদিয়ানী কাহিনী গোলাম আহমাদীদ্বারা যবানী' ৫ টাকা।

## লেখক পরিচিতি

এ তথ্য তত্ত্বপূর্ণ লেখক মাওলানা হাফিয শাইখ আইনুল বারী আলিঙ্গাবী সাহেব কলিকাতা মেটিয়ারকুজের অন্তর্গত এস ১০২ মারে রোড, কলিকাতা-৭০০০১৮ এর বাসিন্দা। ইনি আনুমানিক ১৯৪৫ সালের মার্চ মাসের কোন এক জুম্মু'আর দিনে জুম্মু'আর সময় ধরণীর ধূলায় পদার্পণ করেন। অতঃপর উক্ত মারে রোডে খোবাপাড়া ফ্রি প্রাইমারী স্কুল থেকে ফার্স্ট ডিভিশনে পাশ করে দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার আকড়া মাদরাসায় মাত্র ১০/১২ দিনে একটি পাড়া মুখস্থ করতঃ গোটা কুরআন হিফয করে ১৯৫৯ সালে আকড়া মাদরাসায় এক চমক সৃষ্টি করেন। তারপর কলিকাতা মাদরাসা আলিয়া থেকে ১৯৬৩ সালে পঃ বঃ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের আলিম পরীক্ষায় ৫টি পেপারে শতকরা ৮০টিরও বেশী এবং আরবী সাহিত্যের পদ্যে শতকরা ৯৪ নম্বর পেয়ে বোর্ডে রেকর্ড করতঃ প্রথম বিভাগে প্রথম হন। অতঃপর ১৯৬৫ সালে উক্ত বোর্ডের ফায়িল পরীক্ষায় ৮টি পেপারে লেটার মার্ক এবং আরবী সাহিত্যের পদ্যে শতকরা ৯৪ ও ইংরেজীর প্রথম পেপারে শতকরা ৮০ নম্বর এবং হাদীসে শতকরা ৯০ নম্বর পেয়ে মোট ৯০৪ মার্ক সংগ্রহ করে বোর্ডে রেকর্ড করতঃ ফার্স্ট ডিভিশনে ফাষ্ট হন। ১৯৬৭ সালে তিনি উক্ত বোর্ডের মুমতা-যুল মুহাদ্দিসীন (এম,এম) পরীক্ষায় বুখারী ও নাসায়ীতে এবং তাফসীরে কাশশাফে শতকরা ৯৫ নম্বর এবং ইসলামী ইতিহাসে ৮২ নম্বর পেয়ে ফার্স্ট হন উক্ত বোর্ডে ও কলিকাতা মাদরাসার ইতিহাসে এক অতুলনীয় নজীর সৃষ্টি করেন।

এরপর তিনি ১৯৬৯ সালে হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষায় আরবীতে শতকরা ৯০ নম্বর পেয়ে রেকর্ড করে প্রথম বিভাগে পাশ করেন। সেই সাথে ১৯৬৯ ও ১৯৭০ সালে আদীবে উর্দু ও আদীবে কামিল পরীক্ষায় মৌখিক পেপারে শতকরা ৮০ মার্ক পেয়ে রেকর্ড সৃষ্টি করে ফার্স্ট ডিভিশনে ফাষ্ট হন। কলেজে প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় তিনি বাংলা ও উর্দুতে ফার্স্ট হয়ে পুরস্কৃত হন। পনের বছর বয়স থেকেই তিনি বাংলা প্রবন্ধ লেখা শুরু করেন যা আজও অব্যাহত রয়েছে।

তিনি ১৯৭২ সালের আগস্ট থেকে কলিকাতা হতে প্রকাশিত মাসিক আহলে-হাদীস পত্রিকার সম্পাদনা করে আসছেন এবং সেই সাথে পঃ বঃ প্রাদেশিক জমঈয়তে আহলে হাদীসের জেনারেল সেক্রেটারীর দায়িত্বও পালন করেছেন। ১৯৭৪ সালের এপ্রিল মাস থেকে তিনি মেটিয়ারকুজের হাওলাদার পাড়া জামে মসজিদে জুম্মু'আর খুতবা দিয়ে আসছেন এবং সারা ভারতে বক্তৃতা করে যশস্বী হয়েছেন ও হচ্ছেন। ১৯৭৫ সালের ৭ই নভেম্বর থেকে তিনি ভারতের সর্বপ্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কলিকাতা মাদরাসা আলিয়ায় অধ্যাপনা করে সারা ভারতে সুনাম অর্জন করেছেন। ১৯৭৮ সালের ১লা মে মহারাষ্ট্রের মালোগাঁও-এ মাত্র ২০ মিনিট উর্দু বক্তৃতা করে তিনি মুসলিম জনস্বখ্যাত মনীষী মাওলানা সৈয়দ আবুল হাসান আলী নদবী কর্তৃক পুরস্কৃত হন ও বাহবা পান। ১৯৭৮ তিনি কলিকাতা মুসলিম ইয়াতীমখানার সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৯০ সাল থেকে তিনি সারা ভারতের জমঈয়তে আহলে হাদীসের সহ-সভাপতি পদে অধিষ্ঠিত আছেন।



১৯৮০ সাল থেকে ১৯৯০ পর্যন্ত ঐ সংগঠনের পূর্বাঞ্চলের (বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসামের) সেক্রেটারীর পদ অলংকৃত করেন। ১৯৯০ সাল থেকেই তিনি বেনারসের জামিআ সালাফিয়াহ বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সদস্য হিসেবে মনোনীত হন। ১৯৮২ সাল থেকে মোম্বাইয়ের মাসজিদ সংস্কার কমিটির সদস্য এবং মহারাষ্ট্রের মালোগাঁও মনসুরায় অবস্থিত ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় জামেআ মুহাম্মাদিয়ার উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য পদে শোভাবর্ধন করছেন। ১৯৮৫ সাল থেকে তিনি কলিকাতা মাদরাসার প্রাক্তন ছাত্র সংসদের প্রতিষ্ঠাতা সেক্রেটারী পদে সমাসীন আছেন। ১৯৮৬ সাল থেকে তিনি পঃ বঃ রহমানী শিক্ষা বোর্ডের সভাপতি পদের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করছেন। ১৯৯১ সালে তিনি পঃ বঃ ইসলামী শিক্ষা বোর্ডের সহ-সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। ১৯৯২ সাল পর্যন্ত ইসলামের বিভিন্ন বিষয় সংক্রান্ত তিনি ১৭ খানা গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর রচনাবলী সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে দুই বাংলার অতুলনীয় রিজালবিদ আল্লামা আবু মুহাম্মাদ আলীমুদ্দীন সাহেব তাকে ‘বাংলার ইবনে তাইমিয়াহ’ নামে আখ্যায়িত করেছেন। ভারতের লব্ধ প্রতিষ্ঠিত বক্তা ও ইসলামী বিদ্বান মাওলানা আব্দুল হামীদ রহমানী সাহেব তাকে ‘এ যুগের ইবনে হাজার আসকালানী’ বলে মন্তব্য করেছেন। উত্তর বঙ্গের বিশিষ্ট মনীষী আল্লামা আহমাদ হুসায়ন শ্রীমন্তপুরী তাঁকে ‘বাংলার আবুল কালাম আযাদ’ বলে অভিহিত করেছেন। পঃ বঙ্গের বিশিষ্ট শিক্ষাগুরু মাওলানা আতাউল্লাহ সাহেব তাকে দুই বাংলার অনন্য প্রতিভা বলেছেন। বাংলার বিশিষ্ট শায়খুল হাদীস ও প্রতিথযশা বক্তা মাওলানা আব্দুর রউফ শামীম সাহেব তাকে ‘বিপ্লবী সংস্কারক, মন্ত্রমুগ্ধকর বাগী ও বহুমুখী প্রতিভা জ্ঞান করেছেন। মিশকাতের বাংলা অনুবাদক বাংলার বিশিষ্ট আলিম মাওলানা আমীর আলী সাহেব তাঁকে দুই বাংলার যুগ-সংস্কারক, যুগস্রষ্টা ও অনুকরণীয় প্রতিভা বলে মন্তব্য করেছেন।

বাংলার বিশিষ্ট গবেষক ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বনামধন্য অধ্যাপক ডঃ ‘উসমান গণী (এম.এম, পি.এইচ.ডি.ডি, লিট) সাহেব তাকে কালজয়ী, অনন্য সাধারণ ও বিরল প্রতিভা বলে মন্তব্য করেছেন। কলিকাতা মাদরাসার অধ্যক্ষ ডঃ মুহাম্মাদ শহীদুল্লাহ সাহেব তাকে বাংলার ইসলামী গবেষক, অনন্য সাধারণ স্মৃতিধর ও ক্ষুরধার লেখক বলে বিবেচনা করেছেন। বাংলার প্রখ্যাত কবি ও সাহিত্যিক ডঃ সৈয়দ আনীসুল আলম সাহেব বলেন, প্রতিটি বিষয়েই পবিত্র কুরআন ও হাদীসের বরাত দিয়ে লেখায় তিনি অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী।

বাংলার বিশিষ্ট শিক্ষক বহুমুখী সাহিত্যের অনুসন্ধিৎসু পাঠক ও সূক্ষ্ম সমালোচক জনাব সিরাজুল হক (বি.এ, অনার্স, এম.এ, বি, এড ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট) সাহেব বলেন, তার গ্রন্থগুলি বঙ্গীয় মুসলিম সমাজের পথ চলার নির্ভেজাল গাইড বুক এবং আলোক স্তম্ভ ও তাঁর বিচিত্রমুখী প্রতিভার সফল স্বাক্ষর। তাঁর বিভিন্ন ইসলামী খিদমতের জন্য তিনি শুধু ভারতেই নয়, বরং ভারতের বাইরেও প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। তাই মক্কার বিশ্বমুসলিম সংস্থার দাওয়াতে তিনি ১৯৯১ সালে পবিত্র হজ্জব্রত পালন করেছেন এবং মক্কা ও মদীনার পবিত্র ঐতিহাসিক জায়গাসমূহ পরিদর্শন করে ধন্য হয়েছেন।



# হাদীস একাডেমী

## লকশিত গ্রন্থ সমূহ

০১। কুরআনুল হাকীম বঙ্গানুবাদ-	মহম্মদ নবীয়েন কর্তৃক সম্পাদিত
০২। সহীহ মুসলিম (১ম খণ্ড)-	২
০৩। সহীহ মুসলিম (২য় খণ্ড)-	২
০৪। সহীহ মুসলিম (৩য় খণ্ড)-	২
০৫। সহীহ মুসলিম (৪র্থ খণ্ড)-	২
০৬। সহীহ মুসলিম (৫ম খণ্ড)-	২
০৭। সহীহ মুসলিম (৬ষ্ঠ খণ্ড)-	২
০৮। বুলুগল মারাম (পূর্ণাঙ্গ)-	২
০৯। মিশকাতুল মাসাবীহ (১ম খণ্ড)-	২
১০। মিশকাতুল মাসাবীহ (২য় খণ্ড)-	২
১১। আইনী তুহফা সলাতে মুস্তফা (১ম খণ্ড)-	ই ইরশাদে গণ্য
১২। আইনী তুহফা সলাতে মুস্তফা (২য় খণ্ড)-	অধ্যাপক হাফিজ মাহমুদ হাইনুল বাকী অসিহাউ
১৩। আইনী তুহফা সলাতে মুস্তফা (১-২) একত্রে	২
১৪। আহলে হাদীসদের বিরুদ্ধে বিখ্যাতগণের তত্ত্ব রহস্য-	২
১৫। হানাফী ফিকহের ইতিহাস ও পরিচয়-	মুহম্মদ মাহমুদ মাহমুদ রহিম
১৬। প্রচলিত নামাব বনাম রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নামাব-	২
১৭। ইলিয়াসী তাবলীগ বনাম রসূল (সঃ)-এর তাবলীগ-	অধ্যাপক মাহমুদ হাফিজ হাইনুল বাকী অসিহাউ
১৮। অধ্যাপকদের অতল তলে-	অবু হাশেম বর্নাবী
১৯। কাটি ছজ্জতির জওয়াব-	২
২০। মৌলুদ শরীফ	২
২১। তুহফায়ে হাজ্জ-	মাহমুদ শাহমুদীন মিল্লা
২২। ইসলামী বিবাহ পদ্ধতি ও স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য জীবন-	শাইখ মাহমুদুল্লাহ হামেদী নসিরাবাদী
২৩। দু'আ প্রসঙ্গ-	অধ্যাপক মাহমুদ হাইনুল বাকী অসিহাউ
২৪। রক্ত পূর্ণ ও পরে স্নাত্তে ন্যূনতম অবস্থার রক্তের বোধ সম্পর্কে	এ.জি.এ. এম. বেগম মোহাম্মদ হামেদী
২৫। নামাযে বৃকে হাত বাঁধা ও স্বশব্দে আমীন-	২৪২১১ ২৪
২৬। ইসলামের নৃষ্টিতে সম্পদ, মুহাররম ও মীলাদুল্লাহী-	অধ্যাপক মাহমুদ হাইনুল বাকী অসিহাউ
২৭। খাতি সুন্নাত বনাম ভেজাল সুন্নাত	অধ্যাপক মাহমুদ হাইনুল বাকী অসিহাউ
২৮। আপনি কেন আহলে হাদীস হবেন	অধ্যাপক মাহমুদ হাইনুল বাকী অসিহাউ
২৯। যাদুটোনা, জিনের আসর বন্দনযর ও শাহিনুনের অনিষ্ট থেকে বাঁচার নিশ্চিত উপায়-	অধ্যাপক মাহমুদ হাইনুল বাকী অসিহাউ
৩০। প্রকৃত অলী আউলিয়া কে?	অধ্যাপক মাহমুদ হাইনুল বাকী অসিহাউ
৩১। কাদিয়ানী ও শী'আ কারা- ভেবে দেখবেন কি?	২৪২১১ ২৪